মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

প্রথম খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক-শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (রাহঃ)-রচিত মুকাশাফাতুল-কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্য়াউ উলুমুদ্দীন'-এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল-কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদের চিহ্নিত

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্‌স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল-ক্বুলুব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ-সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী-দাওয়ার সয়লাবে টই-টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত-চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান-চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম-সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন ! !

বিনয়াবনত
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা
৩১-১২-৮৮

এক নজরে

হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ)

- নাম ঃ আবূ হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাযযালী আত্-তূসী। উপাধি ঃ হুজ্জাতুল-ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ।

- তদানীন্তনকালে ইল্‌ম ও জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ এবং শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামার কেন্দ্রস্থল 'তূস' শহরে ৪৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একটি সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, খাঁটি ইসলামী পরিবারে তাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হয়।

- তূসে আহমদ বিন মুহাম্মাদ রাযেকানী (রহঃ)-এর নিকট ফেকাহ্‌শাস্ত্রের কিছু অংশ অধ্যায়ন করেন। অতঃপর জুরজানের ইমাম আবূ নসর ইসমাঈলীর নিকট গমন করেন এবং ফিকাহ্-শাস্ত্রের উপর হযরত ইসমাঈলী প্রদত্ত অধ্যাপনা থেকে সঞ্চিত একটি মূল্যবান নোট প্রস্তুত করে তূসে প্রত্যাবর্তন করেন।

- একটি ইল্‌মে-দ্বীনান্বেষী কাফেলার সাথী হয়ে তূস হতে নিশাপুর গমন করেন এবং 'ইমামুল-হারামইনের নিকট ইল্‌ম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমামুল-হারামাইনের ইন্তেকালের পর তিনি সেখানকার সেনানিবাস এলাকায় অবস্থানরত উযীর নিযামুল-মুলকের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে বহু যশস্বী পণ্ডিতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

বাহাছে তিনি তাদের পরাজিত করে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং নিযামুল-মুলক তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

- নিযামুল-মুলকের অনুরোধে ৪৮৪ হিজরীর জুমাদাল-উলায় বাগদাদের 'মাদ্রাসায়ে-নিযামিয়া'য় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- ৪৮৮ হিজরীর রজব মাসে তাঁর অন্তর্জগতে এক রূহানী বিপ্লব সূচিত হয় এবং সেই যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতা ৪৮৯ হিজরীর শুরুভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস কাল অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ৪৮৮ হিজরীর যিলকদ মাসে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং দুনিয়ার তামাম সম্পর্কজাল ছিন্ন করে এশ্‌ক ও মহব্বত, যুহদ ও মা'রিফাতের প্রান্তহীন পথে যাত্রা করেন। স্বীয় ভ্রাতা আহমদ গায্‌যালীকে নিযামিয়ার অধ্যাপনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যিলহজ্জ মাসে প্রকাশ্যতঃ মক্কা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মনে মনে প্রথমতঃ সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

- ৪৮৯ হিজরীর প্রথম দিকে দামেশকে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবত মসজিদে দামেশকে পশ্চিম মিনারায় দরজা কপাট বন্ধ করে ই'তেকাফের হালতে কাটান। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাসে গমন করেন। সেখানে প্রত্যহ 'ছাখরা' গম্বুজে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। সেখান থেকে মাকামে-ইবরাহীমের যিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন।

- ৪৮৯ হিজরীর শেষের দিকে দামেশ্‌কে ফিরে আসেন এবং জামে মসজিদের পশ্চিম মিনারায় ই'তেকাফ শুরু করেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সারাদিন সেখানে কাটাতেন। ৪৯০ হিজরীর যিলকদ পর্যন্ত দামেশ্‌কেই অবস্থানরত ছিলেন।

- অতঃপর তিনি হজ্জের ফরীযাহ্‌ সম্পাদন ও রওজা শরীফের যিয়ারতে গমন করেন।

- ৪৯০ হিজরীর পঞ্চম মাসান্তে খোরাসান যাওয়ার পথে বাগদাদ পৌছেন। কিন্তু, সেখানে বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। নিযামিয়ার অধ্যাপনায়ও যোগদান করেন নাই।

- খোরাসান গমনের পর কিছুকাল তূসে পাঠদান করেন। অতঃপর অধ্যাপনা, বাহাছ সবকিছু ত্যাগ করে ইবাদতে মশগুল হন এবং নির্জনতা ও যিকরের দ্বারা অন্তরের পরিমার্জনকে প্রাধান্য প্রদান করেন। কিন্তু সময়ের বিভিন্ন সংকট, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের সমস্যা তাঁর নির্জনতার ঐকান্তিকতা ও মূল লক্ষ্যপথে খানিকটা বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এ অবস্থাতেই সুদীর্ঘ প্রায় নয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়।

- ৪৯৮ হিজরীর রবীউস্‌সানী মাসে সান্‌জার-ফখরুল-মুল্‌ক আলী ইবনে নিযামকে খোরাসানে তাঁর উযীর নিযুক্ত করার পর আলী ইবনে নিযাম হযরত গায্‌যালী (রহঃ)-কে পুনরায় অধ্যাপনাব্রত গ্রহণের জোর আবেদন জানান। তিনি তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত এ প্রস্তাব এড়াতে না পেরে নিশাপুরের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগদান করেন (বাগদাদের নিযামিয়ায় নয়)। কারণ, ফখরুল-মুল্‌ক আলী ছিলেন

বাদশাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ-এর নিযুক্ত খোরাসানের গভর্ণর (তাঁরই ভ্রাতা) সান্‌জার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নিশাপুরের একজন মন্ত্রী।

- অতঃপর তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে যান এবং বাড়ীর নিকটেই দ্বীনি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও রূহানী তরবিয়তপ্রার্থীদের জন্য একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর নিজের ও হাযেরীনের জন্য বিভিন্ন আমলের সময়সূচী নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ঃ খতমে-কুরআন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে উপবেশন, পাঠদান বৈঠক প্রভৃতি। এ রুটিনের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁর বা তাঁর সাথী ও শাগরেদদের কারো একটি মুহূর্তও অনর্থক না কাটে।

- ইল্‌ম ও আমল তাসনীফ (গ্রন্থনা) ও দাওয়াতের কর্মমুখর পঞ্চান্নটি বছর অতিবাহনের পর হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ আল-গায্‌যালী (রহঃ) জুমাদাল-উখরা ৫০৫ হিজরী মুতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ১১১১ ঈসায়ী রোজ সোমবার তুসে ওফাত পান এবং 'ত্বাবরান' নামক স্থানে সমাধিস্থ হন। رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

* * *

الحمد لله الذى احسن تدبير الكائنات وخلق الارضين والسموت وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب والنبات وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات و الصلوة والسلام على سيدنا محمد ذى المعجزات الظاهرات الذى حصل بنوره وجود الكائنات وبعد :

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সারা জাহানকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নিয়মে পরিচালনা করছেন। আসমান ও যমীনের সকল স্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন। জলধর মেঘমালা হতে যিনি প্রচুর বৃষ্টিপাত করেন। খাদ্য-খাবার, অন্নদানা ও শস্যসমৃদ্ধ বিপুল প্রান্তর যিনি সৃজন করেছেন। প্রত্যেকের প্রাপ্য রিযিক ও সম্ভোগ্য সম্পদ যিনি সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। নেক আমল ও সনিষ্ঠ ইবাদতের প্রতিদানে যিনি সওয়াব ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

দরূদ ও সালাম আমাদের মহান পথ-প্রদর্শক মাহ্‌বুব ও মুর্শিদ, অত্যুজ্জ্বল মু'জিযাত ও দেদীপ্যমান নিদর্শনাদির অধিকারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নূর ও কল্যাণের তোফায়লে সমগ্র জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

অধ্যায় ঃ ১

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন, যার বিরাটকায় দেহের এক বাহু দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে এবং অপর বাহু দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্তে। মাথা আরশের সন্নিকটে এবং পদদ্বয় যমীনের সপ্তম তবককেও অতিক্রম করেছে। তাকে সমগ্র জগতে বিস্তৃত সৃষ্টির সমপরিমাণ পর–পাখা দেওয়া হয়েছে। আমার উম্মতের মধ্যে কোন পুরুষ বা নারী যখন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফেরেশ্‌তাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন আরশের নীচে অবস্থিত 'নূরের সাগরে' ডুব দেয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সে দরিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে বাহির হয় এবং সর্ব শরীর ঝাড়া দেয়। ফলে, তার অসংখ্য পাখনা হতে অগণিত পানি–বিন্দু ঝরে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা ফেরেশ্‌তার গা থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি বিন্দু হতে এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। এই অসংখ্য–অগণিত ফেরেশ্‌তা দরূদ পাঠকারী ব্যক্তির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ্–মাফীর দো'আ করতে থাকে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অল্পাহারের উপর, আত্মার শান্তি নির্ভর করে পাপকার্য পরিত্যাগ করার উপর, আর দ্বীন ও ঈমানের সংরক্ষণ নির্ভর করে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের উপর।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।'

অর্থাৎ–তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়–ভীতি জাগরুক করে তোল এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য অবলম্বন করে নাও।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج

'এবং প্রত্যেকের উচিত,—আগামী (কিয়ামত) দিবসের জন্য সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।' বস্তুতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তোমরা দান-খয়রাত ও ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর। যাতে এর প্রতিদানে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে পুরস্কৃত হতে পার।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ০

'তোমরা সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। কারণ তিনি তোমাদের (প্রতিটি নেক আমল ও অন্যায়) কার্য-কলাপ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (হাশর ঃ ১৮)

আদম-সন্তান দুনিয়াতে কি কি সৎকাজ করেছে অথবা কি কি অপরাধ ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়েছে ; আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করেছে, কি নাফরমানী করেছে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন ফেরেশতাকুল, আসমান-যমীন, দিবস-রজনী—এ সবকিছু আল্লাহ্র সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবে। বরং সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মানুষের স্বার্থের বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। মানুষ যদি সৎ ও পুণ্যবান হয়, তা'হলে তার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করবে। ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তির স্বপক্ষে যমীন এই মর্মে সাক্ষ্য দান করবে যে, 'ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যক্তি তোমাকে খুশী করার জন্য আমার পৃষ্ঠে নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, হজ্জ করেছে, জিহাদ করেছে।' উক্তরূপ সাক্ষ্য শ্রবণ করে ঈমানদার ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হবে। পক্ষান্তরে, যমীন কাফের ও অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, 'হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠে বিচরণ করে শিরক করেছে, ব্যভিচার করেছে, শরাব পান করেছে এবং অন্যান্য হারাম কার্যে লিপ্ত হয়েছে।' ফলে, রোয হাশরের কঠিন হিসাবের সময় ধ্বংস ও শাস্তি তাকে গ্রাস করে নিবে। বস্তুত ঃ প্রকৃত ঈমানদার সে-ই, যে নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং সদা শঙ্কিত থাকে।

ফকীহ আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ 'কারও অন্তঃকরণে আল্লাহ্র

ভয়-ভীতি আছে কি-না? এ বিষয়ে তুমি যদি জানতে চাও, তা'হলে সাতটি আলামত ও লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য কর। এগুলো যদি কারও আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি ও জীবনধারায় পরিলক্ষিত হয়, তা' হলে বুঝে নাও যে, তার মনের ভিতরে খোদা-ভীতি ও পরহেযগারী বদ্ধমূল হয়েছে ; তার অন্তর খোদার খওফ ও খাশিয়াতে আবাদ হয়েছে। সেই লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ

এক,-- এ আলামতটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— তার জিহ্বা মিথ্যা, বানোয়াট, গীবত, চুগ্‌লি, অপবাদ, অপ্রীতিকর কথাবার্তা ও অহেতুক বাক্যালাপ হতে বিরত থাকবে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনি ইলমের চর্চায় নিমগ্ন থাকবে।

দ্বিতীয় আলামত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, অহেতুক কাউকে দোষারোপ করা এবং হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি ব্যাধি হতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত-পবিত্র থাকবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

'হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়।'

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে, হিংসা-বিদ্বেষ মানব হৃদয়ের একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ধরণের আরও অসংখ্য ব্যাধি রয়েছে। এগুলো হতে নিস্কৃতি পেতে হলে পরিপক্ক ইলম ও সনিষ্ঠ আমলের একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ উক্তরূপ ইলম ও আমলের সমন্বিত সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা অথবা এসব রোগের সুচিকিৎসা করা সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয় আলামত চক্ষু বা দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— খোদাভীরু ও পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম খাদ্যদ্রব্য, নিষিদ্ধ পানীয় বস্তু, হারাম লেবাস-পোষাক থেকে হিফাযত করবে এবং পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি কখনও লোলুপ দৃষ্টি করবে না। বরং আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও কুদরতের প্রতি দৃষ্টি করে শিক্ষা ও সবক হাসিল করবে। হারাম ও নিষিদ্ধ পদার্থের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَامِ مَلأَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْنَهُ مِنَ النَّارِ .

'যে ব্যক্তি নিজের চক্ষুকে হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই চক্ষুর ভিতরে দোযখের অগ্নি ভরে দিবেন।'

চতুর্থ আলামত উদরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তি স্বীয় উদরকে হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিক হতে হিফাযত করবে। কেননা এহেন রিযিক ভক্ষণ করা স্বতঃসিদ্ধ মহাপাপ। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ مِنَ الْحَرَامِ فِىْ بَطْنِ ابْنِ اٰدَمَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَادَامَتْ تِلْكَ اللُّقْمَةُ فِىْ بَطْنِهِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ـ

'আদম সন্তানের উদরে যখন হারাম খাদ্যের কোন লুকমা পতিত হয়, তখন যমীন ও আসমানের সকল ফেরেশতা তার উপর লা'নত ও অভিশাপ দিতে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত এই লুকমা তার পেটে মওজুদ থাকে। আর যদি উক্ত লুকমা পেটে থাকা অবস্থায় সে মারা যায়, তা'হলে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম।'

পঞ্চম লক্ষণ হস্তের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,—পরহেযগার ব্যক্তির হাত কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি প্রসারিত হবে না। বরং সাধ্যানুযায়ী সর্বদা সে স্বীয় হাতকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে।

হযরত কা'ব্ আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্তে সবুজ ইয়াকুত রত্নের মহল তৈরী করেছেন, প্রত্যেক মহলে সত্তর হাজার কামরা আছে। আবার প্রত্যেক কামরায় সত্তর হাজার দরজা আছে।

এই বেহেশতে ঐ ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে, যার সম্মুখে দুনিয়াতে হারাম বস্তু পেশ করা হয়েছে ; কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছে।'

ষষ্ঠ আলামত পদদ্বয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ,— পরহেযগার ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার না-ফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে ব্যবহার হবে না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহৃত হবে এবং উলামা, মাশায়েখ ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি বেগবান হবে।

সপ্তম আলামত ইবাদত ও রিয়াযত। অর্থাৎ,— খালেস ও নেক নিয়তে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও সাধনা-পরিশ্রমে নিমগ্ন থাকবে। বস্তুতঃ মানবের উচিত এটাই যে, সর্ববিধ সাধনা ও ইবাদতের মূলে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রেযা' ও সন্তুষ্টিকেই সামনে রাখবে ; এতে কোনরূপ রিয়াকারী, লোকদেখানো মনোবৃত্তি ও কপটতাকে প্রশ্রয় দিবে না। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সে ঐসব মহান ও ভাগ্যবান লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

'মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে তোমার প্রতিপালকের নিকট আখেরাতের কল্যাণ।' (যুখ্রুফ ঃ ৩৫)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে ঝর্ণাবহুল জান্নাতে।' (হিজ্র ঃ ৪৫)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে।' (তূর ঃ ১৭)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

'মুত্তাকীগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে।' (দুখান ঃ ৫২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকারান্তরে এ ঘোষণাই করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে দোযখের অগ্নি হতে তাঁরা অবশ্যই মুক্তি পাবে।

ঈমানদার ব্যক্তির উচিত, যেন সে ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত থাকে। কেননা, এরূপ ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের আশা করতে পারে এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশ হয় না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

অতএব, তোমার কর্তব্য হচ্ছে—তুমি একান্তভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে যাও, সকল অসৎ ও গর্হিত কার্য পরিহার করে এক আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং সর্বান্তকরণে ও পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর।

একদা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ গৃহে বসে পবিত্র যবুর কিতাব তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একটি গর্ত হতে লাল বর্ণের একটি কীট বের হয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর দৃষ্টি সেই কীটের উপর পতিত হলে তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কীটটিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন ; এর রহস্য ও তাৎপর্য কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই কীটটিকে বাকশক্তি দান করে নবীর প্রশ্নের জওয়াব দিতে আদেশ করলেন। কীটটি বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, আমি প্রত্যহ দিবসে এক হাজার বার এই কালেমা পাঠ করি ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ -

এবং প্রত্যহ রাত্রিকালে আমি এই দরূদ শরীফ পড়ে থাকি ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

হে আল্লাহ্র নবী! এখন বলুন, আপনি আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করছেন ; আমি আপনার দ্বারা উপকৃত হতে চাই। কীটের মুখে একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং ভীত-শঙ্কিত হয়ে তওবা করে নিজেকে আল্লাহ্র সোপর্দ করলেন।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্বীয় পদস্খলনের কথা স্মরণ করতেন, তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং দূর হতে তাঁর বুকের ধড়-ফড় আওয়ায শুনা যেতো। এমনি এক অবস্থার সময় একদা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন,—মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি এমন কোন লোক দেখেছেন, যে তার বন্ধুকে ভয় করে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন,—'হে জিব্রাঈল! আমার পদস্খলনের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন শেষ পরিণামের কথা চিন্তা করে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি ; আল্লাহর সাথে গভীর বন্ধুত্বের কথা তখন আমার স্মরণ থাকে না।'

প্রিয় সাধক! আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে সালেহীন ও দুনিয়াত্যাগী যাহেদীনের অবস্থা যদি এই হয়, তা'হলে, অন্যান্যদের দশা কি হবে? চিন্তা করা উচিত এবং এ থেকে প্রচুর শিক্ষা ও সবক হাসিল করা উচিত।

অধ্যায় ঃ ২

খওফ ও খাশিয়াত বা খোদাভীতি

(পূর্ব প্রসঙ্গ)

হযরত আবুল-লাইস (রহঃ) বলেছেন ঃ সপ্তম আসমানে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আরাধনায় সিজদারত অবস্থায় মগ্ন রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁদের পাঁজর সর্বদা প্রকম্পিত থাকে। কিয়ামতের দিবসে তাঁরা মস্তক উত্তোলনপূর্বক বলবে,—'আয় আল্লাহ! আপনি পাক পবিত্র, আপনার হক আদায় করে যেভাবে ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা' আমরা করতে পারি নাই।' যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ السجدة

'তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রব্বকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায় তা' করে।' (সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ৫০)

অর্থাৎ,— তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি হতে চিন্তামুক্ত হয় না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا اقْشَعَرَّ جَسَدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَحَاتَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرِ وَرَقُهَا۔

'আল্লাহর ভয়ে যখন বান্দার শরীর কম্পমান হয়, তখন তার পাপরাশি এইরূপে ঝরে পড়ে যেমন বৃক্ষ হতে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে।'

একদা এক ব্যক্তি জনৈকা নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। কোন প্রয়োজনে

সেই মহিলা গৃহ হতে বের হলে প্রেমিক তার পশ্চাদানুসরণ করতে থাকে। এভাবে এক বনভূমিতে দু'জন একত্রিত হয়। আশেপাশের লোকজন নিদ্রাভিভূত হওয়ার পর একান্ত মুহূর্তে পুরুষ উক্ত মহিলার নিকট তার মনোস্কামনা ব্যক্ত করে । তখন মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'সকলেই কি ঘুমিয়ে গেছে?' প্রশ্ন শুনে মহিলার সম্মতি অনুমান করে লোকটি কাফেলার চতুর্পাশ প্রদক্ষিণ করে জানালো,— 'সকলেই ঘুমিয়ে গেছে ; কেউ সজাগ নাই।' অতঃপর মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—'মহান আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ; তিনিও কি এ সময় ঘুমিয়ে আছেন?' লোকটি বললো,—'আল্লাহ্ তা'আলা ঘুমান না ; নিদ্রা বা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।' মহিলা বললো,—'যে সত্তা ঘুমান নাই এবং যিনি কখনও ঘুমাবেন না, সর্বদা সজাগ ও চিরঞ্জীব সেই সত্তা আমাদেরকে দেখছেন ; যদিও অন্যান্য লোকজনের কেউ আমাদেরকে দেখছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের অধিকতর ভীত-শঙ্কিত হওয়া উচিত।' মহিলার এ বক্তব্য শুনে লোকটির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সঞ্চারিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ সত্যিকার তওবা করে সে উক্ত গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করলো। কিছুকাল পর সে মারা গেলে এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে সে বলেছে ঃ 'আল্লাহ্র ভয়ে আমি পাপকার্য হতে বিরত হওয়ার কারণে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ লোক ছিলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে দারিদ্র্য অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একদা জঠর জ্বালায় অস্থির হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশে তিনি স্ত্রীকে বাহিরে পাঠালেন। স্ত্রী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির দারস্থ হয়ে সন্তানদের জন্য কিছু প্রার্থনা করলে লোকটি বললো,—'অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু দান করবো ; কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে ভোগ করতে চাই।' একথা শুনে স্ত্রীলোকটি নিশ্চুপ গৃহে ফিরে আসলো। গৃহে এসে দেখে সন্তানরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মা'কে দেখে ওরা তার কাছে খাবারের জন্য আর্তি করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি সন্তানদের এহেন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পুনরায় সেই লোকটির দারস্থ হয়ে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলো। স্ত্রীলোকটি প্রথমবারের বিপরীত

এবার দেহ দানের জন্য রাজী হয়ে গেল। অতঃপর ধনাঢ্য লোকটি স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য যখন উদ্যত হলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর হঠাৎ এমনভাবে কাঁপতে আরম্ভ করলো যে, তার শরীরের জোড় গ্রন্থিসমূহ যেন উপ্‌ড়ে যাবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো,—'তোমার এ অবস্থা হচ্ছে কেন?' স্ত্রীলোকটি বললো,—'আমি মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করি, ফলে আমার এ অবস্থা হয়েছে।' লোকটি বললো,—'তোমার এহেন ভূখা-ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহ্‌র প্রতি তুমি এত প্রবল ভীতি ও শঙ্কা বোধ করছো! তা'হলে তো আমার পক্ষে আল্লাহ্‌কে আরও অধিক ভয় করা উচিত।' এ কথা বলে সে উক্ত গর্হিত কাজ হতে বিরত হয়ে গেল এবং স্বচ্ছ অন্তরে মহিলাকে তার প্রয়োজনের চাইতেও অধিক মাল-সম্পদ দিয়ে বিদায় করলো। মহিলা ঘরে ফিরে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আনন্দচিত্তে সকলের জঠর-জ্বালা নিবারণ করলো।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'হে মূসা! তুমি আমার সেই ধনাঢ্য বান্দাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আমি তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) সেই বান্দার নিকট গমন করে বললেন, —'তুমি এমন কি সৎকাজ করেছো? যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন?' লোকটি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পূর্বাপর সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালো। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুসংবাদটি শুনিয়ে বিদায় নিলেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,— মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا اَجْمَعُ عَلٰى عَبْدِىْ خَوْفَيْنِ وَ لَا اَمْنَيْنِ۔ مَنْ خَافَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَمَنْتُهٗ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَمِنَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَخَفْتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

'আমি কখনও স্বীয় বান্দার মধ্যে দুইটি ভয় এবং দুইটি অভয় একত্রিত

করি না। যে-বান্দা ইহজগতে আমার ভয়ে থাকবে, পরকালে আমি তাকে নির্ভয় রাখবো। আর যে-ব্যক্তি ইহলোকে আমা হতে নির্ভয় থাকবে, পরলোকে আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবো।'

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ٥

'তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর।'

(মায়িদাহ্ ঃ ৪৪)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥

'তোমরা তাদেরকে ভয় করো না ; ভয় আমাকেই কর, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।' (আলি-ইম্‌রান ঃ ১৭৫)

আমীরুল-মুমেনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) আল্লাহর ভয়ে মাটিতে ঢলে পড়তেন। তিনি কুরআনের কোন আয়াত শ্রবণ করলে মূর্ছিত হয়ে যেতেন। একদা একটি খড়কুটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন,—'হায়! আমি যদি এই খড়কুটাটিই হতাম ; আমাকে যদি কেউই উল্লেখ না করতো।' তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন ঃ 'হায়! কতই না ভাল হতো, যদি উমর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠই না হতো।' আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তিনি এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতেন যে, অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপর দু'টি কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে গিয়েছিল।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ -

'আল্লাহ্‌র ভয়ে যে-ব্যক্তি রোদন করে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না, যেমন স্তন হতে নির্গত দুগ্ধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করে না।'

'রাকায়েকুল-আখ্‌বার' কিতাবে আছে ঃ ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে

আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। প্রচুর পাপের কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেওয়া হবে। এমন সময় তার চোখের একটি পশম কথা বলবে এবং আরজ করবে ঃ 'হে পরওয়ারদিগার! আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ تِلْكَ الْعَيْنَ عَلَى النَّارِ.

('যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।')

আর আমি আপনার ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করেছি। অতএব আমি আপনার নিকট দোযখের অগ্নি হতে মুক্তি প্রার্থনা করি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই পশমকে মুক্তি দিবেন এবং এই একটি পশমের ওসীলায় সেই বান্দাকেও দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। তারপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দিবেন যে,—'অমুক বান্দাকে শুধুমাত্র একটি পশমের ওসীলায় দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।'

'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' কিতাবে আছে ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ভয় ও আতঙ্কের আতিশয্যে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলেই হাঁটু গেড়ে ভূতলে আছড়িয়ে পড়বে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا ط
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

'আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা' করতে অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।' (জাসিয়াহ্ ঃ ২৮)

জাহান্নামকে উপস্থিত করা হলে সমবেত সকলেই জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার শুনবে। এ হুংকার ও গর্জন পাঁচশত বৎসরের পথ পরিমাণ দূরত্ব হতেও শ্রুত হবে। এহেন ভয়াবহ অবস্থায় প্রত্যেকেই এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত কেবল নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন এবং 'নাফ্সী নাফ্সী'

বলে উদ্বেগ করবেন। একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য চিন্তা করবেন এবং 'উম্মতী উম্মতী' বলে বেকারার থাকবেন। এ সময় জাহান্নাম থেকে পর্বতসম উঁচু হয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে। উম্মতে মুহাম্মদী এই ভয়াবহ অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়াস চালাবে এবং এই বলে দো'আ করবে,—'হে অগ্নি! নামাযী ব্যক্তিদের ওসীলায়, দান-খয়রাতকারীগণের তোফায়লে, নিষ্ঠাবান ও রোযাদার লোকদের দোহাই—তুমি তোমার এই ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের থেকে দূরে সরে যাও।' এদিকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সজোরে চিৎকার করে বলে উঠবেন ঃ 'ওই যে সেই ভয়াবহ অগ্নি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' একথা বলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) পানি-ভর্তি একটি পাত্র এনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে দিয়ে বলবেন,—এই নিন পানির পেয়ালা ; এই পানি আপনি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ সেই পানি দোযখের অগ্নির উপর ছিটিয়ে দিবেন। ফলে, সেই ভয়াবহ অগ্নি মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন,—'হে জিব্‌রাঈল! বলুন, এটা কিসের পানি?' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জওয়াবে বলবেন ঃ 'এটা আপনার উম্মতের মধ্যে গুনাহ্‌গার লোকদের অশ্রুজল, যা খোদার ভয়ে রোদন করার কারণে তাদের চোখ হতে নির্গত হয়েছে ; অদ্যকার এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দোযখের অগ্নি নিবারণের জন্য এ পানি আপনাকে দিতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে এবং গোনাহ্‌গার লোকদের এই আঁখিজলের ওসীলায়ই আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকে নির্বাপিত করে দিয়েছেন।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ تَبْكِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ الدَّمْعُ دَمًا۔

'হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে দু'টি ক্রন্দসী চক্ষু দান করুন, যে দু'টির দ্বারা আমি আপনার ভয়ে রোদন করতে পারি—সেই (হাশরের) দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই, যেদিন (স্বীয় পাপের কারণে) রক্তের অশ্রু কাঁদতে হবে (তবুও কোনও কাজ হবে না।)।

জনৈক কবি বলেছেন ঃ

أَعَيْنَيَّ هَلَّا تَبْكِيَانِ عَلَى ذَنْبِي
تَنَاثَرَ عُمْرِي مِنْ يَدِي وَلَا أَدْرِي

'ওহে চক্ষুযুগল! আমার কৃত পাপকার্যের উপর তোমরা রোদন কর না কেন? আফ্‌সুস! জীবনের মুহূর্তগুলো গাফলত ও শৈথিল্যের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে গেল ; অথচ আমি তা' টেরও করতে পারলাম না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কোন বান্দার চক্ষু হ'তে আল্লাহ্‌র ভয়ে যদি অন্ততঃপক্ষে মক্ষিকার মস্তক পরিমাণ অশ্রু নির্গত হয়ে তার মুখমণ্ডলকে উষ্ণ করে, তা'হলে তার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে যাবে।'

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুন্‌যির (রহঃ) যখন আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করতেন, তখন নির্গত অশ্রু স্বীয় মুখমণ্ডল ও দাড়িতে মর্দন করে বলতেন,—'এই অশ্রুজল যে-যে স্থানে পৌঁছবে, সেসব স্থানকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবে না।' অতএব প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য,—আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে সর্বদা নিবৃত্ত রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

'যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি তার পরওয়ারদিগারের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বেচ্ছাচারিতা হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, তার ঠিকানা জান্নাত।' (নাযি'আত ঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার আযাব হ'তে আত্মরক্ষা করতে হলে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করতে হলে, দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। সেইসঙ্গে সর্ববিধ পাপাচার পরিহার করে এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

'যাহ্‌রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন বেহেশ্‌তী লোকদেরকে বেহেশ্‌তে স্থান দেওয়া হবে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ সর্বপ্রকার বেহেশ্‌তী নেয়ামত ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাঁদের সাদর-সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন করবে, তাঁদের জন্য মঞ্চ স্থাপন করবে এবং রকমারী খাদ্য-সামগ্রী ও ফলমূল পেশ করবে। এসব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে বেহেশ্‌তীগণ হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো কেন? আমার এই বেহেশ্‌ত কোনরূপ দুঃখ-ক্লেশ ও বিড়ম্বনার স্থান নয়।' বেহেশ্‌তবাসীরা আরজ করবে,—'হে পরওয়ারদিগার! আমাদের সাথে আপনার একটি ওয়াদা ছিল, সেটা পূরণ হওয়ার সময় এসে গেছে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে হুকুম করবেন যে, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের সম্মুখ হতে পর্দা সরিয়ে নাও, কেননা এঁরা দুনিয়াতে আমাকে স্মরণ করেছে, আমার যিক্‌র করেছে, আমাকে সিজদা করেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত ও দীদারের আকাংখা পোষণ করেছে। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে ফেরেশতাগণ যখন পর্দা সরিয়ে নিবে, তখন বেহেশতবাসীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় পড়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সিজদা হতে মাথা উঠাতে হুকুম করে বলবেন যে, এটা আমল ও ইবাদতের স্থান নয় ; এটা ভোগ-বিলাস ও পুরস্কার-প্রতিদানের স্থান। এরপর থেকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার স্বাভাবিকভাবেই লাভ করতে সমর্থ হবে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আনন্দবৃদ্ধির জন্য বলবেন,—'হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! তোমাদের উপর

সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তোমরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।' বেহেশতবাসীগণ বলবে,—'আমরা আপনার প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট ; কারণ আপনি আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং কল্পনাও করতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেছেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط

'আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।'
(বাইয়্যিনাহ ঃ ৮)

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ٥

'করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।'
(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

অধ্যায় ঃ ৩

রোগ-শোক ও ধৈর্য-সহ্য

আখেরাতের জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গজব হতে যে ব্যক্তি বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির যে ব্যক্তি অন্তরে আশা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী-অনুরাগী, তার কর্তব্য হলো— দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে নিজেকে সংযত করতে হবে, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

'আল্লাহ্ তা'আলা ছবরকারীদের ভালবাসেন।'

ছবর বা ধৈর্য চার প্রকারে বিভক্ত। যথা ঃ এক,— আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদতসমূহ সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করা। দুই,— আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ছবর করা। তিন,— দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-আপদে ছবর করা। চার,— কোন মুসীবতে পতিত হওয়ার অব্যবহিত পর প্রথম অর্ন্তজ্বালার মুহূর্তেই ছবর করা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত ও ফরয কার্য সমাধা করার ব্যাপারে ছবর করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তিনশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অনুরূপ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ছয়শত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে সপ্তম আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসীবতে ধৈর্যধারণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাতশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আরশ থেকে ভূগর্ভের (যমীনের

সর্বনিম্ন সপ্তম তবকের) নীচ পর্যন্ত দুরত্বের সমান।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِيْ اِلَّا اَعْطَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يَسْئَلَنِيْ وَاسْتَجَبْتُ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَدْعُوَنِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهٖ بَلِيَّةٌ فَاعْتَصَمَ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِيْ اِلَّا اَغْلَقْتُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ۔

'আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'কোন বান্দা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর যদি একমাত্র আমারই উপর ভরসা করে এবং আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে দৃঢ় পদ থাকে, তা'হলে আমার কাছে প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমাকে উপেক্ষা করে কোন মাখলুকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা'হলে আমি তার জন্য আসমানের দরজা (সাহায্য) বন্ধ করে দিই।'

অতএব, সত্যিকার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো—আপদ-বিপদে, দুঃখ-দৈন্যে ধৈর্যধারণ করা ; এ ব্যাপারে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন না করা। তা'হলেই দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে। প্রণিধানযোগ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়া-বুযুর্গানকে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'দুঃখ-দৈন্য ও আপদ-বিপদ হচ্ছে খোদা প্রেমিকের জন্য মশালস্বরূপ, ধর্মপথে বিচরণকারীর জন্য চেতনাবর্দ্ধক, মুমিনের জন্য সংশোধনকারী এবং উদাসীন ও গাফেলের জন্য ধ্বংসের উপকরণ।' বস্তুতঃ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে হলে আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে ; আল্লাহ্র প্রতি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হবে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَرَجَ مِنْ

ذُنُوبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ فَاِذَا مَرِضْتُمْ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْعَافِيَةَ ـ

'যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে একটি রাত্র অতিবাহিত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে দিবেন। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলেই রোগমুক্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেয়ো না।'

হযরত যাহ্হাক (রহঃ) বলেন ঃ 'অন্ততঃ চল্লিশ দিনে একবার আপদ-বিপদ বা দুঃখ-কষ্টে পতিত না হলে কি করে তুমি আল্লাহ্র কাছে দয়া ও রহমতের আশা করতে পার?'

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে রোগাক্রান্ত করেন, তখন বাম কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে তার পাপরাশি লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে দেন এবং ডান কাঁধের ফেরেশ্তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব ইবাদত ও নেক আমল করতে সক্ষম ছিল, তার আমলনামায় সেগুলোর সওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার এই বান্দা কি আমল করে, তা তোমরা লক্ষ্য কর। অসুস্থ বান্দা যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা'হলে ফেরেশ্তাগণ বান্দার এই গুণকীর্তন আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ উক্ত বান্দার আমার উপর হক ও প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে ; সুতরাং আমি যদি এই পীড়িতাবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করি, তা'হলে অবশ্যই তাকে জান্নাত দিবো। আর যদি রোগ হতে মুক্তি দান করি, তা'হলে তার স্বাস্থ্য, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশী ও রক্ত প্রবাহ পূর্বের চাইতে আরও উন্নততর করে দিবো এবং সেইসঙ্গে তার সমুদয় গুণাহ্ মাফ করে দিবো।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ভবঘুরে ও লম্পট লোক ছিল। বিভিন্ন

ধরনের গর্হিত কাজে সে লিপ্ত থাকতো। নগরবাসীর বহু চেষ্টাও তার কোন প্রকার সংশোধন করতে পারে নাই। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে সকলেই আল্লাহ্‌র দরবারে তার কদর্যতা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন ভণ্ড যুবক আছে, তাকে শহর হতে বহিস্কার করে দাও, যাতে শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পাপের কারণে সমগ্র নগরবাসীর উপর আমার গযব নাযিল না হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাকে বহিস্কার করে দিলেন। কিন্তু সেই যুবক শহর হতে বহিস্কৃত হয়ে পার্শ্ববর্তী অপর এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট পুনরায় ওহী পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকেও বহিস্কার করার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাই করলেন। অবশেষে লোকটি এক নির্জন প্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। যেখানে মানুষ বা পশুপক্ষী এমনকি তরুলতা বলতে কিছুই ছিল না। পরবর্তী এক পর্যায়ে লোকটি সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এহেন অসহায় অবস্থায় তার পার্শ্বে সাহায্যকারী বলতে কেউ ছিল না। এই করুণ অবস্থায় সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাটির উপর মাথা রেখে বারবার বলছিল ঃ 'হায়! আজকে যদি আমার মা আমার কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার দুঃখে দুঃখিতা হতেন, আমার সেবা-শুশ্রূষা করতেন, মায়া-মহব্বত করতেন, আমার জন্য নয়ন সিক্ত করে রোদন করতেন। হায়! আজকে যদি আমার পিতা কাছে থাকতেন, তা'হলে তিনি আমার সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। হায়! যদি আমার স্ত্রী পার্শ্বে থাকতো, তা'হলে সে আমার দুঃখে ক্রন্দন করতো। হায়! যদি আমার সন্তান-সন্ততি এখানে থাকতো, তা'হলে তারা আমার মৃতদেহের পার্শ্বে বসে কান্নাকাটি করতো আর বলতো,—হে আল্লাহ্! আমাদের প্রবাসী পিতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তিনি অসহায় দুর্বল, তোমার না-ফরমান, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী ; লোকেরা তাকে শহর থেকে বস্তিতে বের করে দিয়েছে, পুনরায় তাকে বস্তি থেকে বিজন প্রান্তরে বহিস্কার করেছে ; আর আজকে তিনি ইহকালের এই বিজন ভূমি থেকে পরকালের পথে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, সবকিছু থেকে তিনি নিরাশ ও বঞ্চিত হয়ে একমাত্র তোমার পানে

রওয়ানা হচ্ছেন। আয় আল্লাহ্! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে সুদূর প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছেন, জীবনের এই করুণ মুহূর্তে দয়া করে আমাকে আপনার রহমত ও করুণা থেকে চিরবঞ্চিত করবেন না। তাদের বিচ্ছেদে আপনি আমার অন্তর দগ্ধীভূত করেছেন, মেহেরবানী করে আমার পাপরাশির কারণে আমাকে দোযখের অগ্নিতে দগ্ধীভূত করবেন না।'

লোকটির এই করুণ আর্তনাদ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হলো। তার স্ত্রী ও মা'র আকৃতি দিয়ে দু'জন হূর, সন্তান-সন্ততির আকৃতি দিয়ে জান্নাতের কয়েকজন শিশু-কিশোর এবং পিতার আকৃতি দিয়ে একজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিলেন। তারা সকলেই লোকটির পার্শ্বে বসে ক্রন্দন করতে লাগলো। এভাবে সকলের উপস্থিতিতে সে আনন্দচিত্তে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় এবং আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। এভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! তুমি অমুক বিজন প্রান্তরে গিয়ে দেখ, আমার এক প্রিয় বান্দার ইন্‌তিকাল হয়েছে, তুমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তথায় গিয়ে সে যুবকটিকেই দেখলেন, যাকে তিনি ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র হুকুমে শহর থেকে বস্তিতে আবার বস্তি থেকে বিজন ভূমিতে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি আরও দেখলেন যে, লোকটির আশেপাশে বেহেশ্‌তের হূর-পরীগণ তাকে বেষ্টন করে বসে আছে। এতদ্দর্শনে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট আরয করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই লোকটি তো সে-ই যাকে আমি আপনার হুকুমে শহর ও বস্তি থেকে বহিষ্কার করেছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! আমি তার প্রতি দয়া ও রহমত নাযিল করেছি এবং তার যাবতীয় পাপকার্য ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ, সে এই বিজন প্রান্তরে স্বীয় জন্মভূমি, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবস্থায় কান্নাকাটি করেছে। আমি তার মা'র দেহাবয়বে বেহেশতের হূর, তার পিতার সাদৃশ্যে বেহেশতের ফেরেশ্‌তা এবং তার স্ত্রীর আকৃতিতে অপর একজন হূর পাঠিয়ে দিয়েছি। এরা সকলেই আমার কাছে

তার এই দুঃখ-যাতনায় ভরপুর মুসাফেরী অবস্থার প্রতি রহম ও করুণার জন্য প্রার্থনা করেছে। একজন আশ্রয়হীন মুসাফির যখন মারা যায়, তখন আসমান ও যমীনের সমগ্র মখলুক তার প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) প্রার্থনা করতে থাকে ; সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি তার প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবো না? অথচ আমিই একমাত্র অনন্ত মেহেরবান ও অসীম দয়ালু।'

কোন মুসাফির যখন অন্তিম সময়ে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে আমার ফেরেশ্‌তাগণ! লোকটি স্বদেশত্যাগী মুসাফির, স্বীয় পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বহুদুরে অবস্থানরত। মৃত্যুর পর তার জন্য ক্রন্দনকারী অথবা শোক বা দুঃখ প্রকাশকারী কেউ নাই।' একথা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতি ও দেহাবয়বে কয়েকজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দেন। তারা সেই মুসাফির ব্যক্তির শিয়রপার্শ্বে উপবেশন করলে, সে চক্ষু উম্মিলন করে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করে। অতঃপর এই উৎফুল্ল অবস্থাতেই সে ইহজগত ত্যাগ করে। তারপর যখন এ ব্যক্তির জানাযা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ফেরেশ্‌তাগণও তার সঙ্গে থাকেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে তার মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।' (শূরা ঃ ১৯)

হযরত ইব্‌নে আত্তার (রহঃ) বলেন ঃ 'তুমি যদি কোন বান্দার অন্তকরণের সত্যাসত্য ও প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে চাও, তা'হলে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও দুঃখ-কষ্ট উভয় অবস্থার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি সে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে, অথচ দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ করে, তা'হলে বুঝতে হবে সে মিথ্যুক ও প্রতারক। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র জ্বিন ও মানবের সাকুল্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, অতঃপর কোন দুর্ভোগে পতিত হওয়ার পর কোনরূপ শেকায়াত বা অভিযোগ

উত্থাপন করে, তা'হলে এ কথা নিশ্চিত যে, তার সমস্ত ইল্‌ম ও জ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ বৃথা এবং সমগ্র আমল ও ইবাদত একেবারে নিষ্ফল। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِىْ وَلَمْ يَشْكُرْ لِعَطَائِىْ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِىْ

'যে ব্যক্তি আমার (নির্ধারিত) তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমার দান ও নে'আমতে অকৃতজ্ঞ, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন রব তালাশ করে নেয়।'

হযরত ওয়াহ্ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'একজন নবী দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' নবী বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমার কোন্ বিষয় ক্ষমা করলেন ; আমি তো জীবনে কোন গুনাহ্-ই করি নাই।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীর একটি শিরাকে আদেশ করলেন। ফলে, সেই শিরাতে অসহনীয় বিষ-বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল এবং বিষম যন্ত্রণায় নবী সারারাত্রি ঘুমাতে পারলেন না। সকাল বেলা আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ 'আপনার মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইবাদত আমার দেওয়া একটা সামান্য সুস্থ শিরা'র নে'আমতের সমান নয়।'

অধ্যায় ঃ ৪

আধ্যাত্মিক সাধনা ও রিপুর তাড়না

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন ঃ 'হে মূসা! তোমার কথা তোমার জিহ্বার যতটুকু নিকটবর্তী, অনুরূপ তোমার হৃদস্পন্দন তোমার হৃদয়ের, তোমার রূহ তোমার দেহের, তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের, তোমার শ্রবণশক্তি তোমার কানের যতটুকু নিকটবর্তী, সেই তুলনায় তুমি যদি চাও—আমি (আল্লাহ্) তোমার আরও অধিকতর নিকটবর্তী হই, তা'হলে তুমি আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ

'প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা।' (হাশর ঃ ১৮)

অর্থাৎ,- হে মানব! কিয়ামতের দিন জবাবদেহী করার জন্য তুমি কি আমল করেছো?

এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমার নফস বা রিপুই হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন। এমনকি শয়তানের চেয়েও সে তোমার জন্য অধিকতর জঘন্য ও মারাত্মক। কারণ, খোদ শয়তানও প্রকৃতপক্ষে তোমার রিপুর তাড়না ও কামনা-বাসনা থেকেই শক্তি যুগিয়ে থাকে। তারপর সে তোমাকে ধোকা-প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে তোমার ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। অতএব এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। প্রবৃত্তির তাড়নায় অহেতুক কামনা-বাসনা ও আকাংখা-অভিলাষের মাধ্যমে নিজকে শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত করো না। নফস বা কুপ্রবৃত্তি সবসময়ই উদাসীন ও অচেতন থাকতে চায়। বস্তুতঃ এটা তার মজ্জাগত স্বভাব, এজন্যে তার সকল দাবীই

মিথ্যা। সুতরাং তাকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করো না, তার সাথে আপোষ করো না। নফসের ধোকায় প্রতারিত হয়ে যদি কোন বিষয়ের প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়ে পড়, তা'হলে এ কথা সত্য জেনে রাখ যে, এই নফস তোমাকে পরিণামে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে ছাড়বে। বস্তুতঃ নফস থেকে কোনই কল্যাণের আশা করা যায় না ; এই নফসই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল, সকল আপদ ও লাঞ্ছনার হেতু, অভিশপ্ত ইবলীসের আসল সম্পদ ও হাতিয়ার, সকল অহিতকর কর্মকাণ্ডের শিকড়। আল্লাহ্ ছাড়া এর প্রকৃত রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, সদাসর্বদা এক আল্লাহ্র ভয় অন্তরে জাগরুক করে রাখ। তিনি সর্বজ্ঞ ; আমলের ভালমন্দ সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

আখেরাতের জীবনকে সুন্দর-সফল ও উন্নততর করার জন্য বান্দা যখন স্বীয় অতীত জীবনের কৃতকর্মের প্রতি চিন্তানিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তকরণকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন করে দেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

'এক মুহূর্তকালের ধ্যানমগ্নতা বছরকালের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।'

হযরত আবুল-লাইস (রহঃ) কর্তৃক বিশ্লেষিত তফসীর থেকে উক্তরূপ ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কর্তব্য হচ্ছে, অতীতের সমুদয় পাপকার্য হতে সঠিক তওবা ও অনুতাপ করা। আখেরাতের জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অধিকতর নৈকট্যলাভের চিন্তা-সাধনায় মনোনিবেশ করা, অনতিবিলম্বে আল্লাহর যিক্‌রে নিমগ্ন হওয়া, সকল হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য পরিত্যাগ করা, প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, নফসানী খাহেশের অনুসরণ চিরতরে পরিহার করা। কেননা, নফস হচ্ছে মূর্তি সদৃশ ; সুতরাং যে ব্যক্তি নফসের তাবেদারী করলো, প্রকারান্তরে সে মূর্তি পূঁজায় লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি নিস্ঠা ও ইখলাসের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হলো, সত্যিকার অর্থে সে-ই হলো নফসের সাথে কঠোর বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রকৃত সংযমী।

কথিত আছে, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) একদা বসরা শহরের একটি বাজার অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি ডুমুর ফলের প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। ফলটি দেখে তাঁর অন্তরে তা' ভক্ষণ করার স্পৃহা জন্মায়। তখন তিনি স্বীয় পাদুকা খুলে বিক্রেতাকে এর বিনিময়ে ফলটি দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ফল বিক্রেতা জুতার মূল্যহীনতার কথা ব্যক্ত করে ফল বিক্রয় করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। অতঃপর মালেক ইব্‌নে দীনার আপন পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে অপর একজন লোক এসে বিক্রেতাকে বললো ঃ 'আপনি কি জানেন, তিনি কে? তিনিই মালেক ইবনে দীনার।' দেশের সুবিখ্যাত বুযুর্গের নাম শুনে লোকটি অত্যন্ত আক্ষেপ করতে লাগলো এবং কৃতদাসের মাথায় ডুমুর বোঝাই একটি টুকরী দিয়ে বললো,—'যাও, যদি ইব্‌নে দীনার এ সবগুলো ফল গ্রহণ করে নেন, তা'হলে তুমি আযাদ ; গোলামীর শৃংখল থেকে তুমি আজ হতে মুক্ত।' গোলাম ছুটে গেল এবং ইব্‌নে দীনারকে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু ইব্‌নে দীনার ফল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। গোলাম পুনরায় অনুরোধ করে বললো,—'আপনি যদি এগুলো কবুল করে নেন, তা'হলে আমি গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।' ইব্‌নে দীনার (রহঃ) এতদসত্ত্বেও অসম্মতি জানিয়ে বললেন ঃ 'আমার গ্রহণ করাটা যদিও তোমার জন্য মুক্তির কারণ ; কিন্তু আমার জন্য তা' শাস্তির কারণ।' গোলাম অতঃপর বারবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন,— 'আমি কসম খেয়ে নিয়েছি যে, ডুমুরের বিনিময়ে আমি আমার ঈমানকে বিক্রি করবো না এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোনদিন ডুমুর খাবো না।'

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) অন্তিমকালীন অসুস্থতার সময় একবার দুধ ও মধু মিশ্রিত গরম রুটির সরীদ (সুস্বাদু খাদ্য) খাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। খাদেম যথাসময়ে সরীদ এনে হাজির করার পর কিছুক্ষণ তিনি সরীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন,—'হে নফস! তুমি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে কৃচ্ছ্র-সাধনায় ধৈর্যধারণ করে আসছো, এখন এই অন্তিম অবস্থায় যখন তোমার মৃত্যুর মাত্র মুহূর্তকাল বাকী আছে, ... এতটুকু বলে তিনি সরীদের পাত্র হাত থেকে রেখে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। বস্তুতঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম

আলাইহিমুস সালাম, আওলিয়া, সাধক, আল্লাহর প্রেমিক ও দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গগণের হৃদয়ের অবস্থাই ছিল এরূপ ; তারা পারলৌকিক সুখ–শান্তির তুলনায় নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করতেন।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন,— 'যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, সে দিগ্বিজয়ী সেনাপতির চাইতেও বড় বাহাদুর।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন,— 'আমার এবং আমার নফসের উপমা হচ্ছে রাখাল ও ছাগলের পালের ন্যায় ; একদিক থেকে একত্রিত সুশৃংখল করে আনে, অপরদিকে সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ যে নিজের নফসকে হত্যা করতে পেরেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমতের কাফন পরিয়ে ইয্যতের মাটিতে দাফন করবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে অকেজো করে রেখেছে, তাকে অভিশাপের কাফন পরানো হবে এবং আযাবের মাটিতে দাফন করা হবে।'

ইয়াহয়া ইব্‌নে মু'আয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদত ও আধ্যাত্ম্য সাধনার মাধ্যমে স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আধ্যাত্ম্য সাধনা হচ্ছে,— নিদ্রা ও খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা, অধিক কষ্ট সহ্য করা, মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা, উৎপীড়নে অধৈর্য হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হওয়া। জেনে রাখ—নিদ্রার স্বল্পতা তোমার অন্তরে নূর সৃষ্টি করবে, তোমার চিন্তাশক্তিতে স্বচ্ছতা আনয়ন করবে। আহারের স্বল্পতা তোমাকে নানাবিধ আপদ থেকে রক্ষা করবে। দুঃখ–কষ্ট ও উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ তোমাকে ইপ্সীত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। পক্ষান্তরে অধিক ভোজন হৃদয়কে কঠিন করে তোলে, অন্তকরণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। বস্তুতঃ ক্ষুধা ও ক্ষুৎপিপাসা মানবহৃদয়ে হিকমত ও তত্ত্বজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা আনয়ন করে। আর পরিতৃপ্ত ভোজন মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'জঠরজ্বালার মাধ্যমে তুমি তোমার অন্তকরণকে জ্যোতির্ময় করে তোল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্ত্রের দ্বারা তুমি তোমার রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হও। ক্ষুধার সাহায্যে তুমি সদা বেহেশ্‌তের দরজায় কষাঘাত করতে থাক। কেননা এতে তোমার আমলনামায় জিহাদের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।' বস্তুতঃ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চাইতে অধিক প্রিয় আল্লাহ্র কাছে আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি অধিক ভোজন করেছে, সে আসমানের মালাকূতী জগতে প্রবেশ করতে পারবে না ; ইবাদতে আস্বাদ গ্রহণ থেকেও সে বঞ্চিত হবে।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর উদরপূর্তি করে কোনদিন আহার করি নাই। কারণ এতে ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অনুরূপ আমি কোনদিন তৃষ্ণা মিটিয়ে পানিও পান করি নাই। কেননা আমার অন্তরে খোদার দীদারের তীব্র আকাংখা রয়েছে।' এতদ্ব্যতীত অধিক ভোজন ইবাদতকার্যে শৈথিল্য ও স্বল্পতা আনয়ন করে। অতিরিক্ত আহারের কারণে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী হয়ে যায়, নিদ্রার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং গোটা দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, মানুষ নিতান্ত নিস্কর্মা হয়ে যায়। বস্তুতঃ মানুষ যদি অতিরিক্ত ঘুমে অভিভূত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তা'হলে এটা নিজকে মৃতদেহে পরিণত করার নামান্তর।

হযরত লুক্মান হাকীম (রহঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—'অধিক মাত্রায় নিদ্রা ও ভোজন থেকে নিজকে বিরত রাখ। কেননা অধিক নিদ্রাযাপনকারী ও অধিক ভোজনকারী ক্বিয়ামতের দিন আমল ও ইবাদতশূন্য হবে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تُمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَمُوتُ كَالزَّرْعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ـ

'অধিক পানাহার করে আত্মাকে নিধন করো না। কেননা অধিক বৃষ্টির কারণে যমীনের ফসল যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অধিক পানাহারে তোমার আত্মাও মরে যাবে।'

জনৈক বুযুর্গ বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন,— 'মানুষের পাকস্থলী হচ্ছে ডেগচি বা রন্ধনপাত্র সদৃশ, এর উপরে রয়েছে আত্মা। পাকস্থলীরূপ ডেগচি হতে বাষ্প নির্গত হয়ে আত্মা পর্যন্ত পৌছে। অধিক ভোজনের ফলে যদি এই বাষ্প অধিক মাত্রায় নির্গত

হয়, তা'হলে অবশ্যই তা' আত্মাকে কলুষিত করে।' বস্তুতঃ অধিক ভোজনে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, মেধার প্রখরতা বিনষ্ট হয়, স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

একদা হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের সাথে অভিশপ্ত ইবলীসের দেখা হয়। ইবলীসের হস্তস্থিত একটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র নবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এটা কি তোমার হাতে?' ইবলীস বললো,— এটা শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তির তাড়না ; এটা দিয়ে আমি বনী আদমকে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে শিকার করার জন্যেও কি তোমার কাছে কিছু আছে? ইবলীস বললো,—'না ; তবে এক রাত্রিতে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করেছিলেন, সেই সুযোগে আমি আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করে নামায হতে উদাসীন করে দিয়েছিলাম।' হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'আজ থেকে আমি আর কোনদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করবো না। 'ইবলীস বললো,— তা'হলে আমিও আজ থেকে আর কোনদিন বনী আদমকে নসীহত করবো না। প্রিয় সাধক! চিন্তা কর, শুধুমাত্র এক রাত্রির তৃপ্ত আহারের এই পরিণাম! আর যারা জীবনের একটি রাত্রিও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটায় নাই, তাদের দ্বারা আল্লাহ্র কি ইবাদত হতে পারে?

এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি আল্লাহর যিক্র করতে পারেন নাই। অতঃপর তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এসেছে ঃ 'হে ইয়াহ্ইয়া! আমার বেহেশতের চাইতেও কি উত্তম কোন আবাসস্থল তুমি পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চাইতেও কি উত্তম কোন সাহচর্য তুমি লাভ করেছো? তবে কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, যদি তুমি আমার তৈরী বেহেশ্তের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, আর পরক্ষণে জাহান্নামের প্রতিও এক পলক তাকাও, তা'হলে অবশ্যই তুমি রক্তের অশ্রুধারা প্রবাহিত করবে এবং বস্ত্রের পোষাক পরিহার করে লোহার পোষাক পরিধান করবে।'

অধ্যায় ঃ ৫

রিপুর প্রভাব ও শয়তানের শত্রুতা

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কাজ হচ্ছে,—ক্ষুধা ও ক্ষুৎসাধনার মাধ্যমে রিপুর তাড়না ও কাম উত্তেজনাকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। কেননা খোদার দুশমন শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষুৎসাধনাই হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। পাপিষ্ঠ শয়তান প্রবৃত্তির সাধ–অভিলাষ ও অধিক পানাহারকেই কেন্দ্র করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْعِ ـ

'শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের ন্যায় প্রবহমান হয়, সুতরাং তোমরা শয়তানের এ প্রবাহপথকে ক্ষুৎসাধনার দ্বারা বন্ধ করে দাও।'

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তিই, যে দুনিয়াতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করেছে। বস্তুতঃ অধিক ভোজনস্পৃহা আদম সন্তানকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে নেয়। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম চিরশান্তির আবাস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়ে এই অশান্তির জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন,—এর পিছনেও কারণ ছিল ভোজনস্পৃহা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বেহেশ্তের একটি নির্দিষ্ট ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তখন একমাত্র অধিক ভোজনস্পৃহার কারণেই তাঁরা উক্ত নির্দেশ পালন করতে পারেন নাই। ফলে, তাঁদের লজ্জাবরণ সংরক্ষিত থাকে নাই। মোটকথা, উদরই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ পাপাচারের উৎস ও ধ্বংসের মূল কারণ। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় রিপুর কাছে পরাজিত হলো, সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে গেল। তার অন্তর হিত–কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যমীনে

স্বেচ্ছাচারিতার পানি সিঞ্চন করলো, সে মূলতঃ আপন অন্তঃকরণে লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের বৃক্ষ রোপণ করল।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতে তিন প্রকার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন ঃ এক,—ফেরেশতা। এঁদেরকে তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন ; কিন্তু কামভাব দেন নাই। দ্বিতীয়,— জীব-জন্তু। এদেরকে কামভাব দিয়েছেন ; কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি দেন নাই। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে মানব। এদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি এবং কামভাব উভয়টাই দান করেছেন। এদের মধ্যে যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে বলবান করে কামরিপু ও যথেচ্ছাচারিতাকে দুর্বল ও পরাজিত করতে পেরেছে, তারা ফেরেশ্তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আর যাদের বিবেক-বুদ্ধি রিপুর কাছে পরাজয় বরণ করেছে, তারা হিংস্র জীব-জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন,—'একদা আমি 'লাকাম' পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি আনারের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ায় অন্তরে সেটি খাওয়ার আকাংখা সৃষ্টি হলো। আনারটি হাতে নিয়ে বিদীর্ণ করে সামান্য স্বাদ গ্রহণ করার পর টক হওয়ার কারণে সেটি ফেলে দিলাম। অতঃপর পথ চলাকালে একজন লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো ; লোকটি রাস্তায় নেহায়েত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে আর অজস্র ভীমরুল তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আমি তাকে সালাম প্রদান করলে সে উত্তরে বললো ঃ 'ওয়াআলাইকুমুস সালাম হে ইব্রাহীম! আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কিভাবে চিনতে পারলেন? লোকটি বললো, যে আল্লাহ্কে চিনতে পেরেছে তার কাছে গোপন ও অপরিচিত বলতে কিছু নাই। আমি বললাম, আল্লাহ্র সাথে আপনার অতি রহস্যপূর্ণ অবস্থা আমি লক্ষ্য করেছি ; আপনি কি ভীমরুলের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেন নাই? অতঃপর লোকটি বললো,—আমিও আপনার বিশেষ রহস্যময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি ; আপনি কি আনার ফলের লোভ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোনাজাত করেন নাই? শুনুন, ভীমরুলের উৎপীড়ন-যন্ত্রণা শুধু ইহকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, আর আনারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টির প্রায়শ্চিত্ত আখেরাতেও ভোগ করতে হবে। ভীমরুল কেবল দৈহিক যন্ত্রণা দিতে পারে ; কিন্তু লোভ-লালসা অন্তরাত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। একথা শুনার পর আমি সেখান

থেকে প্রস্থান করলাম।'

বস্তুতঃ রিপুর তাড়না ও যথেচ্ছাচারিতা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করে এবং ধৈর্য ও সংযম গোলামকে বাদশাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও যুলায়খার জীবনালেখ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ) ধৈর্য ও সংযমশীলতার ফলশ্রুতিতে মহান সম্রাট ও শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর যুলায়খা শুধুমাত্র কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণতিতে জঘন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারণ যুলায়খা হযরত ইউসুফকে ভালবাসতে গিয়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও সংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আবুল হাসান রাযী (রহঃ) স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর দুই বৎসর পর স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আলকাতরার পোষাক পরিহিত অবস্থায় আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আব্বাজান! আপনার অবস্থা দোযখবাসীদের ন্যায় দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি?' পিতা বললেন,— 'হে পুত্র! আমার রিপু ও কুপ্রবৃত্তি আমাকে দোযখে ঠেলে দিয়েছে। প্রিয় পুত্র! নফস ও প্রবৃত্তির ব্যাপারে তুমি কখনো গাফেল হয়ো না ; সদা সতর্ক ও সচেতন থেকে এহেন শত্রু হতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর। কেননা আজকে আমার এ দুর্দশার কারণই হচ্ছে ইবলীস, দুনিয়ার মোহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং কাম-বাসনা চরিতার্থকরণ। এরই ফলশ্রুতিতে আমি ধ্বংস ও বিনাশের এই অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। নিজের দুর্ভাগ্য আমি নিজেই টেনে এনেছি, জেনেশুনে শত্রুকে প্রশ্রয় দিয়েছি। ফলে, আমি নাজাতের কোনই আশা করতে পারছি না।'

হযরত হাতেম আছাম্ম (রহঃ) বলেন,—'প্রবৃত্তি আমার সীমান্ত রেখা, জ্ঞান-বিদ্যা আমার অস্ত্র, পাপ আমার লাঞ্ছনা ও অপমান, শয়তান আমার শত্রু এবং রিপু আমার প্রতারক ও প্রবঞ্চনাকারী।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'জিহাদ তিন প্রকারে বিভক্ত ঃ এক,— পথভ্রষ্ট ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

'তাদের সাথে বিতর্ক করুন সদ্ভাবে।' (নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে,—কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ; এটা স্পষ্ট যুদ্ধ। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

'তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে।' (মায়িদাহ্‌ ঃ ৫৪)

তৃতীয়,—রিপু ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা । যেমন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

'যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ (সাধনা) করে, তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।' (রূম ঃ ৬৯)

এই মর্মে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ -

'রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হচ্ছে উত্তম জিহাদ।'

সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বলতেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ -

'আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ সমাপন করে বৃহত্তম জিহাদে (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে) প্রত্যাবর্তন করেছি।' প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণকে 'বৃহত্তম জিহাদ' নামে অভিহিত করার তাৎপর্য হচ্ছে,—কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারটা একান্ত সাময়িক ; কিন্তু শয়তান, কাম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি মানুষের সার্বক্ষণিক শত্রু, হর-হামেশা মানুষের সাথে এদের বিসম্বাদ লেগেই থাকে। এছাড়া কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ব্যক্তি শত্রুকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে ; কিন্তু নফ্‌স ও শয়তান মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৃশ্যমান শত্রুর চাইতে অদৃশ্য শত্রু মারাত্মক

ও ধ্বংসাত্মক হয় বেশী। এছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে,—শয়তান সরাসরি রিপু ও কুপ্রবৃত্তিকে তোমার বিরুদ্ধে সাহায্য করে ; আর এক্ষেত্রে রিপুই হচ্ছে সকল অনিষ্ট ও স্বেচ্ছাচারিতার মূল। পক্ষান্তরে কাফের তোমার রিপু বা নফ্সের পক্ষে সাহায্যকারী নয়। এতদ্ব্যতীত আরও কারণ হচ্ছে যে, কোন কাফেরকে তুমি হত্যা করতে সক্ষম হলে গণীমতের মাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে ; আর যদি কোন কাফেরের হাতে তুমি নিহত হও, তা'হলে শাহাদতের মর্যাদা ও জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার স্বার্থ ও কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমার নাই ; অথচ তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা শয়তানের আছে। খোদা না করুন যদি শয়তান তোমাকে ধ্বংস করে ফেলে, তা'হলে তুমি চিরশাস্তির ফাঁদে পড়ে গেলে। সুতরাং এখানে উভয় দিকেই তোমার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য। এজন্যেই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন ঃ 'যুদ্ধক্ষেত্রে যার ঘোড়া পলায়ন করে, সে শত্রুর হাতে বন্দী হয়, আর শয়তানের ফাঁদে পড়ে যার ঈমান বিলুপ্ত হয়, সে আল্লাহ্র আযাব ও গজবে গ্রেফতার হয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি কাফেরের হাতে বন্দী হয়, তার হস্তদ্বয় জিঞ্জীর দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয় না, তার পদদ্বয় বাঁধা হয় না, তার উদর অভুক্ত থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব ও গজবে গ্রেফতার ব্যক্তির অবস্থা খুবই করুণ, খুবই মারাত্মক,—তার মুখমণ্ডল কালো অন্ধকার করে দেওয়া হয়, হস্তদ্বয় লোহার শিকল দিয়ে গলার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, পায়ে আগুনের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়, অগ্নি পান করানো হয়, অগ্নি খাওয়ানো হয়, অগ্নির পোষাক পরানো হয়।'

অধ্যায় ঃ ৬

গাফলতি ও উদাসীনতা

গাফলতি ও উদাসনীতা মানুষের আফ্‌সূস ও হা-হুতাশ বৃদ্ধি করে, শুভ পরিণতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ থেকে মাহ্‌রূম করে, ইবাদতের বিঘ্নতা ঘটায়, হিংসা-দ্বেষ বাড়িয়ে তোলে, পরিণামে লজ্জা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও অপমানের কারণ হয়।

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি তার উস্তাদকে মৃত্যর পর স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আপনি দুনিয়ার কোন্ বিষয়টির উপর আক্ষেপ করাকে সবচেয়ে মারাত্মক পেয়েছেন?' উত্তরে তিনি বলেছেন,-'গাফলতি ও অসাবধানতার আক্ষেপকে।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর মহান দরবারে দণ্ডায়মান করে বলেছেন ঃ হে মিথ্যুক! হে অসত্যের দাবীদার! তুমি আমার প্রতি কৃত্রিম ভালবাসার দাবী করেছো, অতঃপর আমা হতে উদাসীন ও অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছো।' জনৈক বুযুর্গ স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আব্বাজান! পরকালের এই জগতে আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন,—'ওহে বৎস! দুনিয়াতে আমি গাফেল ও উদাসীন ছিলাম এবং সে অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হয়েছে, ফলে এখন আমার নানাবিধ কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।'

'যাহ্রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে,—হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সাথে মালাকুল-মওতের সখ্যতার সম্পর্ক ছিল ; তাই মালাকুল-মওত প্রায়ই হযরত ইয়াকূবের নিকট আসা-যাওয়া করতেন। একদিন হযরত ইয়াকূব তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জান কবজ করতে? তিনি বললেন,—সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। অতঃপর হযরত

ইয়াকুব (আঃ) বললেন,—'আপনার নিকট আমার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন যে, আমার মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হবে এবং আপনি আমার জান কবজ করার উদ্দেশে আগমন করবেন, তখন পূর্বাহ্নেই আমাকে অবগত করে দিবেন।' হযরত মালাকুল-মওত সম্মতি ব্যক্ত করে বললেন,—'মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই আমি আপনার নিকট তিনটি বার্তা পাঠাবো, তখন বুঝে নিবেন যে, আপনার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী।' কিছুদিন পর হযরত ইয়াকুবের অন্তিম সময়ে মালাকুল-মওত উপস্থিত হলে তিনি আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মালাকুল-মওত রূহ কবজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। জওয়াব শুনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বললেন,—আপনি কি আমার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে দূত পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন না? কিন্তু কই, কোন দূত বা বার্তাবাহক তো আসে নাই। মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা বললেন,—'হে আল্লাহর নবী! আমি ঠিকই আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছি ; কিন্তু আপনি তা' লক্ষ্য করেন নাই ; আপনার কেশরাশির কৃষ্ণতার পর শুভ্রতা, আপনার দৈহিক শক্তির প্রাবল্যের পর দুর্বলতা এবং আপনার দেহ সোজা ও সটান থাকবে পর বক্রতাই মৃত্যুর পূর্বে আপনার কাছে প্রেরিত আমার দূত বা বার্তাবাহক।'

হযরত আবু আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রখ্যাত এক বুযুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য আমি খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর শিষ্যগণ শিয়রের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে শায়খ! আপনি কি এই অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া-মহব্বত ও বিচ্ছেদের কারণে কান্নাকাটি করছেন?' তদুত্তরে তিনি বললেন,—'না, বরং আমি আমার নামাযের অসারত্বের কথা স্মরণ করে কাঁদছি ; জীবনের সমস্ত নামায আমি বিনষ্ট করে ফেলেছি।' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এটা কিভাবে? আপনি তো সারা জীবন নামায আদায় করেছেন।' তিনি বললেন, 'আমি জীবনে যত নামাযই পড়েছি ; সিজদা করেছি, সিজ্‌দা হতে মাথা উঠিয়েছি, সবসময়ই আমার অন্তরে গাফলতি ও অবহেলা বিরাজ করতো, মনোযোগ সহকারে আমি রুকু-সিজ্‌দা করতে পারি নাই, আর আজকে আমার সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে।' এতটুকু বলে তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন,

সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'হাশরের দিন ক্বিয়ামতের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে আমি উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ইয্যত-সম্মানের পর জানিনা কবরের ঘোর অন্ধকারে একাকী কি অবস্থায় আমাকে কাটাতে হবে। আমি অতি উত্তমরূপে ধ্যান করেছি,—যখন আমলনামা হস্তান্তর করা হবে, তখন না-জানি আমার কি দুর্দশা হয়। আয় আল্লাহ্। আয় পরওয়ারদিগার!! একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা আমার আশা ; আপনার দয়া ও রহমত ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই; মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সেদিন মা'ফ করে দিন।'

'উয়ূনুল-আখবার' গ্রন্থে হযরত শাক্বীক্ব বল্খী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, মানুষ মুখে মুখে যেগুলোর খুব বুলি আওড়িয়ে থাকে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য করা যায়, এক,— মানুষ মুখে স্বীকারোক্তি করে যে, আমরা আল্লাহ্র বান্দা, একমাত্র তাঁরই দাস ; কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে থাকে। দুই,— মানুষ বলে থাকে, আল্লাহ আমাদের জীবিকা ও রোযী-রোযগারের জিম্মাদার, সুতরাং তিনিই এ ব্যাপারে ফিকির করবেন। কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর কখনও দুনিয়ার ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে পরিতৃপ্ত হয় না, সর্বদা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মাল-সামান একত্রিকরণে উন্মত্ত থাকে। তিন,— মানুষ বলে থাকে, মৃত্যু আসবেই এবং এটা সকলের জন্য অবধারিত ; কিন্তু তাদের ব্যস্ততা এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনদিন মরবে না।' প্রিয় সাধক! একটু চিন্তা করে দেখ, মহান আল্লাহর দরবারে তুমি কোন্ দেহটি নিয়ে হাজির হবে, কোন্ মুখে তুমি কথা বলবে? মহান সেই দরবারের প্রতিটি জিজ্ঞাসার সঠিক জওয়াব তোমাকে দিতে হবে, যা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে রাখা চাই। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের ভয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও শঙ্কামুক্ত হয়ো না; কারণ তিনি তোমার ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে পালন কর এবং নিজের জাহের-বাতেন, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্মে সর্বতোভাবে

এক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যাও।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আরশের নীচে লেখা রয়েছে ঃ

انا مطيع من اطاعنى و محب من احبنى و مجيب من دعانى وغافر لمن استغفرنى ـ

'আমার অনুগত বান্দার প্রতি আমি অনুগ্রহ করে থাকি, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাসি, যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করি।'

অতএব মানবের কর্তব্য হচ্ছে, ইখলাস ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদত–বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়া, দুনিয়ার বালা–মুসীবত ও দুঃখ–দৈন্যে ছবর করা, আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'আমতসমূহের শোকর আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় মাওলার প্রতি সন্তুষ্ট ও উদগ্রীব থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট থাকে না, আমার যাচাই ও পরীক্ষায় ছবর করে না, আমার নে'আমতের শোকর আদায় করে না এবং আমার পরিমিত দানে তুষ্ট থাকে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভু তালাশ করে।'

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট আরজ করলো, 'হুযুর! আমি ইবাদতে স্বাদ পাই না ; এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হয়তঃ তুমি এমন কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই।' জেনে রাখ,— 'ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুকে পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করার নাম ; এমনকি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করাও ইবাদতের পরিপন্থী কাজ।' জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু ইয়াযীদ (রহঃ)–এর নিকট ইবাদতে স্বাদ না–পাওয়ার কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তুমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত না–করে 'ইতা'আত ও আনুগত্য' নামের বস্তুটির পূঁজা করছো, নতুবা তুমি ইবাদতে স্বাদ অন্বেষণ করছো কেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উদ্দেশে ইবাদত করাটাও এক প্রকার গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত। সুতরাং তুমি সকল গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্ত–পবিত্র হয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও। তা'হলে অবশ্যই

তুমি স্বীয় আরাধনায় স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করতে পারবে।

একদা এক ব্যক্তি নামায আরম্ভ করে যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ ('হে আল্লাহ্! আমি একমাত্র আপনারই ইবাদত করছি।') পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তার মনে ধারণার উদ্রেক হলো যে, 'সে প্রকৃতই আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ ইবাদত করছে।' তৎক্ষণাৎ গায়েব থেকে আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক ; তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করছো না ; বরং রিয়া বা লোকদেখানোর উদ্দেশে এরূপ আরম্ভ করছো।' একথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ তওবা করে নির্জন স্থানে গিয়ে নামায আরম্ভ করলো। এবারও যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ পাঠ করলো, তখন আওয়ায আসলো,—'তুমি মিথ্যুক, তুমি তোমার ধন-সম্পদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিজের সমস্ত ধন-দৌলত আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিল এবং পুনরায় নামায আরম্ভ করলো। পূর্বের মত এবারও আওয়ায আসলো,—'তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদের ইবাদত করছো।' অতঃপর সে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পোষাকাদি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কাপড়-চোপড় দান করে দিল। এরপর পুনরায় নামায আরম্ভ করে إِيَّاكَ نَعْبُدُ পর্যন্ত পৌঁছলে গায়েবী আওয়ায আসলো,—'হে আমার বান্দা! এবার তুমি সত্য বলছো ; প্রকৃতই তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করছো।'

'রাওনাকুল-মাজালিস' কিতাবে আছে,—'একদা এক ব্যক্তির মূল্যবান একটি বস্তু হারিয়ে যায় ; কে নিয়েছে বা কোথায় আছে, তার স্মরণ ছিল না। অতঃপর একবার নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় বিষয়টি তার স্মরণ হয়। নামায সমাপ্ত করে গোলামকে সে বললো,—'অমুক ব্যক্তির নিকট হতে আমার সেই বস্তুটি নিয়ে আস।' একথা শুনে গোলাম জিজ্ঞাসা করলো, বিষয়টি আপনার কখন স্মরণ হয়েছে? সে বললো,—'নামাযে।' গোলাম বললো,—'হে মনিব! সত্য বলতে কি, নামাযরত অবস্থায় আপনি খোদার উপাসক ছিলেন না ; বরং সে বস্তুটির অন্বেষী ছিলেন। মনিব গোলামের মুখে এহেন বিজ্ঞজনোচিত উক্তি শুনে আনন্দিত হয়ে তাকে আযাদ করে দিল।'

হে সাধক! দুনিয়ার সর্ববিধ মায়া-মোহ পরিত্যাগ করে একমাত্র ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন হয়ে যাও, সর্বদা অন্তকরণকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার চেষ্টায় নিরত থাক, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সম্মুখে অগ্রসর

হও এবং পারলৌকিক জীবনের সাফল্যকেই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে নাও। প্রকৃত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক এ বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দিয়ে দেই ; কিন্তু পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।' (শূরা ঃ ২০)

আয়াতে উল্লেখিত 'হার্‌সুদ্দুন্‌য়া'–এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য উপকরণ, যথা ঃ লেবাস–পোষাক, খাদ্য–পানীয় প্রভৃতি। 'এ ব্যক্তি আখেরাতের কোন অংশ পাবে না'–এর অর্থ হচ্ছে,—দুনিয়াতেই তার অন্তর থেকে আখেরাতের মহব্বত দূর হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, আখেরাতের প্রতি সনিষ্ঠ আকর্ষণের ফলশ্রুতিতেই তিনি দ্বীনের খেদমতের জন্য চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা গোপনে আর চল্লিশ হাজার প্রকাশ্যে সর্বমোট আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছেন। অতঃপর নিজের জন্য তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দু'জাহানের সরদার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ সর্বদা দুনিয়ার সর্বপ্রকার আরাম–আয়েশ ও ভোগ–বিলাস পরিহার করে চলতেন। আদরের দুলালী মা ফাতেমা যাহ্‌রা (রাযিঃ)–কে তিনি বিবাহের সময় যে উপহার দিয়েছিলেন, তা ছিল নিতান্ত নগণ্য—চামড়ার একটি ছোট মোশক এবং খেজুরবৃক্ষের আঁশ দিয়ে প্রস্তুত করা একটি বালিশ মাত্র।

অধ্যায় ঃ ৭
খোদাবিমুখতা ও মুনাফেকী

একদা জনৈকা মহিলা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ কিছুদিন হয় আমার একটি যুবতী কন্যা মারা গেছে, সেজন্যে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; আপনি আমাকে এমন কোন তদ্‌বীর বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পারি।' অতঃপর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তাকে তদ্‌বীর বাত্‌লিয়ে দিলেন। মহিলাটি সে অনুযায়ী আমল করার পর একদিন স্বপ্নে দেখে যে, তার কন্যা আলকাতরার পোষাক পরিহিতা, গলায় লোহার জিঞ্জীর এবং পায়ে বেড়ী লাগানো অবস্থায় রয়েছে। মহিলা একথা হযরত হাসান বসরীকে জানালে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হলেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত হাসান বসরী নিজে সেই কন্যাকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে বেহেশ্‌তে পদচারণ করছে এবং তার মাথায় বেহেশ্‌তী তাজ। তখন সে হযরত হাসান বসরীকে বললো ঃ 'হে হাসান! আপনি আমাকে চিনতে পারেন নাই? আমি সেই মহিলার কন্যা, যে আমাকে স্বপ্নে দেখার জন্য আপনার নিকট হতে তদ্‌বীর নিয়েছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অবস্থা তো পূর্বে এরূপ ছিল না ; কিভাবে তোমার পূর্বাবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তুমি এ পর্যায়ে উন্নীত হলে—এর কারণ কি?' সে বললো ঃ 'এর কারণ হচ্ছে এই যে, একদা এক ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। তখন কবরস্থানে পাঁচ ব্যক্তির উপর গোর আযাব হচ্ছিল। সেই পথিক লোকটির দরূদ পড়ার পর আমরা একটি আওয়ায শুনতে পেলাম, তাতে বলা হচ্ছে,—'এই ব্যক্তির বরকতে এদের উপর থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নাও।' অতঃপর তৎক্ষণাৎ আমাদের আযাব বন্ধ হয়ে গেল।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন পথিকের একবার দরূদ শরীফ পাঠ করার ওসীলায় অপর লোকজন চিরকালের জন্য যদি ক্ষমা পেতে পারে, তা'হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং পঞ্চাশ

বছর পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কি আল্লাহ্র রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হবে না? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে।' (হাশর ঃ ১৯) অর্থাৎ, ওইসব কপট ও মুনাফেকদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর দেওয়া বিধানাবলীর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে পার্থিব লোভ-লালসা ও মায়া-মোহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিকদের লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'প্রকৃত মু'মিন সর্বদা আমল-ইবাদত ও নামায-রোযা প্রভৃতি পুণ্যকার্যে নিমগ্ন থাকে আর মুনাফিক সর্বদা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার ও উদরপূর্তির চিন্তা-ধান্দায় মত্ত থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি নামায ও ইবাদত পরিত্যাগকারী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দান-খয়রাত করে এবং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুনাফিক ব্যক্তি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভী ও উচ্চাভিলাষী হয়, আর মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু আশা করে না ; বরং সমস্ত মখ্লূক থেকে মু'মিন ব্যক্তি অনপেক্ষ থাকে। মুনাফিক ব্যক্তি আল্লাহ্কে ছাড়া আর সকলের কাছেই আশা পোষণ করে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও ঈমানকে ধন-সম্পদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর মুনাফিক ব্যক্তি ধন-সম্পদকে দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। মু'মিন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করে এবং সমস্ত গায়রুল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি সকল গায়রুল্লাহ্কে ভয় করে এবং একমাত্র আল্লাহ্ থেকে নির্ভীক থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে, আর মুনাফিক পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে। মু'মিন ব্যক্তি নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করে আর মুনাফিক জনকোলাহল ও অবাধে মিলামিশা পছন্দ করে। মু'মিন ব্যক্তি আমল ও ইবাদতরূপ শস্যক্ষেত্রকে আবাদ করা সত্ত্বেও যেকোন মুহূর্তে তা' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা পোষণ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক আমলের

শস্যক্ষেত্রকে সর্বদা উজাড় করা সত্ত্বেও তা' থেকে ফসলপ্রাপ্তির আশা করতে থাকে। মু'মিন ব্যক্তি দ্বীন ও ঈমানের হিফাযত ও আমলের ইস্‌লাহের উদ্দেশে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে থাকে, আর মুনাফিক ব্যক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তার ও ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশে আদেশ–নিষেধ করে থাকে ; বরং সে অসৎ ও অন্যায় কাজে আদেশ ও সহযোগিতা করে এবং সৎ ও ন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ
إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ
وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ
وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

'মুনাফিক নর–নারী সবারই গতিবিধি এক রকম ; শিক্ষা দেয় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই না–ফরমান। ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের ; তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।' (তওবা ঃ ৬৭,৬৮)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

'আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।' (নিসা ঃ ১৪০)

অর্থাৎ,—এসব লোক কুফর ও মুনাফেকীর কারণে মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছেন,—এর কারণ হচ্ছে যে, এরা কাফেরদের চাইতেও জঘন্য ও নিকৃষ্ট এবং এদের উভয়ের পরিণতিই হবে জাহান্নাম। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।' (নিসা ঃ ১৪৫)

অভিধানে 'মুনাফিক' শব্দটি 'নাফেক্বাউল-ইয়ারবূ' অর্থাৎ 'বন্য ইঁদুরের গর্ত' থেকে নির্গত। কথিত আছে, বন্য ইঁদুরের গর্তে দু'টি ছিদ্রপথ থাকে; আরবী ভাষায় একটিকে 'নাফেকা' এবং অপরটিকে 'কাছে'আ' বলা হয়। এসব বন্য ইঁদুরের অভ্যাস হলো, এক ছিদ্রপথে নিজেকে প্রকাশ করে এবং অন্য গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে বের হয়ে যায়। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও বাহ্যতঃ নিজকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফ্রের দিকে চলে যায়। এজন্যেই তাকে 'মুনাফিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ تَرٰى بَيْنَ قَطِيْعَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ تَارَةً تَسِيْرُ اِلٰى هٰذَا الْقَطِيْعِ وَتَارَةً اِلٰى هٰذَا الْقَطِيْعِ وَلَا تَسْكُنُ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِاَنَّهَا غَرِيْبَةٌ لَيْسَتْ مِنْهُمَا۔

'মুনাফিক ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে, দু'টি পালের মধ্যবর্তী অপরিচিত ছাগল বা মেষের মত। সে একবার এক পালে প্রবেশ করে আবার কিছুক্ষণ পর অপর পালে প্রবেশ করে ; কিন্তু উভয় পালের কাছেই সে অপরিচিত হওয়ার কারণে কেউ তাকে গ্রহণ করে না। অনুরূপ, মুনাফিক ব্যক্তিও না মুসলমানদের

কাছে অবস্থান করতে পারে, না কাফেরদের কাছে স্থান পায়।'

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তার সাতটি দরজা রয়েছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط

'দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে।' (হিজ্‌র ঃ ৪৪)

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলার লা'নত ও অভিশাপ দিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করে লোহার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর উপরের অংশে তামা এবং ভিতরে গলিত সীসা হবে। দোযখের অভ্যন্তরে ভয়াবহ শাস্তি ও আল্লাহ্‌র রোষ ও পরাক্রম বিরাজ করবে। দোযখের মাটি হবে উত্তপ্ত তামা, কাঁচ, লোহা ও সীসা দ্বারা গঠিত। দোযখে নিক্ষিপ্ত লোকদের উপরে, নীচে, ডানে, বামে, এক কথায় চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি অগ্নি বর্ষিত হবে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বনিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান হবে মুনাফিকদের।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! দোযখের অগ্নি এবং তার উত্তাপ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।' হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের অগ্নি সৃষ্টি করে প্রথমে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' লালবর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দগ্ধ করেছেন ; ফলে তা' শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর কাল জ্বালিয়েছেন ; ফলতঃ সেটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ঘন অন্ধকারে পরিণত হয়।' অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখবাসীদের পরিধেয় একটি বস্ত্রখণ্ডও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে জগতের সমস্ত মখ্‌লূক ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপ, যদি দোযখবাসীদের ছোট এক বালতি পরিমাণ পানীয় বস্তু দুনিয়ার সমগ্র পানিতে মিশ্রিত করা হয় ; তা'হলে যে ব্যক্তি এর সামান্য পরিমাণও পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। এমনিভাবে, জাহান্নামে একটি শিকল রয়েছে, কুরআনের ভাষায় ঃ

فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا ○

'তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।' (আল-হাক্কাহ্ ৩২) - এর অর্ধ গজের পরিমাণ দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের সমান। যদি এই শিকলকে পৃথিবীর পর্বতসমূহের উপর রাখা হয়, তা'হলে এই অগণিত পর্বত দ্রব-গলিতে পরিণত হবে। অনুরূপ, যদি কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশের পর কোনক্রমে বের হয়ে পুণরায় দুনিয়াতে আগমন করে, তা'হলে সমগ্র জগতবাসী সেই ব্যক্তির দুর্গন্ধে অসহ্য হয়ে মারা যাবে।'

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে দোযখের দরজাসমূহের অবস্থা বর্ণনা করতে বললেন ; অর্থাৎ সেটা কি আমাদের ঘর-বাড়ীর দরজার মত, না অন্য কোনরূপ? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোযখের দরজা এই পৃথিবীর ঘর-বাড়ীর দরজার মত নয় ; বরং তা' উপরে-নীচে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত এবং নিম্নদিক থেকে এক দরজা হতে অপর দরজা পর্যন্ত সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব। উপরের দিক থেকে প্রথম দরজার তুলনায় দ্বিতীয়টির এবং এভাবে পরবর্তী দরজাগুলোর একটির তুলনায় অপরটির উত্তাপ ও দাহন ক্ষমতা সত্তর গুণ অধিক হবে।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব স্তরে অবস্থানকারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন যে, দোযখের সর্বনিম্ন তলায় নিক্ষেপ করা হবে মুনাফিকদেরকে। এই স্তরের নাম হা'বিয়াহ্। এ স্তরে মুনাফিকদের অবস্থান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে, দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।'

(নিসা ঃ ১৪৫)

নিম্নদিক হতে দ্বিতীয় স্তরে হবে মুশরিকরা। এ স্তরের নাম 'জাহীম'। তৃতীয় পর্যায়ে মূর্তি-পূজকদের স্তর। এর নাম 'সাকার'। চতুর্থ পর্যায়ে অভিশপ্ত ইবলীস ও তার অগ্নিপূঁজক অনুচরদের স্তর। এর নাম 'লাজা'। পঞ্চম স্তরে

হবে ইহুদীরা ; এর নাম 'হুতামাহ্'। ষষ্ঠ স্তরে হবে খৃষ্টানরা ; এর নাম 'সাঈর'। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) থেমে গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে জিব্রাঈল! আপনি সপ্তম স্তর সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন?' হযরত জিব্রাঈল বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই স্তর সম্পর্কে আপনি জানতে চাবেন না।' হুযূর বললেন ঃ 'না এ সম্পর্কেও আপনি বলে দিন।' অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহান্নামের এই সপ্তম স্তরে আপনার উম্মতের ওই সব লোক নিক্ষিপ্ত হবে, যারা দুনিয়াতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে এবং তওবা না করে মারা গেছে।'

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে—

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ج

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তথায় পৌঁছবে না।'

(মার্য়াম ঃ ৭১)

তখন তাঁর পবিত্র অন্তর উম্মতের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কান্নাকাটি করেছিলেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তাদের উচিত, সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা হৃদয়-মনে জাগরূক করে রাখা এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও পাপাচারের জন্য তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু বর্ষণ করা, যাতে শেষ পরিণামে এহেন ভয়াবহ আযাব-গজব ও মর্মন্তুদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে অপমানিত হয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র হুকুমে দোযখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

অগণিত এমন বহু বৃদ্ধ ধরাপৃষ্ঠে দিব্যি নিশ্চিন্তে পদচারণা করছে ; যাদের প্রতি দোযখ তার ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে প্রতিনিয়ত অভিশাপ ক্ষেপণ করছে। কত যুবক রয়েছে, দোযখ ডেকে ডেকে যাদের যৌবন ও তারুণ্যের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছে। কত অগণিত নারী রয়েছে, দোযখ চিৎকার

করে যাদের উপর লা'নত ও লাঞ্ছনার গ্লানি বর্ষণ করছে এবং ক্ষণকাল পরে যাদের মুখমণ্ডল ঘৃণ্য সিয়াহ্ রূপ ধারণ করবে, পৃষ্ঠদেশ তাদের ভেঙ্গে পড়বে। সেই ভয়াবহ দিনে কোন মহামান্য সম্ভ্রান্তের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হবে না, কারও পাপ ও অন্যায়-অপরাধ গোপন থাকবে না।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দোযখ থেকে, দোযখের শাস্তি থেকে এবং ওইসব আচরণ ও কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন, যেগুলো আমাদেরকে দোযখের দিকে ঠেলে দিবে। আয় আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদিগকে আপনার নেক বান্দাদের সাথে জান্নাতে দাখেল করে নিন ; আপনি মহা পরাক্রমশালী, অনন্ত মার্জনাকারী। ইয়া আল্লাহ্! আমাদের দাগ-দোষ গোপন করে রাখুন, আচ্ছাদিত করে রাখুন, আমাদেরকে ভয়, সন্ত্রাস ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত রাখুন, আমাদের ভ্রম ও পদস্খলন মার্জনা করে দিন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার সম্মুখে লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করুন ; আপনি সর্বমহান, অনন্ত অনুগ্রহের মালিক।

অধ্যায় ঃ ৮

তওবা ও অনুতাপ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর তওবা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

'তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।'(তাহ্‌রীম ঃ ৮)

উক্ত আয়াতে আদেশ-বাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় এ থেকে তওবার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তা' ভঙ্গ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করার ফলে তাদের অবস্থা হয়েছে ঃ

فَأَنسٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ط

'ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,—নিজেদের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও উদাসীন হয়ে গেছে। ফলে, তারা স্বীয় জীবনের জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য করতে পারছে না এবং পারলৌকিক সাফল্যের জন্য কোন নেক আমল বা সৎকর্মে সক্রিয় হচ্ছে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ ـ

'যারা আল্লাহ্‌র দীদার ও সাক্ষাতে অনুরাগী, আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে অনাগ্রহী, আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাতে অনাগ্রহী।'

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

'বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে, ফাসেক।' (হাশর ঃ ১৯)

অর্থাৎ,— এরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও না-ফরমান বান্দা, আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেও তারা তা' ভঙ্গ করেছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সঠিক পথ-প্রাপ্তি হতে এরা বঞ্চিত।

বস্তুতঃ ফাসেক লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ এক,— 'কাফের ফাসেক'। দুই,-'ফাজের ফাসেক' অর্থাৎ,—অবাধ্য মু'মিন।

'কাফের ফাসেক' বলতে ওই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে নাই ; বরং সম্পূর্ণরূপে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত এবং গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط

'সে (শয়তান) তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশকে অমান্য করেছে।' (কাহ্ফ ঃ ৫০)

অর্থাৎ,—পরওয়ারদিগারের প্রতি ঈমান আনয়ন করার হুকুমকে পরিহার করে কুফর অবলম্বন করেছে। আর 'ফাজের ফাসেক' বলতে বুঝায়,— যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, রিযিকের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন তমিজ করে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্‌র না-ফরমানী ও অবাধ্যতায় মত্ত থাকে, আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী পরিহার করে পাপাচারে নিমগ্ন থাকে ; কিন্তু এ সবকিছু করা সত্ত্বেও সে কুফ্‌র ও শিরকে লিপ্ত হয় না।

উক্তরূপ দ্বিবিধ ফাসেকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈমান আনয়ন করে তওবা না করা পর্যন্ত হাজার অনুতাপ করলেও 'কাফের ফাসেক'–এর ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার 'ফাজের ফাসেক' মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কৃতকর্ম হতে তওবা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হলে, ক্ষমার আশা করা যায়। বস্তুতঃ লোভ–লালসা ও কাম–প্রবণতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা সহজেই নসীব হতে পারে ; কিন্তু অহংকার ও আত্মগৌরবের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির তওবা ও হিদায়াত সহজে নসীব হয় না। অতএব, তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবারত অবস্থায় থাকো,— তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যু যেন তোমাকে গ্রাস করে না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ

'তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন।' (শূরা ঃ ২৫)

অর্থাৎ,—আল্লাহ্ তা'আলা এদের তওবা কবূল করে অতীতের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَـهٗ ـ

'গুনাহ্ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

কথিত আছে, এক ব্যক্তি যখনই কোন পাপ করতো, তখন তা' একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতো (যাতে দ্বিতীয়বার এই পাপে লিপ্ত না হয়)। একদা সে কোন একটি পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা' লিপিবদ্ধ করার জন্য যখন খাতা খুললো তখন দেখতে পেল, পূর্বের লিপিবদ্ধ করা সবকিছু সম্পূর্ণ মুছে গেছে এবং তদস্থলে নিম্নের এই আয়াতটি লেখা রয়েছে ঃ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'আল্লাহ্ তাদের (তওবাকারীদের) গুনাহ্‌কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।' (ফুরক্বান ঃ ৭০)

অর্থাৎ,—সেই ব্যক্তির আন্তরিক তওবা ও অনুতাপের বরকত ও কল্যাণে শিরকের স্থলে ঈমান, ব্যভিচারের স্থলে ক্ষমা, অবাধ্যতা ও না–ফরমানীর স্থলে আনুগত্য ও গুনাহ্ থেকে হিফাযতের সওগাত এসে গেছে।

একদা আমীরুল–মু'মেনীন হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনার একটি গলিপথ অতিক্রম করছিলেন। এ সময় একজন যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। যুবকটি তার পরিহিত কাপড়ের নীচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ওহে যুবক! তুমি কাপড়ের অভ্যন্তরে এটা কি লুকিয়ে রেখেছো?' আসলে সেই বোতলটিতে মদ রক্ষিত ছিল। তাই, সে হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াব দিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তখন সে অন্তরে–অন্তরে আল্লাহ্র নিকট অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে দো'আ করলো— 'আয় আল্লাহ্! আমাকে হযরত উমরের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত করো না, তাঁর কাছে আমার দোষ ও অপরাধকে গোপন করে রাখ, আমি তওবা করছি এবং ওয়াদা করছি যে, জীবনে আর কখনও মদ্য পান করবো না।' তারপর এই যুবক হযরত উমরের জিজ্ঞাসার জওয়াবে বললো ঃ 'হে আমীরুল–মু'মেনীন! আমি সির্কার বোতল বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।' অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) বোতলটি দেখতে চাইলেন। আমীরুল–মু'মেনীনের অভিপ্রায় অনুযায়ী যুবক যখন বোতলটি তাঁর সম্মুখে পেশ করলো, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, বোতলটিতে সত্যসত্যই সির্কা রয়েছে।

প্রিয় সাধক! এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একজন মাখ্লূক অপর একজন মাখ্লূকের সম্মুখে লজ্জা ও অপমানের ভয়ে তওবা করেছে, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুতাপ কবূল করে মদ্যকে সির্কায় পরিণত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে সে আন্তরিক ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে সত্যিকারের তওবা করেছিল, এরই ফলশ্রুতিতে সে কবুলিয়তের নে'আমতে ভূষিত হয়েছে। ঠিক এভাবেই যদি পাপাচার ও অবাধ্যতার দরুণ বিধ্বস্ত কোন বান্দা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে এবং স্বীয় অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়, তা'হলে অবশ্যই তিনি তা' কবুল করে নিবেন এবং পাপাচারের মদ্যকে নেকী ও সৎকর্মের সির্কায় পরিবর্তন করে দিবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে ইশা'র নামায আদায় করার পর আমি বাহিরে বের হলাম ; এমন সময় একজন মহিলা পথে দণ্ডায়মান হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ—'হে আবু হুরাইরাহ্! আমি গুনাহ্ করেছি ; পাপে লিপ্ত হয়েছি, আমার জন্য কি তওবা ও পাপ মোচনের কোন উপায় আছে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে পাপটি করেছো তা' কি? সে বললো,– 'আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং আমার এই দুষ্কর্মের ফলে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাকেও হত্যা করে ফেলেছি।' অতঃপর আমি তাকে বললাম— 'তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছো এবং অপর একটি নিষ্পাপ সন্তানকেও ধ্বংস করেছো! আল্লাহ্‌র কসম, এহেন পাপকার্যের পর তোমার জন্য কোন তওবা নাই। একথা শুনে মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে এভাবেই রেখে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে চিন্তা করতে লাগলাম—মহিলার প্রশ্নের উত্তর তো আমি দিয়ে দিলাম ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আমি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি খুলে বললাম। আমার বিবরণ শুনে হুযুর (সঃ) বললেন ঃ 'হে আবু হুরাইরাহ্! তুমি নিজেও ধ্বংস হলে এবং অপরকেও ধ্বংস করলে। তুমি কি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই?

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ... فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط

'এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন।'

(ফুরকান ঃ ৬৮,৬৯,৭০)

অর্থাৎ,—শিরক ও কুফর ত্যাগ করে পাপাচার হতে তওবা ও অনুতাপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কৃতগুনাহ্‌কে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। এটা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ। (হযরত

আবু হুরাইরাহ্ বলেন ঃ) অতঃপর আমি চরম হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে সেই মহিলাকে এমনভাবে তালাশ করতে লাগলাম যে, লোকেরা আমাকে উন্মাদ বলতে লাগলো। অবশেষে আমি তাকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছি। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিবৃত সঠিক মাসআলা সম্পর্কে আমি তাকে অবহিত করি। তাতে সে আনন্দের আতিশয্যে সজোরে হেসে উঠলো এবং একটি বাগান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের জন্য ওয়াক্ফ করে দিল।'

উত্বাহ নামক এক নওজওয়ান অনাচার, ব্যভিচার ও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। এহেন পাপকার্যের জন্য সে সমাজে ঘৃণ্য ও কুখ্যাত ছিল। একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর মজলিসে সে উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিম্নের এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে ওয়াজ করছিলেন ঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

'যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্র স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসে নাই।' (হাদীস ঃ ১৬)

হযরত হাসানের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ওয়াজে তন্ময় হয়ে শ্রোতামণ্ডলী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এমন সময় জনৈক যুবক দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীকে উদ্দেশ্য করে বললো—'হে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ! আমি একজন জঘন্য পাপী, আমার মত জঘন্য না–ফরমান বান্দার তওবা কি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন? উত্তরে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা ও পাপাচার সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তওবা কবূল করবেন।' হাসান বসরীর এই উত্তর শুনে মজলিসে উপবিষ্ট নওজওয়ান উত্বার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ দেহ তার কাঁপতে আরম্ভ করলো, চিৎকার করতে করতে সে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসার পর হযরত হাসান তার নিকটবর্তী হলেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'ওহে না–ফরমান যুবক ! মহা আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার শাস্তি কি? সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত,— তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে থাকবে ক্রুদ্ধ গর্জন, রোষভরে গ্রেফতার করে হেঁচড়িয়ে তোমাকে সেই ভয়াবহ

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে! তুমি যদি সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ক্ষমতা রাখো, তা'হলে না-ফরমানী কর। নতুবা এখনই বিরত হয়ে যাও। বস্তুতঃ তুমি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছো ; এখনও সময় আছে, পরিত্রাণের চেষ্টা কর।' পংক্তিগুলো শ্রবণ করার পর যুবক উত্বাহ্ পুনরায় চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। এবার জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলতে লাগলো—'হে শায়খ! আমার মত বদ্নসীব ও গুনাহ্গার বান্দার তওবাও কি আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন?' হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ 'হাঁ, অবশ্যই কবূল করবেন।' অতঃপর নওজওয়ান উত্বা মাথা উঠিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি দো'আ করলো ঃ 'এক,— হে আল্লাহ্! আপনি যদি দয়া করে আমার তওবা কবূল করেন, এবং আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন, তা'হলে আমাকে তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, প্রখর ধীশক্তি ও প্রচুর স্মরণশক্তি দান করুন, যাতে উলামায়ে-কেরাম থেকে শ্রুত সর্ববিধ ইল্ম ও কুরআনী জ্ঞান আমি সংরক্ষণ করতে পারি। দুই,—আয় আল্লাহ্! আমাকে মনমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর দান করুন, যাতে যেকোন পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট ও বিনয়াবনত হয়। তিন,—আয় আল্লাহ্! আমাকে হালাল রিযিক দান করুন এবং কল্পনাতীতভাবে আমাকে সাহায্য করুন।'

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন যুবকের তিনটি দো'আই কবূল করে নিলেন। ফলে, তার মেধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল, তার কুরআন তিলাওয়াত শুনে যে কোন কঠিন হৃদয় মানুষও তওবা করতো। প্রতিদিন তার গৃহে দু'টি রুটি এবং এক পেয়ালা তরকারী পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো ; কিন্তু এ খাদ্য কোত্থেকে কিভাবে আসছে, কে-ই বা প্রত্যহ তা' পৌঁছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে যুবক কিছুই বলতে পারতো না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রিয় সাধক! উক্ত নওজওয়ানের মত যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সেই ব্যবহারই করবেন, যা এই নওজওয়ানের সাথে করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো নেক আমল কখনও ধ্বংস হতে দেন না।

একদা জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,— 'কোন তওবাকারী ব্যক্তি যদি জান্তে চায় যে, তার তওবা আল্লাহ্র দরবারে কবূল

হয়েছে কিনা, তা'হলে এর কোন উপায় আছে কি?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে যদিও কিছু বলা যায় না ; তবুও তওবা কবুলের কিছু লক্ষণ আছে। যথা ঃ তওবা ও অনুতাপের পর বান্দা সর্বদা পাপমুক্ত থাকবে, অযথা আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকবে, অন্তকরণকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে পবিত্র রাখবে, নিজকে সর্বদা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত জ্ঞান করবে সৎ ও বুযুর্গ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করবে, অসৎ পরিবেশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে, দুনিয়ার স্বল্প পরিমাণ সম্পদকে সে যথেষ্ট বরং অধিক জ্ঞান করবে ; কিন্তু আখেরাতের জন্য কৃত প্রচুর আমল ও ইবাদতকে সামান্য ও অপ্রতুল মনে করবে, অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে মগ্ন রাখবে, জিহ্বাকে হিফাজত করবে ; নিষ্ঠার সাথে সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ধ্যানমগ্ন থাকবে, অতীত জীবনের কৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করবে। তওবা ও অনুতাপের পর যদি কেউ নিজের মধ্যে এসব আলামত ও নিদর্শন লক্ষ্য করে, তা'হলে সে বুঝে নিতে পারে যে, আল্লাহ্র দরবারে তার তওবা কবূল হয়েছে।'

অধ্যায় ঃ ৯

মহব্বত ও অনুরাগ

কথিত আছে, এক বিজন প্রান্তরে একটি কুৎসিত–কদাকার দৃশ্যের উপর জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হলে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি কে?' উত্তরে সে বলেছিল, 'আমি তোমার অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারের দৃশ্য'। লোকটি বললো—'তোমা হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?' উত্তরে সে জানালো, 'আমার ধ্বংসাত্মকতা ও বীভৎস রূপ হতে মুক্তি পেতে হলে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ কর। যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلصَّلٰوةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ
ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَ ثَمَانِيْنَ عَامًا۔

'আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, এটা তোমার জন্য পুলসিরাতের অন্ধকারে নূর ও জ্যোতির কাজ দিবে। জুমা'র দিন যে ব্যক্তি আমার প্রতি আশি বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আশি বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

জনৈক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ার ব্যাপারে খুবই গাফেল ছিল। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি নিজ পবিত্র মুখমণ্ডলকে সেই লোকের দিক হতে ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সে আরয করলো— 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?' হুযূর (সঃ) বললেন— 'না, অসন্তুষ্ট নই।' লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—'তা'হলে আপনি আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না কেন?' আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে চিনি না। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হুযূর! আপনি আমাকে না চিনার কারণ কি? অথচ আমি আপনার

একজন উম্মতী, আর এ সম্পর্কে উলামায়ে-কেরাম বলেছেন—পিতা তার পুত্রকে যেমন চিনে, আপনি আপনার উম্মতের প্রত্যেককে তার চেয়েও বেশী চিনেন। হুযুর (সঃ) বললেন ঃ 'উলামায়ে-কেরাম ঠিকই বলেছেন ; কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ পড়ার মাধ্যমে স্মরণ কর না ; উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং এরই অনুপাতে চিনে থাকি, আমার প্রতি দরূদের পরিমাণ যার যত বেশী, তার সাথে আমার পরিচয় তত বেশী।' অতঃপর সেই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। স্বপ্নযোগে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উক্তরূপ বিবরণ শোনার পর সে দৈনিক 'একশত বার দরূদ পড়ার দৃঢ় সংকল্প করে। এভাবে সে প্রত্যহ নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলেছে। এরপর আরেক বার স্বপ্নের মাধ্যমে তার আল্লাহ্‌র রাসূলের যিয়ারত নসীব হলো, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আমি তোমাকে চিনি এবং ক্বিয়ামতের ময়দানে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো।'

প্রিয় সাধক! উপরোক্ত ঘটনায় হুযুরের কাছে পরিচিত হওয়ার এবং সুপারিশ পাওয়ার মহান নে'আমত লাভের পিছনে যে কারণটি রয়েছে, তা' হলো, সে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। 'হে নবী! আপনি বলে দিন—তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবেসে থাক, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর' পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানির 'শানে নুযূল' বা অবতরণের পটভূমিও ছিল তাই ; একদা সাহাবী হযরত কা'ব ইব্‌নে আশরাফ (রাযিঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে পর তারা বলেছিল ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্‌র পুত্রতুল্য ; আমাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন।' তাদের এ উক্তির জওয়াবেই কুরআনের এ আয়াতখানি নাযিল হয়। এতে আল্লাহ্‌তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي -

'বলুন (হে নবী!), তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

অর্থাৎ,—আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে যে দ্বীন বা জীবন-বিধান নিয়ে এসেছি, আমার অনুসরণ করে তোমাদের বাস্তব জীবনে তা' রূপায়িত কর। এভাবে যদি তোমরা আমার অনুগত হও, তা' হলে তোমরা যে পুরস্কারে ধন্য হবে তা' হচ্ছে—

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্যই তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।' (আলি-ইমরান ঃ ৩১)

সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদের আল্লাহ্ তা'আলাকে মহব্বত করার অর্থ হচ্ছে—তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে সকল গায়রুল্লাহ্র উপর প্রাধান্য দেন, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। অনুরূপ, 'সত্যিকার মু'মিন ও খোদাভক্তদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বত করেন' এর অর্থ হচ্ছে—'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন, গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের উত্তম পুরস্কার দান করেন, গুণাহ্ মাফ করেন। দয়া ও অনুগ্রহ করেন, পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, নেক আমল ও ইবাদতের তাওফীক দান করেন।'

চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো দাবী করতে হলে অপর চারটি বিষয়ে অভ্যস্থ হতে হবে। অন্যথায় এ দাবীদার মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে ঃ

এক. যে ব্যক্তি বেহেশ্তকে ভালবাসার দাবী করে এবং বেহেশ্তে প্রবেশের তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করে ; অথচ নেক আমল ও ইবাদতে মগ্ন হয় না, সে মিথ্যুক।

দুই. যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের দাবী করে ; অথচ দ্বীনের খাদেম উলামা ও বুযুর্গানে-দ্বীনকে মহব্বত করে না, সে মিথ্যুক।

তিন. যে ব্যক্তি দোযখাগ্নিকে ভয় করার দাবী করে ; অথচ পাপকার্য পরিত্যাগ করে না, সে মিথ্যুক।

চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করে ; অথচ বালা–মুসীবত ও আপদ–বিপদের পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেকায়াত ও অভিযোগ ব্যক্ত করে, সে মিথ্যুক।

হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ

تَعْصِى الْإِلٰـهَ وَ انْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ
هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْقِيَاسِ بَدِيْعُ

'মুখে আল্লাহ্কে মহব্বত করার দাবী কর ; অথচ কার্যতঃ তাঁর না–ফরমানীতে লিপ্ত রয়েছো— এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন ও অপাংক্তেয় দাবী।'

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّاَطَعْتَهُ
اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعُ

'বস্তুতঃই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তা' হলে অবশ্যই তুমি তাঁর অনুগত হয়ে চলতে। কেননা, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।'

মোটকথা, মহব্বতের চিহ্নই হচ্ছে, মাহ্বুব বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া, তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা এবং সর্ববিধ অবাধ্যতা ও অমান্যতা থেকে পরহেয করা।

একদা হযরত শিবলী (রহঃ)–এর নিকট একদল লোক এসে হাজির হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কারা? উত্তরে তারা বলেছিল ঃ 'আমরা আপনার ভক্ত ; আপনাকে আমরা ভালবাসি, মহব্বত করি।' একথা শুনে হযরত শিবলী তাদেরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা দৌড়ে পালাতে লাগলো। তখন হযরত শিবলী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কিহে! পালাচ্ছ কেন? প্রকৃতই যদি তোমরা আমাকে ভালবাসতে, তা' হলে আমার পরীক্ষায় তোমরা ধৈর্যধারণ না করে পলায়ন করছো কেন?' অতঃপর হযরত শিবলী

(রহঃ) উক্তি করলেন ঃ 'আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসায় যারা মত্ত, তারা খোদায়ী ইশ্কের শরাব পান করে নিয়েছে ; ফলে, তাদের জন্য এ জগত ও মনুষ্য আবাস সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয় লাভ করেছে ; তাই আল্লাহ্র মহিমা ও পরাক্রমে তারা উন্মত্ত-নিবেদিত। তারা আল্লাহ্র পেয়ার-আশনাইর অমৃত-সুধায় নেশাবিভোর ; তাই আল্লাহ্র প্রেম সাগরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, তার সান্নিধ্যে মুনাজাত ও প্রেম নিবেদনের আস্বাদে আত্মহারা হয়েছে।' অতঃপর হযরত শিবলী (রহঃ) এ পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ذِكْرُ الْمَحَبَّةِ يَا مَوْلَايَ اَسْكَرَنِيْ
وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا غَيْرَ سَكْرَانِ

'হে মাওলা! ইশ্ক ও মহব্বতের স্মরণই আমাকে বেহুঁশ করে দিয়েছে। আর প্রকৃত প্রেমিক স্বভাবতঃই বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথিত আছে, উট যখন মাতাল হয়ে যায়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত দানা-পানি গ্রহণ করে না ; অথচ পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক বোঝাও সে বহন করে। এর কারণ হচ্ছে, প্রেমাস্পদের স্মরণ তখন তার অন্তরে উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ খেলতে থাকে, প্রিয়তমের অনুরঞ্জনে মাতোয়ারা-আত্মহারা হয়ে খাদ্য গ্রহণে বিস্মৃত হয়ে যায়, অধিকতর বোঝা বহনেও অস্বস্তি অনুভব করে না। ওহে সাধক! নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর—আল্লাহ্র জন্য তুমি কি কখনও হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করেছো? কখনও কি পানাহার ত্যাগ করেছো? একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কঠিন সাধনায় কি ব্রতী হয়েছো বা ভারী বোঝা বহন করেছো? যদি এগুলোর কোনটাই তুমি করে না থাক, তা' হলে তোমার সকল উক্তি, সকল দাবী অসার ও অর্থহীন। এহেন দাবী না দুনিয়াতে কোন কাজে আসবে, না আখেরাতে কোন উপকারে আসবে ; এতদ্বারা তুমি না দুনিয়ার মাখ্লুকের নিকট সম্মানের পাত্র হবে, না সৃষ্টিকর্তার নিকট পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন ঃ 'বেহেশ্তের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে,— নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে

সে ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে দোযখের ভীতি রয়েছে সর্বদা সে নফ্স ও কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে। অনুরূপ মৃত্যুর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে কখনও পার্থিব মায়া-মোহ ও আস্বাদ-আকর্ষণে মত্ত হবে না।'

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ)-কে মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্র মহব্বত যার অন্তরে আছে, তার নিজস্ব এরাদা-ইচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না। সমুদয় বৃত্তি ও মনোস্কামনা ইশ্কের আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যায়, স্বীয় সত্তাকে সে আল্লাহ্র মহিমা ও পরাক্রমের অতল ও অকূল সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়।'

অধ্যায় ঃ ১০

ইশ্‌ক বা প্রেম-আসক্তি

'মহব্বত' বলতে কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর প্রতি অন্তরে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। এই আগ্রহ ও আকর্ষণই যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করে, তখন তার নাম হয় 'ইশ্‌ক'। এই ইশ্‌কের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পর্যায়ে আশেক বা প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদের জন্য নিবেদিত প্রাণ দাসানুদাসে পরিণত হয়। স্বীয় প্রেমাস্পদের খাতিরে নিজের ধন-দৌলত, মান-সম্মান সর্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়। প্রেমিকা যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ইশ্‌কে উন্মত্ত হয়ে স্বীয় রূপ-গুণ ও ধন-সম্পদ সবকিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন। সত্তরটি উটের বোঝা পরিমাণ তার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ছিল ; এসবকিছুকে তিনি একমাত্র হযরত ইউসুফের জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে কেউ তাঁর কাছে এসে যদি শুধু এতটুকু বলতো যে, আমি তোমার ইউসুফকে দেখেছি, তা' হলে বলার সাথে সাথে তাকে একটি অমূল্য স্বর্ণের মালা উপহার দিয়ে জীবনের তরে ধনবান করে দিতেন। অবশেষে তিনি নিজে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত দরিদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর এ অবস্থাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'ইউসুফের নামে সর্বস্ব'। ইশ্‌ক ও মহব্বতের আতিশয্যে তিনি সবকিছু থেকে উদাসীন ও বিস্মৃত হয়ে যেদিকে তাকাতেন, সেদিকেই কেবল ইউসুফ আর ইউসুফই দেখতে পেতেন ; এমনকি আসমানের তারকারাজিতেও তিনি ইউসুফের নাম লেখা দেখতেন।

বর্ণিত আছে—এই যুলায়খা যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন তথা ঈমানী নূর লাভে ধন্য হন, অতঃপর হযরত ইউসুফের সাথে প্রণয়সূত্রে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ তখন তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে নিরব একাকীত্বে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান যে, শুধুমাত্র এই ইবাদতের জন্য তিনি সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন পেয়ার-সোহাগের জন্য দিনের বেলায়

তাঁকে আহ্বান করতেন, তখন তিনি রাতের ওয়াদা করে মুলতবী করতেন। আবার যখন রাতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন দিবসের কথা বলে নিস্কৃতি চাইতেন। একদা হযরত ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে ইউসুফ! আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করার পূর্বে আমি তোমাকে ভালবাসতাম ; এখন আমি আল্লাহ্র পরিচয় পেয়ে গেছি ; তাই একমাত্র তাঁর মহব্বত ও ভালবাসা ছাড়া আমার অন্তর থেকে সকল গায়রুল্লাহ্র মহব্বত দূর হয়ে গেছে এবং এজন্যে আমি কোন বিনিময়ও কামনা করি না।' হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে যুলায়খা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার গর্ভ থেকে দু'টি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে এবং তাদেরকে নুবুওয়াত প্রদান করা হবে।' হযরত যুলায়খা বললেন ঃ 'যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হুকুম করেছেন এবং এজন্যে আমাকে উপায় ও ওসীলা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাই এ হুকুম আমার জন্য শিরধার্য।' অতঃপর তিনি মিলনে সম্মত হন।

একদা লায়লার প্রেমিক মজনূকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'তোমার নাম কি?' সে বলেছিল, 'আমার নাম লায়লা?' বস্তুতঃ প্রেমাস্পদের তরে আত্মলীন হওয়ার ফলশ্রুতিতে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। এক ব্যক্তি মজনূকে বলেছিল ঃ কিহে মজনূ! লায়লা কি মরে গেছে? সে উত্তর করেছিল ঃ 'লায়লা অবশ্যই মারা যায় নাই, সে আমার অন্তরে বিরাজমান ; আমিই লায়লা।' একদা মজনূ লায়লার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখছিল। তখন এক ব্যক্তি বলেছিল—'হে মজনূ! আকাশের দিকে তাকাচ্ছ কেন? লায়লার গৃহপ্রাচীরের দিকে দৃষ্টি কর, এভাবে হয়ত তাকে এক নজর দেখে নিতে পারবে।' তখন মজনূ বলেছিল ঃ 'আমি আকাশের তারকারাজি দেখছি, এগুলো আমার কাছে অতি প্রিয় ; কারণ, এগুলোর ছায়া লায়লার বাড়ীর উপর পতিত হয়।'

মনসূর হাল্লাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, লোকেরা তাঁকে আঠার দিন পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল। এ সময় হযরত শিবলী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'হে মনসূর! বলুন, মহব্বতের হাকীকত কি? তিনি বলেছিলেন ঃ আজকে নয়, আগামী কল্য জিজ্ঞাসা করবেন। পরের দিন

লোকেরা তাঁকে বন্দীশালা থেকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত শিবলীও সে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। মনসূর তাঁকে দেখে চিৎকার করে বললেন ঃ 'হে শিবলী! শুনে নিন—মহব্বতের হাকীকত হচ্ছে, সূচনাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া আর পরিণামে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।'

মনসূর যখন এ বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা চিরঞ্জীব, শাশ্বত ; আর সবকিছুই ভঙ্গুর ও ধ্বংসপ্রাপ্ত, অনুরূপ তিনি যখন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন এবং অন্তরে তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, জগতের সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহ্‌রই সত্তা, কুদরত ও মহিমা বিরাজমান, তখন তিনি নিজের নামটুকুও বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনি কে? তিনি বলতেন ঃ 'আনাল-হক' আমি হক্ক।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ'খাঁটি মহব্বতের আলামত (লক্ষণ) তিনটি ঃ এক,—নিজের বা অপর কোন মাখ্‌লুকের নয় ; স্বয়ং মাহ্‌বুব তথা প্রেমাস্পদের যবানে কথা বলা। দুই,— সমগ্র মাখ্‌লুকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাহ্‌বুবের সান্নিধ্য অবলম্বন করা। তিন,—অপরাপর সকলের সন্তুষ্টি ও তোষামোদ পরিহার করে কেবল মাহ্‌বুবের সন্তুষ্টির জন্য ব্যগ্রচিত্ত হওয়া।'

ইশ্‌কের নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে, গোপনীয়তার পর্দা ও আবরণ উৎখাত করে দেওয়া, আচ্ছাদিত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে দেওয়া, প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্নতা ও স্মৃতিচারণের অমৃত আস্বাদ ও উন্মত্ততায় আত্মহারা হওয়া, যেন শরীরের কোন অঙ্গ কর্তন করা হলেও বিন্দুমাত্র অনুভব না হয়।

এক ব্যক্তি ফুরাত নদীর তীরে গোসল করছিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তির কণ্ঠে নিম্নের এ আয়াতটির তিলাওয়াত শুনেছিল ঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ٥

'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ভিন্ন হয়ে যাও।' (ইয়াসীন ঃ ৫৯)

আয়াতটির তিলাওয়াত শুনার সাথে সাথে এর হৃদয়বিদারক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে নদীতে ডুবে মারা যায়।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি বসরা শহরে জনৈক

যুবককে দেখেছি, উঁচু একটি অট্টালিকার ছাদের উপর থেকে উঁকি দিয়ে সে পথচারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে—ইশ্‌ক ও মহব্বতের তরে প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে কেউ কোনদিন কল্যাণ সাধন করতে পারে নাই। সুতরাং যদি কোন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি প্রেমাস্পদের তরে প্রাণ বিসর্জন দিতে চায়, তা' হলে সে যেন এভাবে মৃত্যুবরণ করে। একথা বলে সে তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই লোকজন তাকে উঠিয়ে দেখে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রকৃত তাসাওউফ হচ্ছে সর্বপ্রকার খবর ও অবস্থা থেকে বেখবর ও গাফেল থাকার নাম।'

একদা হযরত যুন্নূন মিসরী (রহঃ) মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামের একটি স্তম্ভের নীচে একজন যুবককে দেখলেন—নেহায়েত পীড়িত ও বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে ; তার বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তর থেকে আহ্ আহ্ শব্দ বের হচ্ছে। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ 'এ অবস্থা দেখে আমি তাকে সালাম দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।' সে বললো ঃ 'আমি একজন মুসাফির আশেক ; প্রেম-পীড়িত হয়ে পথে পড়ে আছি।' তার উত্তর শুনে আমি বিষয়টি উপলব্ধি করে বললাম ঃ 'আমিও তোমার মতই একজন।' একথা শুনে সে কাঁদতে লাগলো এবং আমিও তার সাথে কাঁদলাম। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমিও যে কাঁদলে?' আমি বললাম ঃ 'তোমার মত আমিও একজন আশেক মুসাফির।' একথা শুনে সে আরও অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলো এবং এ অবস্থাতেই হঠাৎ সজোরে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। অতঃপর আমি কাপড় দিয়ে তার শরীর আচ্ছাদিত করে কাফন খরিদ করার জন্য বাজারে গমন করলাম। বাজার থেকে কাফন এনে দেখি, সে নাই। তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম ঃ সুব্‌হানাল্লাহ (কোথায় গেল)! এমন সময় একটি গায়েবী আওয়ায আমার কানে ভেসে আসলো—'হে যুন্নূন! সে এমন এক পথিক, যাকে শয়তান আক্রমণ করতে চেয়েছে ; কিন্তু পারে নাই, তোমার সম্পদের কিয়দাংশ তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে ; তা' ও হয় নাই, রিদওয়ান ফেরেশতা তাকে জান্নাতে আহ্বান জানিয়েছে ; তা' ও সে প্রত্যাখ্যান করেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'এখন সে কোথায় আছে?' উত্তর আসলো—

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

'যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' (কামার ঃ ৫৪)

লোকটিকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সে আল্লাহ্র আশেক ছিল, অত্যধিক ইবাদতে নিমগ্ন থাকতো এবং তওবা ও অনুতাপে দ্রুত অগ্রগামী হতো।

জনৈক বুযুর্গকে ইশ্ক ও মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মাখ্লূকের সাথে সম্পর্ক কম রাখবে, অধিকতর নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করবে, সর্বদা চিন্তাশীল থাকবে, নিশ্চুপ থাকবে, চক্ষু উত্তোলন করবে কিন্তু দৃষ্টিপাত করবে না, সম্বোধন করা হলে শুনবে না, কিছু বলা হলে অনুধাবন করবে না, মুসীবতে ধৈর্যহারা হবে না, ক্ষুধার্ত হলে অনুভব করবে না, বিবস্ত্র হলে খবর থাকবে না, গালি বা ভৎর্সনা দিলে বুঝবে না, মানবকে ভয় করবে না, নির্জনে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকবে, সর্বদা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, একাকীত্বে মুনাজাত করবে, পার্থিব ঝঞ্ঝাটে দুনিয়াদার লোকদের সাথে জড়িত হবে না।'

হযরত আবূ তুরাব বখ্শী (রহঃ) মহব্বত সম্পর্কে নিম্নের কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছেন, যেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'পার্থিব কোন ব্যাপারে ধোকায় পড়ো না ; প্রতারিত হয়ো না। কেননা, এসবই প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের উপঢৌকন। দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত যা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে এসে থাকে, সবই সে আনন্দচিত্তে বরণ করে নেয়। অভাব-অনটন ও দারিদ্রকেও প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে নগদ দান, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতীক জ্ঞান করে নেয়। প্রকৃত প্রেমিকের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, শত্রুর শত ধিক্কার ও প্রতারণা সত্ত্বেও তার পদস্খলন হয় না ; বরং উত্তরোত্তর প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রত্যয় ও আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একজন যুবকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। যুবকটি বাগানে পানি-সিঞ্চন কার্যে রত ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে দেখে সে আরয করলো ঃ 'হে আল্লাহ্র নবী! আপনি দো'আ করুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর মহব্বতের অণু পরিমাণ অংশ দান করেন।' হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ

'তোমার মধ্যে তা' সহ্য করার ক্ষমতা নাই।' যুবক বললো ঃ 'তা' হলে অর্ধাণু পরিমাণ মহব্বতের জন্য দো'আ করুন।' অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে মহান প্রভু! এই যুবককে আপনার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণ দান করুন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) আপন পথে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সেই যুবকের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, বহুদিন যাবত যুবকটি পাগল অবস্থায় কালাতিপাত করছে এবং বর্তমানে সে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এ খবর শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্ সেই নওজওয়ানের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।' দো'আর পর হযরত ঈসা (আঃ) দেখতে পেলেন—সেই যুবক অসংখ্য পর্বতমালার মাঝখানে একটি উঁচু শিখরে আসমানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে সালাম দিলেন ; কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। পুনরায় হযরত ঈসা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ 'আমি ঈসা'। এ সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি ওহী আসলো ঃ 'হে ঈসা! যার অন্তরে আমার মহব্বতের অর্ধাণু পরিমাণও প্রবেশ করেছে, সে কখনও মানুষের আওয়ায শুনতে পারে না। শুনে রাখ,— আমার মহত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম, তুমি যদি করাত দিয়ে তাকে চৌচির করে দাও, তবুও সে বিন্দুমাত্রও অনুভব করবে না।'

যে ব্যক্তি নিজের জীবনে তিনটি বিষয়ের দাবী করেছে ; অথচ আত্মাকে অপর তিনটি বিষয়ের কলুষতা হতে মুক্ত করতে পারে নাই, সে নির্ঘাত ধোকায় পড়ে রয়েছে ঃ এক,—হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকরের সুমিষ্ট আস্বাদের দাবী করে ; অথচ দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করে নাই। দুই,—ইবাদতে ইখ্‌লাস ও নিষ্ঠার দাবী করে ; অথচ মানুষের কাছে সম্মান ও সুযশের লিপ্সা পরিহার করে নাই। তিন,—আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবী করে ; অথচ নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্টতম জ্ঞান করে না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا

يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ -

'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা পাঁচটি বিষয়কে ভালবাসবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে অপর পাঁচটি বিষয়কে ভুলে যাবে,—তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে ; কিন্তু আখেরাতকে ভুলে যাবে। তারা ধন-দৌলতকে ভালবাসবে ; কিন্তু এর হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে যাবে। তারা পাপকার্যকে ভালবাসবে ; কিন্তু তওবা করতে ভুলে যাবে। তারা বড় বড় অট্টালিকাকে ভালবাসবে ; কিন্তু কবরের কথা ভুলে যাবে।'

মনসূর ইবনে আম্মার (রহঃ) এক যুবককে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'হে যুবক ! তুমি সদা-সর্বদা সতর্ক থাক ; যৌবন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে ; বহু নওজওয়ানকে দেখা গেছে —জীবনের কৃত পাপরাশি হতে তওবা করতে বিলম্ব করেছে, অন্তরে দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে, মৃত্যুকে স্মরণ করে নাই আর শুধু বলেছে, আগামী কল্য অথবা পরশু তওবা করবো ; এভাবে দীর্ঘ সময় অতীত হওয়ার পর অবশেষে তওবার সুযোগ আর হয় নাই, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং একেবারে রিক্ত হস্তে কবরে গিয়েছে। পার্থিব প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী, পিতা-মাতা, আওলাদ-পরিজন কিছুই তার উপকারে আসে নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

'(ক্বিয়ামতের দিন) কোন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছবে।' (শু'আরা ঃ ৮৮,৮৯)

ওগো খোদা ! আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে তওবার তাওফীক দান করুন

গাফলতি ও উদাসীনতা হতে মুক্তি দান করুন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত নসীব করুন। বস্তুতঃ প্রকৃত ঈমানের পরিচয় হচ্ছে, সুযোগের প্রথম মুহূর্তেই তওবা করা, কৃত পাপকার্যের উপর অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জা ও অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়া, নশ্বর পৃথিবীর ন্যূনতম রিযিক ও দ্রব্যের উপর তুষ্ট থাকা, যাবতীয় দুনিয়াবী ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা এবং ইখ্‌লাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাকা।

একদা জনৈক কৃপণ ও মুনাফিক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলেছিলো ঃ 'তুমি যদি কোন মিস্‌কীনকে দান-খয়রাত কর, তা' হলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিবো।' পরবর্তী কোন এক সময়ে একজন মিস্‌কীন এসে গৃহের দরজায় হাঁক ছেড়ে বললো ঃ 'হে গৃহবাসী! আমাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু দান কর।' ঘর থেকে স্ত্রী তাকে তিনটি রুটি দান করলো। রুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ সেই মিস্‌কীন মুনাফিকের সম্মুখীন হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তুমি এ রুটি কোত্থেকে পেলে?' মিস্‌কীন লোকটি মুনাফিকের গৃহের কথা বললো। অতঃপর সে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে শাসনের স্বরে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'আমি কি তোমাকে কসম দিয়ে বলি নাই? দান-খয়রাত করলে তালাক দিয়ে দিবো? স্ত্রী বললো ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে দান-খয়রাত করেছি।' এ কথা শুনে মুনাফিক চটে গিয়ে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে উত্তপ্ত অগ্নিতে তাকে আল্লাহ্‌র নামে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলো। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী গহনা-অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সময় মুনাফিক স্বামী তাকে গহনা-অলঙ্কার খুলে ফেলার নির্দেশ দিলে স্ত্রী উত্তরে বললো ঃ 'বন্ধু বন্ধুর জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে থাকে ; এখন আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে যাচ্ছি'—একথা বলেই সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতঃপর মুনাফিক আগুনের গর্তটি উপর দিয়ে ঢেকে রেখে চলে গেলো। তিন দিন পর ফিরে এসে গর্তটি খুলে দেখলো—তার স্ত্রী দিব্যি যেমন ছিলো তেমনি সহী-সালামতে জীবিত রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলো ; এমন সময় অদৃশ্য একটি আওয়ায ভেসে আসলো—'তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে, অগ্নি আমার প্রিয়জনকে কখনো স্পর্শ

করে না।'

ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রাযিঃ) নিজের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি বহুকাল পর্যন্ত ফেরআউন থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। অবশেষে বিষয়টি ফেরআউনের গোচরীভূত হওয়ার পর হযরত আছিয়াকে সে বিভিন্নরূপে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিল। সেমতে তাঁকে বহু রকমে উৎপীড়ন করা হয়। ফেরআউন তাঁকে বলেছিল ঃ 'হে আছিয়া! তুমি তোমার দ্বীনকে পরিত্যাগ কর।' কিন্তু হযরত আছিয়া দ্বীন ও ঈমানের উপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্থিত ছিলেন। পরিশেষে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কীলক (পেরেক) পুতে দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায়ও ফেরআউন যখন তাঁকে দ্বীন ও ঈমান পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি উত্তর করছিলেন ঃ 'হে ফেরআউন! তুমি আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পার ; কিন্তু অন্তঃকরণ তো আল্লাহ্র হাতে ; সেখানে তুমি কোনরূপ অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না ; জেনে রাখ, তুমি যদি আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলো, তাতে আমার ঈমানে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা ; বরং এতে আমার ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে।' এ সময় হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম হযরত আছিয়ার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত আছিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! আপনি বলুন—খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কিনা?' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'হে আছিয়া! আসমানের ফেরেশ্‌তাকুল তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্মুখে তোমার বিষয়ে গৌরব করছেন, তোমার যা মনোবাসনা আছে, আল্লাহ্র কাছে তুমি এখন তা' চেয়ে নাও, তিনি তোমার দো'আ কবুল করবেন।' তখন হযরত আছিয়া দো'আ করলেন ; কুরআনের ভাষায় ঃ

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

'হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি

গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিন।' (তাহ্‌রীম ঃ ১১)

হযরত সালমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়াকে প্রখর রৌদ্রে শাস্তি দিতো। তখন ফেরেশ্‌তারা আপন আপন ডানার সাহায্যে তাঁকে ছায়া দান করতো। হযরত আছিয়া তখন বেহেশ্‌তে স্বীয় আবাসস্থল দেখতে পেতেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—ফেরআউন তার স্ত্রী আছিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চারটি কীলক (পেরেক) পুতে দিয়েছিল এবং বুকের উপর ভারী চাকী বা পেষণ-যন্ত্র স্থাপন করে রেখেছিল। এহেন উৎপীড়নের সময় তাঁর চেহারাকে প্রখর উত্তাপময় সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিতো। এ সময় হযরত আছিয়া আকাশ পানে মাথা উঠিয়ে দো'আ করতেন ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অতি নিকটে বেহেশ্‌ত মাঝে আমাকে আবাস দান কর।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আছিয়াকে অতি উত্তমরূপে মুক্তি দান করেছেন এবং বেহেশ্‌তে তাঁকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বেহেশ্‌তে যেকোন স্থানে বিচরণ করেন এবং পানাহার করে থাকেন।' অতএব সাধকের কর্তব্য হচ্ছে,—সর্বদা আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া ; একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা আপদ-বিপদ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করা পূত-চরিত্র নেক বান্দাদের তরীকা ও আদর্শ এবং এটাই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ।

অধ্যায় ঃ ১১
আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ও মহব্বত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা'হলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (আলি ইমরান ঃ ৩১)

হে মানব! এ কথা স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তোমার মহব্বতের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত ও ইতা'আত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী করা এবং হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। আর 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালবাসবেন' এর অর্থ হচ্ছে, তোমার গুণাহ্ মাফ করবেন এবং তোমার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ করবেন। বস্তুতঃ বান্দার অন্তঃকরণে যদি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সর্বগুণ-উৎকর্ষ ও রূপ-সৌন্দর্যের আধার ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্, বান্দার মধ্যে যে গুণ ও সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় তা' একমাত্র আল্লাহ্রই দেওয়া এবং তাঁরই সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র আর এ বিকাশও অস্তিত্বমান হয় একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহের ফলে, তা'হলে বান্দার মহব্বত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর সে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত-প্রাণ অনুগতে পরিণত হবে। ফলে, উক্ত মহব্বতের আবেদনেই সে আল্লাহ্র ইবাদত ও হুকুম-আহকাম পালন করবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় নিরত থাকবে। তাই, অনেকে মহব্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প করা এবং কার্যতঃ এর বাস্তবায়ন করার নামই মহব্বত'। আর এই ইবাদত ও হুকুম পালনে রীতি-পদ্ধতির প্রশ্নে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় 'এত্তেবায়ে রাসূল' বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়টি।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—'একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে কয়েকজন লোক এসে বললো ঃ 'হুযূর! আমরা আমাদের রব্ব (আল্লাহ্)-কে মহব্বত করি।' তাদের এ কথাটিকে উপলক্ষ করেই নাযিল হয়েছে উপরোক্ত আয়াতটি।'

হযরত বিশ্‌র হাফী (রহঃ) বলেন ঃ 'একদা স্বপ্নযোগে আমার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'হে বিশ্‌র! তুমি কি জান— আল্লাহ্ তা'আলা সমকালীন লোকদের মধ্যে তোমাকে কেন এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন?' উত্তরে আমি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ 'শুন, এর কারণ হচ্ছে—তুমি আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের খেদমত করে থাক, ভ্রাতৃবৃন্দের হিত কামনা করে থাক, বন্ধুজন ও আমার সুন্নতের অনুসারীদেরকে মহব্বত করে থাক এবং তুমি নিজেও আমার সুন্নতের অনুসরণ কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ -

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের উপর আমল করে সেটিকে জিন্দা রাখলো, সে মূলতঃ আমাকে ভালবাসলো! আর আমাকে যে ভালবাসে, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গে বাস করবে।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 'ফিতনা, বিপর্যয় এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত দল-উপদলের উদ্ভবের যমানায় যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, তারা (প্রত্যেকেই) একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।' হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কেবল অস্বীকারকারী দল ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অস্বীকারকারী লোক কারা?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'যারা আমার অনুসরণ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অনুসরণ করবে না তারাই প্রকৃত অস্বীকারকারী ; আমার সুন্নত ও তরীকাবর্জিত যে কোন আমল মূলতঃ আমার প্রতি অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর প্রকাশ

মাত্র।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'তুমি যদি কোন পীরকে আকাশে উড়তে দেখ অথবা সমুদ্রে পানির উপর হেঁটে যেতে দেখ অথবা আগুন ভক্ষণ করতে দেখ কিংবা এ ধরণের কোন অত্যাশ্চর্য কাজ করতে দেখ ; কিন্তু অপরদিকে যদি তাকে আল্লাহ্‌র কোন ফরয হুকুম অথবা নবীজীর (সঃ) কোন সুন্নত পরিত্যাগ করতে দেখ, তা' হলে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এ ব্যক্তি মিথ্যুক ও ধোকাবাজ, তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড কারামত নয় ; বরং সম্পূর্ণ কুহক-ভেলকি মাত্র।' আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধোকা ও প্রবঞ্চনা হতে হিফাযত করুন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'জগতের যে কোন কাজ যদি সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয় তা' হলে জেনে রাখ, সেটা সম্পূর্ণ গলদ ও ভ্রান্ত।' যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ضَيَّعَ سُنَّتِيْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيْ -

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য আমার শাফা'আত হারাম করে দেওয়া হয়েছে।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমাদের উস্তায হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ) একদা পীড়িত হওয়ার পর বহু অন্বেষণের পরও কোথাও তাঁর রোগ নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যায় নাই এবং তাঁর ব্যাধির মূল উৎস কি, তা' নিরূপণ করাও সম্ভব হয় নাই। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বোতলে করে তাঁর প্রস্রাব দেখানো হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি যে, এটা কোন আশেক বা প্রেমোন্মাদ ব্যক্তির প্রস্রাব।' একথা শুনার পর হযরত জুনাইদ (রহঃ) মূর্ছে পড়লেন ; তৎক্ষণাৎ চিৎকার দিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার হস্তস্থিত প্রস্রাবের বোতলটি পড়ে গেল। হযরত জুনাইদ বলেন ঃ আমি ফিরে এসে হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি শুনে মৃদু হেসে বললেন ঃ 'ডাক্তার বড় অভিজ্ঞ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হুযুর! প্রস্রাব দেখেও কি ইশ্‌ক ও মহব্বতের বিষয় অনুভব করা যায়? তিনি

বললেন ঃ 'অবশ্যই'।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আল্লাহ্‌কে তুমি মহব্বত কর কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি নিশ্চুপ থাকবে। কেননা তুমি যদি উত্তরে 'না' বলো, তা'হলে এটা হবে কুফ্‌র। আর যদি উত্তরে 'হাঁ' বলো, তা' হলে এটা মহব্বতকারীদের নীতি ও চরিত্র-বহির্ভূত কাজ হবে ; এভাবে হয়ত তোমাকে প্রেমাস্পদের রোষের ভাগী হতে হবে।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতকারীকে যদি কেউ ভালবাসে, তা' হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই ভালবাসলো। অনুরূপ, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ সম্মান করে, তা'হলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কেই সম্মান করলো।'

হযরত সাহ্‌ল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌কে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে কুরআনের প্রতি মহব্বত থাকা, আল্লাহ্ এবং কুরআনকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকা, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকা, তাঁর সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকার লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের প্রতি মহব্বত থাকা, আখেরাতকে মহব্বত করার লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা থাকা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির লক্ষণ হচ্ছে দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী নিতান্ত প্রয়োজনে যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করা ; যতটুকু পরকালের পথিকের জন্য না-হলেই না-হয়।'

হযরত আবুল হাসান যান্‌জানী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইবাদতের মৌল বিষয়কে ত্রিবিধ অঙ্গের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যথা ঃ চোখ,—এর মাধ্যমে তুমি দৃষ্টি করে ইব্‌রত ও শিক্ষা হাসিল করবে। দ্বিতীয় ঃ অন্তর,—এর মাধ্যমে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান-প্রণিধান করবে। তৃতীয় ঃ রসনা (জিহবা),—এর মাধ্যমে তুমি সত্য ও হক কথা বলবে এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও তাসবীহ্-তাহ্‌লীল করবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ কর।' (আহ্‌যাব ঃ ৪১,৪২)

একদা হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আহমদ ইব্‌নে হরব্ (রহঃ) কোথাও গিয়েছিলেন। তথায় হযরত আহমদ ইবনে হরব্ (রহঃ) মাটির উপর থেকে কিছু তরু-তাজা ঘাস উপ্‌ড়িয়ে ফেলেছিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) তাঁকে বললেন ঃ দেখ, হে আহমদ! তোমার এ কাজটির কারণে পঞ্চবিধ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ঃ এক, তোমার অন্তর মাওলা পাকের যিক্‌র ও তসবীহ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ঘাসে মগ্ন হয়েছে। দুই, তোমার নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের পরিপন্থী কাজে অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ করে দিলে। তিন, তুমি এ অহেতুক কাজটির পথ খুলে দিলে, অন্যরা এখন তোমার অনুকরণে এতে লিপ্ত হবে। চার, তুমি এ ঘাসের যিক্‌রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে। পাঁচ, ক্বিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে নালিশের পক্ষে তুমি নিজেই একটি প্রমাণ প্রস্তুত করে দিলে।'

হযরত সির্‌রী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত জুরজানী (রহঃ)-কে দেখেছি, তিনি শুধু ছাতু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। একদা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনি কেবল ছাতু আহার করে থাকেন, অন্য কোন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না—এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ 'হে সির্‌রী! অপর কোন খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাওয়ার জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় ; আমি হিসাব করে দেখেছি এ সময়টুকুতে শুধু ছাতু খেয়ে নিলে আমি নব্বই বার বেশী 'সুবহানাল্লাহ্' পড়তে পারি। এই তারতম্যের কারণেই আজকে চল্লিশ বৎসর যাবত আমি রুটি আহার করি না।'

হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) প্রতি পনের দিন পর একবার মাত্র আহার করতেন। রমযান মাসে সেহ্‌রী ও ইফ্‌তারের সময় মাত্র এক এক লুকমা খাদ্য গ্রহণ করতেন। কোন কোন সময় এমন হতো যে, তিনি সত্তর দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন ; খানা খেলে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে যেতো আর না খেলে তিনি সবল থাকতেন।

আবু হাম্মাদ আস্‌ওয়াদ (রহঃ) ত্রিশ বৎসরকাল মসজিদুল-হারামে অবস্থান করে কাটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কেউ তাঁকে পানাহার করতে দেখে নাই এবং তাঁর একটি মুহূর্তও আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয় নাই।

হযরত আমর ইবনে উবাইদ (রহঃ) মাত্র তিনটি কাজের জন্য ঘর থেকে বের হতেন ঃ এক, জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য। দুই, কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য। তিন, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। তিনি বলতেন ঃ 'আমি মানুষের মূল্যবান জীবন চুরি-ডাকাতি করে বিনষ্ট করতে দেখেছি ; অথচ জীবন হচ্ছে মানুষের মহামূল্য রত্ন এর সাহায্যে আখেরাতের অনন্তকালের জীবনের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা উচিত। হে আখেরাতের পথে বিচরণকারী! তোমার জন্য অপরিহার্য যে, তুমি পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর লোভ-লালসা থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হয়ে যাও। যাতে একমাত্র আখেরাতের ফিকির ছাড়া অন্য কোন ধান্দা তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তোমার ভিতর ও বাহির যাতে একই ফিকিরে নিমগ্ন থাকে। তা' হলেই তোমার দ্বারা আখেরাতের জীবনে কল্যাণ সাধন সম্ভব ও সহজতর হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রথম প্রথম আমি নিদ্রার আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য সুরমার সাথে নিমক (লবণ) মিশ্রণ করে চোখে ব্যবহার করতাম। পরবর্তীতে যখন পূর্ণ রাত্রি জাগরণে ব্রতী হয়েছি, তখন থেকে চোখে শুধু নিমক ব্যবহার করে থাকি।'

হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা নিদ্রার অধিক মাত্রাকে পরাভূত করার জন্য নদীতে অবতরণ করে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করতেন। তখন দরিয়ার মৎস্যরাজি তাঁকে ঘিরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাসবীহ করতে থাকতো। হযরত ওহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ্‌ (রহঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেছেন, যাতে সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিদ্রাকে উঠিয়ে নেন। ফলে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এক মুহূর্তও ঘুমান নাই। হযরত হাসান হাল্লাজ (রহঃ) নিজেকে টাখ্‌ন হতে হাঁটু পর্যন্ত তেরটি বেড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রতি রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) তাসাওউফে ব্রতী হওয়ার পর সূচনাতেই এতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দোকান খুলে তাতে প্রবেশ করার পর পর্দা টানিয়ে দিতেন এবং চারশত রাকাত নফল নামায পড়ে বাড়ী ফিরে যেতেন।

হযরত ইব্‌নে দাউদ (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইশা'র উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। বস্তুতঃ ঈমানদার ব্যক্তির উচিত—সে সবসময় উযূ অবস্থায়

থাকবে, উযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় উযূ করে দু'রাকাত নফল পড়বে ; সবসময় কেবলামুখী হয়ে বসার চেষ্টা করবে, অন্তরে এই ধ্যান-খেয়াল জাগরূক রাখবে যে, পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্মুখে উপস্থিত। এই ধ্যানমগ্নতার ফলে প্রতিটি কাজে প্রশান্তি অনুভব হবে, দুঃখ-মুসীবতে ধৈর্যধারণ সহজ হবে। মুসলমানের নীতি হচ্ছে,—সে কাউকে দুঃখ দিবে না, শত্রুর মুকাবেলা করবে না, বরং দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সকলের জন্য নেক দো'আ করবে। সে কখনো অহংকার ও আত্মসমর্থনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। স্বীয় আমল-ইবাদতের জন্য বড়াই ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবে না। কেননা এটা কোন মুসলমানের নীতি বা চরিত্র নয় ; বরং শয়তানের খাসলত। মুসলমান সর্বদা বিনয়ী থাকবে ; নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে, নেক বান্দাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। কেননা যার অন্তরে নেক লোকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবান লোকদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদতের মান-মর্যাদা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অজ্ঞ, সে হৃদয়ের প্রশান্তি ও সুরুচি হতে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ 'হে আবূ আলী (তাঁর উপনাম)। কি কি গুণের সমাবেশ হলে একজন মানুষকে সৎ বলা যায়? তিনি উত্তর করেছেন ঃ 'যখন তার অন্তরে পরোপকার ও কল্যাণ-কামনার গুণ বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ভয় থাকবে, যবানে সর্বদা সে সত্য ও হক বলবে এবং দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সৎকাজে ব্যপৃত রাখবে, তখন তাকে নেক ও সৎ বান্দা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।'

মি'রাজের সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ 'হে আহমদ (আল্লাহ্র রাসূলের অপর নাম)। তুমি যদি দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হতে চাও, তা' হলে দুনিয়ার ব্যাপারে তুমি অনাসক্ত ও উদাসীন হয়ে যাও এবং আখেরাতের ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্গ্রীব হও।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আয় আল্লাহ্! আমি দুনিয়ার ব্যাপারে কিভাবে অনাসক্ত হবো?' আল্লাহ্ পাক বললেন—'তুমি তোমার পানাহার ও পরিধানের জন্য

দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী হতে কেবল এতটুকু গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার একান্ত প্রয়োজন, আগত দিনের জন্য তুমি কপর্দক পরিমাণও জমা রেখো না, আর সর্বদা আমার যিক্‌রে মগ্ন থাক।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন ঃ 'আমি সর্বদা যিক্‌র কিভাবে করবো?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'মানব কোলাহল থেকে নিরবতায় স্থান গ্রহণ কর, অধিক নামায পড়াকেই নিদ্রার স্থলাভিষিক্ত করে নাও এবং অভুক্ত থাকাকেই পানাহার মনে কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ.

'দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি মানবের দেহ-মনে সুখ ও প্রশান্তি আনয়ন করে।'

পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপাচারের মূল এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা সকল নেকী ও কল্যাণের উৎস।

একদা আল্লাহ্‌র এক পুণ্যবান বান্দা কোথাও যাওয়ার সময় একটি সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য করলেন ; তিনি দেখলেন, একজন চিকিৎসক সমবেত লোকজনের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করছেন এবং রকমারী ঔষধের কথা বাত্‌লিয়ে দিচ্ছেন। চিকিৎসককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হে দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক! তুমি কি আত্মার ব্যাধিরও চিকিৎসা করতে পার?' চিকিৎসক বললেন—'হাঁ ; আপনার রোগ বলুন।' তিনি বললেন ঃ 'পাপ-পংকিলতার কারণে আমার আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে ; ফলে আমার অন্তর খুবই শক্ত ও কঠিন হয়ে আছে—এর কি চিকিৎসা হতে পারে?' চিকিৎসক বললেন—'এর এলাজ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে বিনয়-বিনম্রচিত্তে অবনত মস্তকে কান্নাকাটি করুন ; দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আপনার আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য এটাই একমাত্র চিকিৎসা।' একথা শুনে পুণ্যবান লোকটি চিৎকার দিলেন এবং রোদন করতে করতে ফিরে আসলেন আর বলতে থাকলেন—'তুমি অতি উত্তম চিকিৎসক, আমার আত্মার সঠিক এলাজ তুমি করেছো।' চিকিৎসক

বললেন—'স্মরণ রাখবেন, এ চিকিৎসা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অতীত জীবনের কৃত পাপকর্ম থেকে সঠিক তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে এসেছে।'

জনৈক ব্যক্তি একদা একটি কৃতদাস খরিদ করেছিলো। কৃতদাস মনিবকে বললো, 'হে মনিব! আপনার কাছে আরজ করার মত আমার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ এক,— ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হলে, আপনি আমাকে ইবাদত হতে বিরত রাখবেন না। দুই,—দিনের বেলায় আপনি আমাকে যে কোন কাজের নির্দেশ দিন, তা' আমি উৎফুল্লচিত্তে পালন করবো ; কিন্তু রাতে আমাকে কোন কাজের হুকুম করবেন না। তিন,—আপনার বাড়ীতে আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্জন কোঠার ব্যবস্থা করে দিন, সেখানে আমাকে ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' মনিব তার সব কয়টি শর্ত মেনে নিলো এবং বললো,—'তোমার পছন্দ মত একটি কামরা বেছে নাও'। অতঃপর সে অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন একটি কামরা পছন্দ করে নিলো। মনিব জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এই ক্ষুদ্র ও ভগ্ন কামরাটি কেন বেছে নিলে? সে বললো ঃ 'হে মনিব! আপনি কি জানেন না যে, ভগ্ন ও উজাড় কামরা আল্লাহ্ পাকের যিক্‌রের দ্বারা বাগিচায় পরিণত হয়?' অতঃপর সে উক্ত কামরায় অবস্থান করতে লাগলো ; দিনের বেলা সে মনিবের খেদমত করতো এবং রাতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদা মনিব পায়চারি করতে করতে গোলামের হুজ্‌রার কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো—কামরার অভ্যন্তরে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি চমকাচ্ছে এবং গোলাম সিজ্‌দায় পড়ে আছে, আর তার মাথা বরাবর যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত একটি নূরের কিন্দীল (লণ্ঠন বা প্রদীপ) ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এদিকে গোলাম অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে রোদন করে মুনাজাত করছে ঃ 'আয় আল্লাহ্! আপনি আমার উপর মনিবের খেদমত লাযেম ও অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যদি আমার উপর এ দায়িত্ব না থাকতো, তা' হলে আমি শুধু আপনার ইবাদতেই মশগুল থাকতাম। অতএব হে আল্লাহ্! আমার এই অপারগতা আপনি কবুল করে নিন।' এদিকে মনিব এ সবকিছু অবলোকন করছিল। অবশেষে সকাল বেলা সেই কিন্দীল বা নূরের জ্যোতি বিলীন হয়ে গেলো এবং গৃহের ছাদ আবার পূর্বের মত হয়ে

গেলো। অতঃপর মনিব সেখান থেকে প্রস্থান করে তার স্ত্রীর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলো। পরদিন রাতে মনিব স্ত্রীকে নিয়ে গোলামের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো—পূর্বের ন্যায় তাঁর মাথা হতে আসমান পর্যন্ত নূরের কিন্দীল ঝুলছে আর সে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছে। এভাবে রাত প্রভাত হলে তারা গোলামকে ডেকে বললো—তোমাকে আমরা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম ; তুমি এখন আমাদের দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, যাতে তুমি আল্লাহ্র দরবারে যে উযর পেশ করেছিলে, তা' তোমার জন্য আল্লাহ্র ইবাদতে বাধা না হয়। এরপর গোলাম আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্বক নিম্নের পংক্তিটি পড়লো ঃ

يَا صَاحِبَ السِّرِّ إِنَّ السِّرَّ قَدْ ظَهَرَا
وَلَا أُرِيْدُ حَيَاتِيْ بَعْدَ مَا اشْتَهَرَا

'হে গোপন রহস্যের মালিক! আমার গোপন ভেদ প্রকাশিত হয়ে গেছে, এখন আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।'

তারপর সে বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করি, আমাকে এ মুহূর্তেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।' এই দো'আর পরমুহূর্তেই সে মাটিতে লুটে পড়লো এবং চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আশেক ও নেক সাধকদের অবস্থায়ই এরূপ হয়ে থাকে ; এ থেকে আমাদের সবক হাসিল করা উচিত।

'যাহ্রুর-রিয়াদ' কিতাবে আছে—হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে এক ব্যক্তির গভীর বন্ধুত্ব ছিল। একদা সে বললো ঃ 'হে মূসা! আপনি দো'আ করে দিন, যাতে আমি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যথার্থ হক অনুযায়ী চিন্তে পারি।' মূসা আলাইহিস্ সালাম দো'আ করে দিলেন এবং তা' আল্লাহর দরবারে কবূল হলো। অতঃপর লোকটি পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে বন্য জীব-জন্তুর সাথে মিশে গেলো। মূসা আলাইহিস্ সালাম বন্ধুকে না পেয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি আমার ভ্রাতা ও বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি ; আমাকে তার সংবাদ জানিয়ে দিন।' উত্তর আসলো, 'হে মূসা! আমার সত্যিকার মা'রেফাত যার হাসিল হয়েছে, সে কখনও মাখলুকের

সাহচর্যে থাকতে পারে না।'

বর্ণিত আছে—একদা হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া আলাইহিমাস্ সালাম বাজারে পায়চারি করছিলেন। এ সময় হঠাৎ একজন মহিলার গায়ে তাঁদের ধাক্কা লাগে। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'খোদার কসম, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না ; আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলাম।' হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! আপনার সম্পূর্ণ দেহটি আমার সাথে ; অথচ আপনার অন্তঃকরণ এ সময় কোথায় ঘুরছে?' তিনি বললেন ঃ 'ভাই! আমার অন্তর যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও কল্পনা করে, তা'হলে আমার এরূপ মনে হয় যে, আমি আল্লাহকে চিনি নাই।'

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন ঃ 'আল্লাহর সঠিক পরিচয় প্রাপ্তির লক্ষণ হচ্ছে,––দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে পরিত্যাগ করা এবং একমাত্র মাওলার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাওয়া। খোদার প্রেমিক মহব্বতের অমৃত সুরায় এমন বিভোর–সংজ্ঞাহীন হবে যে ক্বিয়ামতে খোদার দীদারের আগে হুঁশে আসবে না। এটা বান্দাকে খোদার পক্ষ হতে দেওয়া এক বিশেষ নূর।'

অধ্যায় ঃ ১২

ইবলীস ও ইবলীসের শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।' (আলি-ইমরান ঃ ৩২)

অর্থাৎ—তারা যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইতা'আত ও আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা'হলে আল্লাহ তা'আলা এহেন কাফেরদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের তওবাও কবূল করবেন না। যেমন ইবলীসের তওবা তার কুফ্র ও অহংকারের কারণে কবুল করেন নাই। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হযরত আদম (আঃ) নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং এজন্যে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন ; পরন্তু নিজেকে মালামত ও ভৎর্সনা করেছিলেন। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের কৃতকর্মটি মূলতঃ কোনরূপ গুনাহ্ ছিল না। কেননা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে থাকেন ; কখনও তাঁদের দ্বারা কোনরূপ গুনাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয় না। এমনকি অধিকতর সঠিক অভিমত অনুযায়ী নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে তো বটেই, নবুওয়াতের পূর্বেও তাঁরা নিষ্পাপ থাকেন তথাপি অনুষ্ঠিত কার্যটি যেহেতু বাহ্যতঃ গুনাহের সদৃশ ছিল, তাই হযরত আদম ও হাউওয়া আলাইহিমাস সালাম উভয়ই সেটাকে স্বীকার করেছিলেন এবং আল্লাহ্র কাছে এভাবে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سكته وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি, যদি

আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।' (আ'রাফ ঃ ২৩)

তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তওবা, লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط

'তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (যুমার ঃ ৫৩)

পক্ষান্তরে, ইবলীস না গুনাহ্ স্বীকার করেছে, না লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে, না নিজেকে ভৎর্সনা করেছে, না আল্লাহ্র রহমতের কোন আশা করেছে ; বরং সে রীতিমত আস্ফালন করতে শুরু করেছে। অতএব যে ব্যক্তির অবস্থা এই ইবলীসের মত হবে, তার তওবা কবূল হবে না। আর যার অবস্থা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ন্যায় হবে, তার তওবা কবুল হবে। কেননা যে গুনাহ্ লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, সেটার ক্ষমা ও মার্জনার আশা করা যায় ; কিন্তু যে গুনাহ্ অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কালকূট বিষ থেকে উৎসারিত হয়, সেটার ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণের আশা করা যায় না। মূলতঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ত্রুটির উৎস ছিল (ফল ভক্ষণের) লোভ আর ইবলীসের পাপ ও অবাধ্যতার কারণ ছিল তার অহংকার ও আত্মম্ভরিতা।

বর্ণিত আছে,—একদা পাপিষ্ঠ ইবলীস হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ 'হে মূসা! আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালত ও নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত করেছেন, আপনার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।' হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'তা অবশ্যই ; কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি আমার কাছে কি চাও? এবং তুমি কে?' ইবলীস বললো,– 'হে মূসা! আপনি আপনার প্রভুর কাছে বলুন যে, আপনার একজন মাখ্লূক তওবা করতে চায়।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন ঃ 'হে মূসা! তুমি তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দরখাস্ত শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাকে হুকুম কর, সে যেন আদম আলাইহিস্ সালামের কবরকে সম্মুখে রেখে সিজদা করে। যদি

সে এভাবে সিজদা করে নেয়, তা' হলেও আমি তার তওবা কবুল করে নিবো এবং তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবো।' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইবলীসকে এভাবে বললে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং দম্ভের সাথে বলতে লাগলো,—'হে মূসা! আমি আদমকে বেহেশ্তে সিজদা করি নাই, এখন তার মৃত্যুর পর আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।'

বর্ণিত আছে,—ইবলীসকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করার পর কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে,—'আল্লাহ্র আযাব কেমন হচ্ছে?' সে বলবে,—'অত্যন্ত কঠিন, যারপর আর কঠিন আযাব হতে পারে না।' এ সময় ইবলীসকে বলা হবে, 'হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তো বেহেশ্তে আছেন, তুমি এখনও তাকে সিজদা করে মাফ চেয়ে নাও, তোমাকে মাফ করে দেওয়া হবে।' এ কথার পরেও সে হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। অতঃপর অন্যান্য দোযখীদের তুলনায় তার আযাব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে এক লক্ষ বৎসর পর পর দোযখ হতে বাহিরে আনয়ন করবেন এবং হযরত আদম (আঃ)–কেও বাহিরে আনা হবে। অতঃপর তাকে সিজদা করার হুকুম করা হবে। তখনও বারবার ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করবে। এভাবে তাকে পুনঃ পুনঃ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রিয় সাধক! তুমি যদি ইবলীসের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে মাওলা পাকের সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং আত্মরক্ষার জন্য তার কাছেই প্রার্থনা কর।

কিয়ামতের দিন আগুনের একটি কুরসী পাতা হবে, এবং ইবলীসকে সেই কুরসীর উপর বসানো হবে। তখন সে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে। এ চিৎকার শুনে অন্যান্য শয়তান ও কাফেরগণ তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবে। তখন সে বলবে,—'হে দোযখের অধিবাসীরা! তোমরা কেমন পেলে? তোমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছিলেন, তা' বাস্তবে পেয়েছো?' তারা বলবে,—'আমাদের প্রভু যা বলেছিলেন, তা' সবই সত্য এবং আমরা সবই বাস্তবে পেয়েছি।' ইবলীস পুনরায় বলবে ঃ 'আজ আমি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে

হুকুম করবেন,—'ইবলীস এবং ইবলীসের সকল অনুসারীকে লোহার গুরুজ দিয়ে শাস্তি প্রদান কর।' অতঃপর এভাবে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীর তলদেশের দিকে ধাবিত হতে থাকবে এবং কস্মিনকালেও তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

বর্ণিত আছে,—ক্বিয়ামতের দিবস ইবলীসকে হাজির করার পর আগুনের কুরসীতে বসানো হবে, তার গলায় অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা 'যাবানিয়া (জল্লাদ ফেরেশ্তাদের)'-কে হুকুম করবেন যে, 'তাকে হেঁচড়িয়ে টেনে কুরসী হতে অপসারণ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।' ফেরেশ্তাগণ তাকে ধরে অনেক চেষ্টা করবে কিন্তু জাহান্নামে ফেলতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করবেন— আশি হাজার ফেরেশ্তার সহযোগিতায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে ; কিন্তু তিনিও এতে ব্যর্থ হবেন। অনুরূপ হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালামও ব্যর্থ হবেন। হযরত আয্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে হুকুম করা হবে এবং প্রত্যেক ফেরেশ্তার সাথে আরও আশি হাজার করে ফেরেশ্তা সহযোগী হবে ; কিন্তু তিনিও এভাবে ব্যর্থ হবেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'আমি যত ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছি, তৎসমুদয়ের দ্বিগুণ ফেরেশ্তাও যদি এ কাজে প্রয়াস চালায়, তথাপি ইবলীসকে এখান থেকে অপসারণ করতে পারবে না। কারণ, আমি তার গলায় লা'নত ও অভিশাপের বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি।

বর্ণিত আছে,—দুনিয়ার আসমানে ইবলীসের নাম ছিল আবেদ (ইবাদত-গুযার), দ্বিতীয় আসমানে নাম ছিল যাহেদ (সর্বস্ব ত্যাগী), তৃতীয় আসমানে নাম ছিল আরেফ (খোদার যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত), চতুর্থ আসমানে ছিল ওলী (আল্লাহ্র দোস্ত), পঞ্চম আসমানে ছিল তক্বী (মুত্তাকী-পরহেযগার), ষষ্ঠ আসমানে ছিল খাযেন (সম্পদ সংরক্ষক-আমানতদার), এবং সপ্তম আসমানে ছিল আযাযীল ; কিন্তু লাউহে মাহ্ফূযে তার নাম ছিল ইবলীস (নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত), সে নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ও বে-খবর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে সিজদা করার হুকুম করলেন, তখন সে বলেছে,—'আদমকে আপনি আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আমি

তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন,—'আমি আমার অভিপ্রায়ে যা ইচ্ছা তা' করে থাকি।' ইবলীস তখন নিজেকে বড় এবং বুযুর্গ জ্ঞান করে অহংকার ও ঘৃণা-অবজ্ঞার সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দম্ভভরে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র হুকুমের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত আদমের জন্য সিজদাবনত অবস্থায় পড়েছিলেন। ফেরেশ্তাগণ সিজদা শেষ করে মাথা উত্তোলন করার পর যখন দেখলেন, ইবলীস সিজদা করে নাই, তখন তারা আল্লাহ্র হুকুম পালনে তাওফীক প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয়বার শুক্রানা সিজদা আদায় করেন। কিন্তু ইবলীস সেই পূর্ববৎ হযরত আদম থেকে মুখ ফিরিয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে থাকে ; আল্লাহ্র আনুগত্য ও হুকুম পালনের মোটেও চিন্তা করে নাই ; না-ফরমানী ও অবাধ্যতার উপর কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করে নাই। এই কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতিতে শূকরের ন্যায় উপুড় করে দেন। তার মাথা উটের মাথার ন্যায়, বক্ষভাগ বৃহদাকার উষ্ট্রের কুঁজের ন্যায় করে দেন, মুখমণ্ডল বানরের চেহারায় বিকৃত করে দেন। চক্ষুদ্বয় চেহারার প্রস্থের দিকে সংকীর্ণ করে দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়িয়ে লম্বা করে দেন—তখন চক্ষুদ্বয়ে বিশ্রী ফাটা দাগ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। তার নাসিকার ছিদ্রদ্বয় সিঙ্গাকারী (দুষিত রক্ত বের করার কারিগর) ব্যক্তির লুটার ন্যায় খোলা দেখা যায়। তার ঠোঁট দু'টি গরুর ঠোঁটের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং দাঁতগুলো শূকরের দাঁতের মত বাহিরের দিকে বের হয়ে থাকে। তার মুখমণ্ডলে দাঁড়ির মাত্র সাতটি পশম বাকী রয়েছে। তাকে জান্নাত থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। বরং আসমান ও যমীনের সকল আবাদ এলাকা হতে বের করে অনাবাদী বিজন প্রান্তরে বিতাড়িত করা হয়েছে। মনুষ্য আবাসে এখন সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। হাশরের কর্মফল দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মালঊন ও অভিশপ্ত করে দিয়েছেন ; কারণ সে জঘন্যতম কাফেরে পরিণত হয়েছে। প্রিয় সাধক! এখন চিন্তা করার বিষয়,—এ-তো সে-ই, যে এক সময় মুগ্ধকর রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। অতি আকর্ষণীয় চারটি ডানা ছিল তার। অগাধ জ্ঞান-বিদ্যা ও আমল-ইবাদতের অধিকারী ছিল সে। ফেরেশ্তাদের মধ্যে তার উপাধি ছিল 'তাঊসুল-মালায়িকাহ্' বা

সৌন্দর্যের ময়ূর। সকলের মান্য-গণ্য ও বরেণ্য ছিল সে। কিন্তু শুধুমাত্র অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে কোন কিছুই তার কাজে আসে নাই। এতে শিক্ষণীয় বহুকিছু রয়েছে ; কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণ ও আমল-ইবাদতই মুখ্য নয়, আল্লাহ্ তা'আলার ফযল-করম ও মেহেরবানীই হচ্ছে আসল বিষয়।

বর্ণিত আছে,—যখন ইবলীস দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমাস্ সালাম ক্রন্দন করে উঠবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি কারণে কাঁদছো?' তাঁরা বলবেন,—'ইয়া আল্লাহ্! আমাদের ভয় হয়,—কখন আমাদের উপরেও এহেন দুর্গতি এসে পড়ে ; এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারছি না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন,—'তোমরা আমা হতে বস্তুতঃই এরূপ ভীত ও শঙ্কিত থাক।'

রেওয়ায়াতে আছে,—একদা ইবলীস বলেছিল ঃ 'পরওয়ারদিগার! আমাকে আদমের কারণে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছেন, আপনি যদি আমাকে ক্ষমতা দান না করেন, তা' হলে আমি তার শত্রুতা ও ক্ষতিসাধন করতে পারবো না।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমি তোকে ক্ষমতা দান করলাম।' অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের উপর সে ক্ষমতা পেয়ে গেল ; তবে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম মাসূম ও নিষ্পাপ হওয়ার কারণে শয়তান থেকে মাহ্ফুয থাকবেন ; তাঁদের উপর তার কোন ক্ষমতা চলবে না। ইবলীস বললো,—'আমাকে আরও অধিক ক্ষমতা দান করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'এক একজন আদম সন্তানের শত্রুতার জন্য তোর দুই-দুইটি সন্তান জন্ম নিবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ বললেন,—'তাদের বক্ষদেশ তোর আবাসস্থল হবে এবং তাদের শিরায় শিরায় তোর চলার ক্ষমতা থাকবে।' সে বললো,—'আরও অধিক করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন,—'আদম সন্তানের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মেতে উঠ্, তোর সর্ববিধ সহযোগীদের নিয়ে তাদের ক্ষতিসাধনে মত্ত হয়ে যা, তাদেরকে ধন-সম্পদ উপার্জনে, জীবিকা নির্বাহে হারাম ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যা। তাদের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হারাম উপায়—যথা, ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীগমণে

উদ্বুদ্ধকরণ, সন্তান-সন্ততির শিরকী নাম রাখা, যেমন আবদুল উয্‌যা ইত্যাদি—অবলম্বনে প্রতারিত কর। অনুরূপ, ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদ পেশ করে গর্হিত ও কলুষিত বাক্য ও কার্যাবলীর দ্বারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট কর, যেমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান, মূর্তিপূঁজার জন্য উদ্বুদ্ধ করে একথা বলা যে, এরা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা বাপ-দাদার বুযুর্গীর দ্বারাই নাজাত পেয়ে যাবে কিংবা দীর্ঘদিন বাঁচার আশা দিয়ে তওবা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি। এসবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার সাবধানতার জন্য করা হয়েছে।

অপরদিকে হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'হে পরওয়ারদিগার। 'আপনি ইবলীসকে আমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির উপর ক্ষমতাবান করে দিয়েছেন ; এখন আপনার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই।' আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন,—'তোমার প্রতিটি সন্তানের সাথে একজন করে সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত থাকবে।' আদম (আঃ) বললেন,—'ইয়া আল্লাহ্‌! আমাদেরকে আরও অধিক সাহায্য করুন।' আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন,—'যতক্ষণ পর্যন্ত আদম সন্তানের দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকবে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন,—'আরও সাহায্য করুন।' আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমি আদম-সন্তানকে ক্ষমা করতে থাকবো, তারা যত গুনা-ই করুক না-কেন, আমি কোন পরওয়া করবো না।' হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালাম বললেন,—'এখন যথেষ্ট হয়েছে।'

ইবলীস আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করেছে,—'হে আল্লাহ্‌। আপনি বনী আদমের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন ; কিন্তু আমার বার্তাবাহক কে হবে?' আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ঃ 'তোর বার্তাবাহক হবে গণক বা জ্যোতিষকর্মীরা।' ইবলীস বললো,—'আমার কিতাব কি হবে?' আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 'শরীর গোদানোর নক্‌শা।' সে বললো,—'আমার কালাম কি হবে?' আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 'মিথ্যা'? সে বললো,—'আমার কুরআন কি হবে? আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 'কবিতা।' সে বললো,—'আমার মুআয্‌যেন কে?' আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 'বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র।' সে বললো,—'আমার মসজিদ কি?' 'আল্লাহ্‌ বললেন,—'বাজার'। সে বললো,—'আমার গৃহ কি?' আল্লাহ্‌ বললেন ঃ

'হাম্মামখানা (গোসলখানা বা স্নানাগার)।' সে বললো,—'আমার খাদ্য কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়া হবে না।' সে বললো,—'আমার পানীয় কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'শরাব (মদ)।' সে বললো,—'আমার শিকারের জাল (ফাঁদ) কি?' আল্লাহ্ বললেন ঃ 'মেয়েলোক।'

অধ্যায় ঃ ১৩

আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর আমানত

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভীত হলো।' (আহ্‌যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এরা ভয় ও আশংকা করেছে যে, আমানতের এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকরণে কোনরূপ খেয়ানত বা ত্রুটি হলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসবে। আলোচ্য আয়াতে 'আমানত' শব্দ দ্বারা ইবাদত–বন্দেগী ও ফরয আমলসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেগুলো পুরাপুরিভাবে পালন করলে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ এবং অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'সহীহ্‌ অভিমত অনুযায়ী 'আমানত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বীনের সকল আমল ও আহ্‌কামই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।' এ অভিমতটি উম্মতের প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছে। তবে বিষয়টির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে মাল–সম্পদের আমানত তথা হিফাযতের জন্য কারও কাছে রক্ষিত ধন–দওলতের কথা বলা হয়েছে।' হযরত ইব্‌নে মাস্‌উদ থেকে এ ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা সমস্ত ফরয কার্যসমূহকে উদ্দেশ্য

করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে মাল ও সম্পদের আমানতই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার।' হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেন,—'জানাবতের (ফরয) গোসলকার্য সম্পন্ন করাও একটি আমানত।' হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন,—'আল্লাহ্ তা'আলা মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম লজ্জাস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন,—'হে মানব! এটা আমানত, যা আমি তোমার কাছে রেখেছি ; অবৈধ ব্যবহারে এতে কোনরূপ খেয়ানত করো না—তুমি যদি এর হিফাযত কর, তা' হলে আমি তোমার হিফাযত করবো।' অতএব লজ্জাস্থান যেমন আমানত, তেমনি কান, চোখ, জিহবা, পেট, হাত, পা প্রভৃতিও আমানত। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটির হিফাযত অপরিহার্য কেননা 'যে ব্যক্তির আমানতদারী নাই, মূলতঃ তার ঈমানদারীই নাই।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—যখন আসমান, যমীন ও পাহাড়সমূহের উপর আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন এগুলো এবং এগুলোর উপর যা কিছু ছিল সব কম্পমান হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'তোমরা যদি এ আমানত গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে পারো, তা' হলে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো। আর তা' না হলে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো।' তারা বললো,—'হে আল্লাহ্! আমরা এ গুরুতর দায়িত্বের উত্তাপ সহ্য করতে পারবো না।' হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর তাঁর সম্মুখে যখন উক্ত আমানত পেশ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেছেন,—'পরওয়ারদিগার! আমি আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করে নিলাম।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার পর এদেরকে তা' প্রত্যাখান করার অবকাশ ও এখ্‌তেয়ার দেওয়া হয়েছিল ; এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা হয় নাই। তা' না হলে উপস্থাপিত আমানত গ্রহণ না করে তাদের কোন গত্যন্তর থাকতো না।

হযরত কাফ্‌ফাল (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ উক্ত আয়াতে আসমান, যমীন ও পর্বতমালার উপর আমানত পেশ করার বিষয়টিকে উদাহরণ বা উপমা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলোর অতিশয় বিশালতার কারণে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের বোঝা যদি এদের উপর চাপিয়ে দেওয়া

হতো,— যেগুলোর উপর শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয় নির্ভর করে—তা' হলে এই বিশালতা সত্ত্বেও এদের দ্বারা আমানতের গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হতো না ; বরং তারা সম্পূর্ণ অপরাগ ও অক্ষম হতো। অথচ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এই মহানতর দায়িত্ব স্বস্কন্ধে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط

'কিন্তু মানুষ তা' বহন করলো।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

রূহ্ জগতে হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল সন্তান–সন্ততির কাছ থেকে যখন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তখনই হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আমানতের এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٥

নিশ্চয়ই সে জালেম অজ্ঞ।' (আহ্যাব ঃ ৭২)

অর্থাৎ,—আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার মুহূর্তে পরিণামের সর্ববিধ আশংকার ব্যাপারে সে অজ্ঞ ছিল অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম–আহ্কাম সম্পর্কে সে অনবগত ছিল।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে এ আমানত পেশ করার সময় বলা হয়েছিল ঃ 'হে আদম! এ আমানতের সাথে আরও যা' কিছু আছে, সব সহকারে তুমি তা' বহন কর ; এরপর যদি তুমি আমার অনুগত হয়ে চলো, তা'হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আর যদি না–ফরমানী করো, তা' হলে তোমাকে শাস্তি দিবো।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ 'আমি সবকিছু সহ উক্ত আমানত গ্রহণ করলাম।' অতঃপর আমানত গ্রহণের এ দিনটিতে কেবল আসরের পর থেকে রাত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল, এর মধ্যে হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করে ফেলেছিলেন। সেদিন যদি আল্লাহ্ পাকের অপার করুণা তাঁকে আচ্ছাদিত করে না নিতো,

তা' হলে এটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সীমাহীন দুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত মেহেরবানী করে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

বস্তুতঃ 'আমানত' শব্দটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে 'ঈমান'। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রদত্ত আমানতের হিফাযত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমানের হিফাযত করবেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔

'আমানত ও সংরক্ষণ গুণ যার নাই, তার ঈমানও নাই। অনুরূপ যে ওয়াদা পূরণ করতে জানে না, সে দ্বীনশূন্য।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلٰى كُلِّ خُلُقٍ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ ـ

'প্রকৃত মু'মিন কখনও খেয়ানতকারী ও মিথ্যুক হতে পারে না।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত আমানতের মালকে গণীমতের মালের মত হালাল এবং দান-খয়রাত করাকে জরিমানা বা অর্থদণ্ড মনে না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করবে।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ

'লোকের আমানত সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দাও ; এমনকি তোমার সাথে যে খেয়ানত করেছে, তার আমানত পৌঁছাতেও কুণ্ঠিত হয়ো না।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের অলামত তিনটি, মিথ্যা বলা, ওয়াদা বরখেলাফ করা এবং আমানতে খেয়ানত করা।'

অর্থাৎ,—আমানত স্বরূপ তাকে কোন কথা বললে লোকদের মধ্যে সে তা' প্রচার করে খেয়ানতে লিপ্ত হয়, তার কাছে কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখলে পরবর্তী সময় সে তা' অস্বীকার করে ; অথবা সে গচ্ছিত মালের হিফাযত করে না কিংবা মালিকের অনুমতি ছাড়া সে তা' ব্যবহার করে। এজন্যে আমানতের হিফাযত করা মূলতঃ নৈকট্য-প্রাপ্ত ফেরেশ্তা, আম্বিয়ায়ে কেরাম, আল্লাহ্র নেক ও পরহেযগার বান্দাগণের অভ্যাস তথা এ অভ্যাসে যারা অভ্যাসী, তারাই প্রকৃত নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ আ'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' (নিসা ঃ ৫৮)

মুফাস্সিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের বহু মুলনীতি এ আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানগণ ছাড়াও বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারে। সুতরাং শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে,—মজলুম ও নিপীড়িতদের সাথে ন্যায়-পরায়নতা এবং সর্বদা হক ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা, এটাও আমানত। সেইসঙ্গে মুসলমানদের ধন-সম্পদের হিফাযত করা এবং এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণ করাও শাসকের দায়িত্ব। অনুরূপ, উলামায়ে কেরামের আমানত ও দায়িত্ব হচ্ছে,—সর্বসাধারণকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেওয়া, যে দ্বীনের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উলামায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। এমনিভাবে পিতার কর্তব্য ও আমানত হচ্ছে,—সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করা, আখ্লাক ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনি তালীম দেওয়া।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

'তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধীনস্তের জিম্মাদার এবং এ সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেকেরই জবাবদেহী করতে হবে।'

যাহ্‌রুর-রিয়াদ কিতাবে আছে,—কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির করা হবে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 'তুমি কি অমুক ব্যক্তির আমানত ফেরৎ দিয়েছিলে?' সে বলবে,— 'পরওয়ারদিগার! আমি তা' ফেরৎ দেই নাই।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশ্‌তাকে হুকুম করবেন ; সে ওই ব্যক্তিকে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাকে সেই আমানত চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করাবে। অতঃপর জাহান্নামে তাকে নিক্ষেপ করার পর সত্তর বৎসর পর্যন্ত সে জাহান্নামের তলদেশের দিকে যেতে থাকবে। এভাবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে পৌঁছবে। তারপর সে আমানতের বস্তুটি নিয়ে উপরের দিকে ধাবমান হবে। এভাবে জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছার পর তার পা পিছ্‌লিয়ে যাবে এবং পুনরায় জাহান্নামে পড়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় উপরে উঠবে এবং পিছলিয়ে জাহান্নামের নিম্ন গহ্বরে পৌঁছবে। এভাবে বারবার তার এ অবস্থাই হতে থাকবে। সর্বশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আতের ওসীলায় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমানতের হকদার ব্যক্তি তার প্রতি রাজী হয়ে যাবে।

হযরত সালমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ জানাযার নামাযের জন্য হাজির করা হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই মৃত ব্যক্তির উপর কি কারও কোন করজ পাওনা আছে?' লোকেরা বললো,—'না' । অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তির জানাযা হাজির করা হলে তিনি পূর্বের ন্যায় জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো,—'হাঁ, এ ব্যক্তির উপর অন্যদের পাওনা আছে।' হুযুর (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন,—'মৃত্যুর পূর্বে সে কি কোন মাল–

সম্পদ রেখে গেছে?' লোকেরা বললো,—'না'। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন ঃ 'এ ব্যক্তির জানাযা তোমরা পড়ে নাও।'

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলো,—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় এখ্লাস ও ধৈর্য সহকারে জিহাদ করতে থাকি এবং কাফির-মুশরিকদের ভয়ে পলায়ন না করে বরং তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে লড়তে থাকি—এ অবস্থায় যদি আমি নিহত হই, তা' হলে কি আল্লাহ্ তা'আলা আমার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'হাঁ'। একথা শুনে লোকটি প্রস্থান করলে পর পুনরায় তাকে ডেকে বলে দিলেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ; কিন্তু অন্যের প্রাপ্য করজ কখনও মাফ করা হবে না।'

অধ্যায় ঃ ১৪

খুশু-খুজু ও নামাযের পূর্ণাঙ্গতা

বিনম্র আত্মসমর্পণ ও একাগ্রতার মাধ্যমে নামাযকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার নাম খুশু-খুজু। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।' (মুমিনূন ঃ ১,২)

আয়াতে উল্লেখিত 'খুশু'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন,—'এটা আত্মার সাথে সম্পর্কিত আমল। যেমন ভয় ও শঙ্কা'র সম্পর্ক আত্মার সাথে, তেমনি খুশু'ও একটি আত্মিক আমল। আবার কেউ কেউ খুশু'কে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যুক্ত করে এটাকে বাহ্যিক আমল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন,—শারীরিক স্থিরতা-ধীরতা, এদিক-সেদিক দৃষ্টি না করা, অহেতুক অঙ্গ সঞ্চালন থেকে বিরত থাকা ; নামাযের ভিতর এগুলো বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অনুরূপ, আরও কেউ কেউ বলেছেন, নামাযের জন্য খুশু'র প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, অর্থাৎ এটা একান্ত ফরয পর্যায়ের বিষয়। অপরদিকে কেউ কেউ খুশু'কে নামাযের জন্য ফযীলত ও মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন। ফরয আখ্যাদানকারীগণ দলীল হিসাবে যে হাদীসখানি পেশ করে থাকেন, তা' হচ্ছে,—

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلٰوتِهٖ اِلَّا مَا عَقَلَ ـ

'নামাযের যতটুকু অংশ বান্দা উপলব্ধি করে আদায় করে, ততটুকু অংশই তার কবূল করা হয়।'

অনুরূপ এ আয়াতটিও উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

'এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।' (তোয়াহা ঃ ১৪)

আল্লাহ্র যিক্র করতে হলে যেহেতু গাফলতি ও অবহেলা পরিহার করতে হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

'এবং গাফেলদের দলভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) মুহাম্মদ ইব্নে সীরীন (রহঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখতেন, তাই এ আয়াতে তা' নিষেধ করা হয়েছে। মুসনাদে আবদুর রায্যাকের সূত্রে অতিরিক্ত এ অংশটুকুও রয়েছে,—'অতঃপর তাঁকে নামাযে 'খুশু' অবলম্বন করার হুকুম করা হয়েছে। সেজন্যে তিনি নামাযে দৃষ্টিকে সিজদা'র স্থানে নিবদ্ধ করে রাখতেন।'

হাকেম ও বায়হাক্বী হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন,— হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে দৃষ্টিকে আকাশপানে উঁচু করার প্রেক্ষিতে আয়াতখানি নাযিল হয় ; তারপর থেকে তিনি দৃষ্টি নীচু করে নিয়েছেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারো বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানি থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তা' হলে তার শরীরে কি সামান্যতম ময়লাও বাকী থাকবে?'

অর্থাৎ,—নামায আদায়ের দ্বারা মানুষ পাপের পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় ; কবীরা গুনাহ্ ব্যতীত সর্বপ্রকার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। নামাযের এ মর্যাদা হাসিল করতে হলে বিনম্র আত্মসমর্পণ ও নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে হবে। নামাযে অন্তরকে হাজির রাখতে হবে। অন্যথায় এই নামায—নামায পাঠকারীর মুখে নিক্ষেপ করা হবে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا

بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা–ধান্দা হতে মুক্ত ও পবিত্র অন্তর নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,—'নামায, হজ্জ, তওয়াফ এবং হজ্জের অন্যান্য বিধানাবলী ইত্যাদি ইবাদত এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা হবে ; কিন্তু এগুলো পালন করতে সময় যে মহান সত্তাকে স্মরণ করা উদ্দেশ্য, যদি তাঁকে স্মরণ না করা হয়, তা' হলে এই যিক্র ও ইবাদত অর্থহীন বস্তুতে পর্যবসিত হয়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا ـ

'যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কার্য হতে বিরত রাখতে পারলো না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য হতে ক্রমেই সরে যাচ্ছে।'

হযরত আবু বকর ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'তুমি যদি বিনা অনুমতিতে এবং কোন দু'ভাষী ছাড়াই তোমার মাওলার কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা' হলে যেতে পারো।' জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন,—'সুন্দরভাবে পরিপূর্ণরূপে উযূ করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যাও ; এভাবে তুমি অনুমতি ছাড়াই মাওলার দরবারে প্রবেশ করলে, অতঃপর (নামাযের ক্বিরাআত ও যিক্র–তসবীহের মাধ্যমে) দু'ভাষী ছাড়া কথা বল।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—'অনেক সময় এমন হতো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছেন

এবং আমরাও তাঁর সাথে কথাবার্তায় মগ্ন রয়েছি ; ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন হুযূরের অবস্থা এমন হতো, যেন তিনি আমাদেরকে চিনেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনি না ; আল্লাহ্ তা'আলার আজমত ও প্রতাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো।' হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর বান্দার শরীর যেমন উপস্থিত থাকে, তার অন্তরও যদি অনুরূপ উপস্থিত না থাকে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নামাযের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করেন না।'

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর ভয়ে এতই কম্পমান হতেন যে, দূর থেকে তাঁর হৃদপিণ্ডের কম্পন শোনা যেতো। হযরত সাঈদ তানুখী (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন অবারিত অশ্রু তাঁর গণ্ডদেশ প্রবাহিত হয়ে শ্মশ্রুতে পৌঁছতো।

একদা এক ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায রত অবস্থায় দাঁড়ি সঞ্চালন করতে দেখে বলেছেন,—'যদি এ ব্যক্তির অন্তরে খুশু ও একাগ্রতা থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও স্থির থাকতো।'

বর্ণিত আছে,—হযরত আলী (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তিনি ভয়ে কম্পমান হতেন এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতো। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো,—'হে আমীরুল–মুমেনীন! নামাযে আপনার এ অবস্থা হয় কেন?' তিনি বলেছেন ঃ 'তখন আল্লাহ্ তা'আলার সেই আমানত আদায়ের সময় এসে যায়, যে আমানত বহন করতে আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহ অস্বীকার করেছে ; অথচ আমি তা' বহন করেছি।' হযরত আলী ইব্‌নে হুসাইন সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি যখন উযূ করতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,—'তোমরা কি জাননা যে, এরপর আমি কার দরবারে দণ্ডায়মান হবো?'

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ)–কে তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন ঃ 'যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি পরিপূর্ণরূপে উযূ সম্পন্ন করি। অতঃপর জায়নামাযে এসে কিছুক্ষণ স্থির–ধীরভাবে অপেক্ষা

করি। এভাবে সম্পূর্ণ শান্ত হওয়ার পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হই। তখন আমার অবস্থা এই হয় যে, অন্তরে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ধ্যান করি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ আমার সম্মুখে, পুলসিরাত আমার নীচে, বেহেশ্‌ত আমার ডান পার্শ্বে, দোযখ আমার বামে এবং মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আযরাঈল আমার পিছনে। সেইসঙ্গে আমি এ কথাও অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ করে নেই যে, এ নামাযই আমার জীবনের শেষ নামায, এর পরেই আমার মৃত্যু। অতঃপর আর নামাযের সুযোগ হবে না। এই ধ্যানমগ্নতা সহকারে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্তরে থেকে নেহায়েত একাগ্রতার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করি। অতঃপর অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধীর-স্থিরভাবে কিরাআত পড়ি। রুকূ' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করি। সিজদায় পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা অবলম্বন করি। বাম নিতম্বে উপবেশন করি, বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রেখে অঙ্গুলি কেবলার দিকে ফিরিয়ে রাখি এবং অন্তরে পরিপূর্ণ এখ্‌লাস ও আল্লাহ্‌র ভয় জাগরুক রাখি। এরপরেও আমি বলতে পারি না যে, আমার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে কিনা?'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—'আন্তরিক নিষ্ঠা ও ধ্যান সহকারে উপলব্ধি করে দুই রাকাত নামায পড়া গাফেল ও অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চাইতে উত্তম।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আখেরী যমানায় আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে, যারা মসজিদে উপস্থিত হবে ; কিন্তু সেখানে মজলিস অনুষ্ঠান করে তারা দুনিয়াবী আলোচনায় লিপ্ত হবে ; অন্তরে তাদের থাকবে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার! এসব লোকের সংস্পর্শে যেয়ো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।' হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, দুনিয়াতে নিকৃষ্টতম চোর কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমাদেরকে এ কথা বলে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।' সাহাবীগণ আরজ করলেন, নামাযে চুরি করা হয় কিভাবে?

আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ 'রুকু' ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় না করাই নামাযে চুরি করা।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায পরিত্যাগকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি কেউ পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করে থাকে তা' হলে তার অন্যান্য বিষয়ের হিসাব সহজ করা হবে। আর যদি ফরয নামাযে কোন ক্রটি থাকে, তা' হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, দেখ,—আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা ; সেগুলো দিয়ে তার ফরয নামাযের ক্রটি মুছে দাও।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হচ্ছে, দুই রাকাত নামাযের তওফীক হওয়া।' হযরত উমর (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর পাঁজর কাঁপতে থাকতো এবং উপর ও নীচের দাঁতগুলো পরস্পর শব্দিত হতে থাকতো। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, 'আল্লাহ্‌র আমানত আদায় করার সময় এসে গেছে, জানিনা এই আমানত আমি কিভাবে আদায় করবো।'

খলফ ইব্‌নে আইয়ুব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—একদা তিনি নামায আরম্ভ করার পর তাঁকে ভীমরুল দংশন করেছিল। ফলে, দংশিত স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয় ; কিন্তু তিনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই। অবশেষে ইব্‌নে সাঈদ এসে তাঁকে জানালে তিনি কাপড় ধৌত করে নেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আপনাকে ভীমরুল দংশন করছিল এবং রক্তও প্রবাহিত হচ্ছিল ; অথচ আপনি তা' মোটেও অনুভব করতে পারেন নাই, এর কারণ কি? তিনি বলেছেন,—'যে ব্যক্তি মহা পরাক্রমশালী সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, পিছনে যার মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা বিরাজমান থাকে, বামে থাকে যার দোযখ আর ডানে থাকে বেহেশ্‌ত এবং পা থাকে পুলসিরাতের উপর, সে-কি এসব বিষয় কখনও অনুভব করতে পারে?'

হযরত ইব্‌নে যর (রহঃ)-এর হাতে ফোঁড়া হয়েছিল। আধ্যাত্ম জগতে তিনি ছিলেন অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। চিকিৎসকগণ বলেছিল,—'এই মারাত্মক ফোঁড়া হতে নিস্কৃতি পেতে হলে আপনার হাত কেটে ফেলে দিতে হবে। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। চিকিৎসকগণ বলেছে—'তা' হলে আপনাকে

দড়ি দিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে নিতে হবে, নতুবা আপনি অসহনীয় কষ্টে ছুটাছুটি করবেন এবং এতে মারাত্মক ক্ষতি হবে।' তিনি বলেছেন,—না, এসব কিছুর প্রয়োজন নাই ; আমি যখন নামায আরম্ভ করি, তখন তোমরা আমার হাত কেটে নিও।' অতঃপর নামাযরত অবস্থায় তাঁর হাত কাটা হয়েছে এবং তিনি তা' মোটেও অনুভব করেন নাই।

অধ্যায় ঃ ১৫

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উপর যে ব্যক্তি একবার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির নিঃশ্বাস হতে একটি বাদল (মেঘ) সৃষ্টি করেন এবং তাকে বর্ষণ করতে হুকুম করেন। বর্ষণের পর মাটির উপর পতিত প্রতিটি পানিবিন্দু হতে রূপা সৃষ্টি করেন এবং যেসব বিন্দু কাফের লোকদের উপর পতিত হয়, তাদের ঈমান নসীব হয়।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

হযরত কাল্‌বী (রহঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র কতিপয় বিষয়েই নয়; বরং সর্বদিক থেকেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত। আর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য এ উম্মতের লোকজন পারস্পরিক তুলনায় একজনের চাইতে অপরজন অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পরবর্তীকালের তাবেয়ীগণের তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠ।

আয়াতে উল্লেখিত اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -এর অর্থ হচ্ছে,—এ উম্মত সমগ্র মানব জাতির হিত কামনা ও কল্যাণ সাধনের জন্যে মনোনীত হয়েছে এবং এটাই এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

'তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং এই উম্মত যদি 'সৎকাজে উপদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করা' পরিত্যাগ করে, তা'হলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী গোটা মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গলকামনার ফলশ্রুতিতেই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত। কারণ, তারা মানবকে সৎকাজে উপদেশ দিবে, উৎসাহিত করবে, মন্দ ও গর্হিত কার্যাবলী হতে নিষেধ করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। যাতে গোটা মানবগোষ্ঠী শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতের দ্বারা অপরের কল্যাণ সাধিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَّضُرُّ النَّاسَ ـ

'শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছে, যে অপরের উপকার সাধন করে। আর নিকৃষ্টতম হচ্ছে, যে অপরের ক্ষতি করে।'

আয়াতে উল্লেখিত تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'তওহীদ' ও একত্বে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় ও অবিচল। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে-প্রাণে স্বীকার কর যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে, সে মূলতঃ আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান রাখে না। কেননা নুবুওয়াতকে অস্বীকার করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত সকল মুজিযা তাঁর নিজস্ব ; তাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত কিছু নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَّاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন্দকাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা চাই। এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দিবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে ; এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেছেন যে, 'শক্তি ও ক্ষমতাবলে অসৎকাজে প্রতিরোধ করা শাসকবর্গের দায়িত্ব। কথা ও উপদেশের মাধ্যমে প্রতিরোধের দায়িত্ব আলেমগণের। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা সাধারণ লোকের কর্তব্য।' আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, 'যার যেভাবে ক্ষমতা ও সুযোগ হবে, সেভাবেই সে গর্হিত কাজে নিষেধ ও প্রতিরোধ করবে,—এটাই তার কর্তব্য।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص

'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।' (মায়িদাহ ঃ ২)

কাউকে কোন সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করা, কল্যাণকর কোন পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া, জুলুম-অত্যাচার ও গর্হিত কার্যে সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা, এসব বিষয় মানবের কল্যাণকামিতা ও সাহায্য-সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বেদ'আতীকে ভীতি প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর শান্তি ও ঈমানের দ্বারা ভরে দিবেন, যে ব্যক্তি বেদ'আতীকে অবজ্ঞা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাপদে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করবে, সে ইহজগতে

আল্লাহ্ তা'আলার এবং তাঁর কিতাব ও রাসূলের খলীফা তথা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হবে।' হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'এই উম্মতের (অধঃপতনের) এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের কাছে একটি মৃত গাধা 'অসৎ কাজে নিষেধ করা'র চাইতেও অধিক পছন্দনীয় হবে।'

একদা হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে নেক কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে, তার প্রতিদান কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—'আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক বৎসরের ইবাদতের সওয়াব দিবো এবং এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।'

হাদীসে কুদসীতে আছে,—'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তওবা করতে বিলম্ব করে, দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আমলবিহীন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, পুণ্যবান লোকের ন্যায় কথা বলে ; অথচ তার আমল হয় মুনাফিকের মত। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলেও তুষ্ট হয় না এবং মনের আশা অপূর্ণ থাকলে ছবরও করে না। পুণ্যবান লোকদের প্রতি আসক্ত হয় ; অথচ সে নিজে পুণ্যবান নয়। মুনাফিকদেরকে ঘৃণা করে ; অথচ সে নিজে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নেক কাজে উপদেশ দেয় না এবং সে নিজেও নেক কাজ করে না। অসৎ কাজে প্রতিরোধ করে না এবং সে নিজেও অসৎ কাজ হতে বিরত হয় না।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শেষ যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং আকল-বুদ্ধিও হবে কম। তারা কথা বলবে চমৎকার ও আকর্ষণীয় ; কিন্তু তাদের অন্তরে সেগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া বা তদনুযায়ী আমল বলতে কিছু থাকবে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার হতে বের হয়ে যায়।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোক দেখেছি, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা?' তিনি

বললেন : এরা আপনার উম্মতের খতীব বা ওয়াজ-নসীহতকারী লোক, অন্যদেরকে তারা ভাল কাজের আদেশ-উপদেশ করতো ; অথচ নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করতো না। যেমন কুরআন পাকে এহেন লোকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও ; অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না।' (বাক্বারাহ : ৪৪)

অর্থাৎ,—তোমরা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত কর ; অথচ সেই কালামের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করো না। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, দান-খয়রাতের জন্য তারা অন্যকে উপদেশ দিতো ; কিন্তু নিজেরা দান-খয়রাত করতো না। অতএব, ঈমানদার ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সৎকাজে উপদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার সাথে সাথে নিজের ব্যাপারে বিস্মৃত না হওয়া তথা নিজেও আমল ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (তওবা : ৭১)

উক্ত আয়াতে মু'মিন ব্যক্তিদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের উপদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকাজের উপদেশ প্রদানকার্য পরিহার করবে, সে আয়াতে উল্লেখিত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা ওইসব লোকের দোষ ও অপযশ বর্ণনা করেছেন, যারা

নেক কাজের হুকুম পরিহার করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

'তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করতো না, যা তারা করতো। তারা যা করতো তা' অবশ্যই মন্দ ছিল।' (মায়িদাহ ঃ ৭৯)

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেছেন,—'তোমরা সৎকাজে আদেশ কর। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর জালেম বাদশাহ্র আধিপত্য স্থাপন করে দিবেন, যে তোমাদের বড়দের কোন পরওয়া করবে না এবং ছোটদের প্রতি দয়াশীল হবে না। তোমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকগণ আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে ; কিন্তু তা' কবূল হবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্বকালে) এমন একটি জনপদের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। তারা প্রত্যেকেই এতো পুণ্যবান ছিল যে, আমল ও ইবাদতে নবী–রাসূলদের সমতুল্য ছিল।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ 'এর কারণ হচ্ছে, তারা লোকদেরকে না–ফরমানীর কাজে লিপ্ত দেখে রাগান্বিত হতো না, নেক কাজের হুকুম করতো না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতো না।'

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন,—'একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক জিহাদ ; কিন্তু এছাড়াও কি কোন প্রকার জিহাদ আছে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'অবশ্যই আছে ; হে আবূ বকর! আল্লাহ্র যমীনে এমনও জিহাদকারী লোক রয়েছে, যারা শহীদগণের চাইতেও উত্তম ; অথচ শহীদগণের ফযীলত হচ্ছে,—তাঁরা আল্লাহ্র কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত, তাঁরা যমীনে বিচরণ করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণের সম্মুখে গৌরব করেন, তাদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয় যেমন উম্মে সালামাহ আল্লাহ্র রাসূলের জন্য সজ্জিতা হয়ে থাকেন।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! শহীদগণের চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী মুজাহেদীন যারা, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, 'তাঁরা হচ্ছে সৎকাজের উপদেশদাতা, অসৎ কাজে প্রতিরোধকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালবাসা স্থাপনকারী এবং তাঁরই সন্তুষ্টিবিধানে শত্রুতাপোষণকারী লোকগণ।' অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল আরও বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আখেরাতে এমন হবে যে, বান্দা সর্বোচ্চ কোঠরীতে অবস্থান করবে, এই কোঠরীর নীচে আরও অনেক কোঠরী থাকবে। এগুলো শহীদগণের কোঠরীর তুলনায় অধিক উন্নত ও মূল্যবান হবে। তাদের প্রতিটি কামরায় মহামূল্য পাথর ইয়াকূত ও জমরদ খচিত তিনশত দরজা হবে। প্রতিটি দরজায় অতি উজ্জ্বল নূরের ব্যবস্থা থাকবে। এই বান্দা ডাগর চোখবিশিষ্ট নত নয়না তিন লক্ষ বেহেশতী হূরকে বিবাহ করবে। এদের কারও প্রতি সেই বান্দা যখন তাকাবে, তখন হূর তরুণী বলবে,—'আপনি অমুক অমুক দিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলেন।' এভাবে সে যে কোন হূরের প্রতি যখন দৃষ্টি করবে, তখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কথা উল্লেখ করে এর বিনিময়ে তাকে দেওয়া বিভিন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও পুরস্কারের বিষয় বলতে থাকবে।

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার জন্য কোন আমল করেছো?' তিনি বললেন,—'হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করেছি, তোমরা প্রশংসা করেছি, তোমার কিতাব তিলাওয়াত করেছি, যিকর করেছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! নামায তোমার জন্য দলীলস্বরূপ, রোযার বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে, দান-খয়রাত তোমার জন্য ছায়ার কাজ দিবে, তসবীহ তোমার জন্য জান্নাতে বৃক্ষস্বরূপ হবে, আমার কিতাব তিলাওয়াতের প্রতিদানে তুমি জান্নাতে হূর ও উন্নত বালাখানা লাভ করবে, যিকর তোমার নূর হবে ; কিন্তু খালেস আমার জন্য তুমি কি করেছো? তা' বল।' হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছেন,—'হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে কোন আমলের কথা বলে দিন, যা আমি খালেসভাবে আপনার জন্য করবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি আমার খাতিরে

আমার কোন ওলী (দোস্ত)–কে ভালবেসেছো? অথবা আমার খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করেছো?' একথা শুনার পর হযরত মূসা (আঃ) বুঝে গেছেন যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁরই খাতিরে কাউকে শত্রু জ্ঞান করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হযরত আবু উবাইদাহ্ ইব্‌নে জাররাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করেছি ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ কে?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসককে সৎকাজের উপদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করে ফেলে। যদি হত্যা না-করে, তা'হলেও সে তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে ; যতদিন সে দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সে, যে জালেম বাদশাহ্‌কে সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর সেই জালেম তাকে হত্যা করে ফেলে। এই শহীদ ব্যক্তির স্থান জান্নাতে হযরত হাম্‌যাহ্ ও জা'ফর (রাযিঃ)–এর মাঝখানে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউশা' ইব্‌নে নূন আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন যে, 'আমি তোমার উম্মতের চল্লিশ হাজার সৎ এবং ষাট হাজার অসৎ লোককে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছি।' হযরত ইউশা' (আঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ্। এই অসৎ লোকজন তো অবশ্যই ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত ; কিন্তু সৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমার ক্রোধের কারণ হয় এমন কাজ কাউকে করতে দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয় না এবং এহেন লোকদের সাথে তারা একত্রে পানাহার করে। তাই আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—'একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম ঃ 'আমরা কি কোন সৎকাজে উপদেশ দিতে ওই পর্যন্ত বিরত থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা পূর্বে আমল করতে না পারি? এবং অনুরূপ কি আমরা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে বিরত থাকবো, যতদিন পর্যন্ত নিজেরা বিরত হতে না পারি?' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তোমরা সৎকাজের হুকুম

করতে থাক, যদিও তোমরা সে অনুযায়ী পূর্ণভাবে আমল করতে পার নাই। অনুরূপ তোমরা অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক, যদিও তা থেকে তোমরা বিরত হতে পার নাই।

জনৈক বুযুর্গ আপন পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'যদি কেউ নেক কাজের উপদেশ দিতে চায়, তা' হলে সর্বপ্রথম তাকে ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে এর সওয়াব ও প্রতিদানের দৃঢ় ইয়াকীন রাখতে হবে। তা' হলে লোকজনের দুর্ব্যবহারে সে কখনও ব্যথিত হবে না।'

অধ্যায় ঃ ১৬
শয়তানের শত্রুতা

প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হচ্ছে,—আলেম-উলামা এবং পুণ্যবান লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করা এবং সর্বদা তাদের সাহচর্যে উঠাবসা করা। তাদের কাছ থেকে দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করা, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। গর্হিত ও অসৎকর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকা এবং শয়তানকে শত্রু জ্ঞান করা। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'শয়তান তোমাদের শত্রু ; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।' (ফাতির ঃ ৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগীর মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা কর এবং শয়তানের অবাধ্যতা ও না-ফরমানী করে তাকে দমিত ও পরাজিত কর। প্রতি কাজে ও প্রতি ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা করতে থাক। সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসে শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক থাক। যখনই কোন কাজ কর, তখন এ ব্যাপারে সচেতন থেকো যে, এতে শয়তানী প্রতারণার কোন দিক এসে যাচ্ছে কিনা? কেননা শয়তান কখনও ইবাদতে রিয়া প্রবেশ করিয়ে দেয়, আবার কখনও পাপকর্মকে সুন্দর ও নেক কাজের আকৃতি দিয়ে পেশ করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর একটি রেখা টেনে বললেন, 'এটা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথ'। অতঃপর ডানে-বামে আরও কতকগুলো রেখা আঁকলেন এবং বললেন যে, এগুলোও পথ ; কিন্তু এর

প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির দিকে) আহ্বান করছে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۝

'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা' হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।' (আন'আম ঃ ১৫৩)

উক্ত হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণার বিভিন্ন পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন পাদ্রী ছিল। একদা ইবলীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি করলো যে, এক বাড়ীতে এসে একটি মেয়ের গলা টিপে ধরলো। তাতে সে মেয়েটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিল যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীর চিকিৎসা-তদবীর আছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট এসে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী তাকে নিজের হেফাযতে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং তাকে তার হেফাযতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসাহ্ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি উত্তর দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তোমাকেই দায়ী করবে এবং এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে

পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। অভিভাবকরা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়ের খোঁজ নিল। পাদ্রী বললো, সে মারা গেছে। একথা শুনে তারা এতটুকু বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শূলিতে নিয়ে গেল। তখন শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো,—তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়ের গলা টিপে ধরেছিলাম, মেয়ের অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসাহ্ দিয়েছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা' হলে আমার কথা শুন। পাদ্রী বললো,—কি কথা? শয়তান বললো,—খুবই সহজ, তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ -

'তারা শয়তানের মত ; মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।' (হাশ্র ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) –কে প্রশ্ন করেছিল,—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্ত দিবেন নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তাঁর ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন? ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটু চিন্তা করে বললেন ঃ 'সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর অভিপ্রায় অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে অবশ্যই এটা জুলুম হবে, আর যদি

তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জ্জি অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তা' হলে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।' এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পালালো এবং বলতে থাকলো,—'হে শাফেঈ! আমি এই একটিমাত্র প্রশ্নের দ্বারা সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোমরাহ্ করেছি এবং উবুদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।

হে সাধক! এ কথা স্মরণ রেখো যে, তোমার অন্তর হচ্ছে দুর্গস্বরূপ আর শয়তান হচ্ছে তোমার দুশমন। শয়তান সর্বদা এই চেষ্টায় নিরত থাকে যে, কি করে সে অন্তররূপ দুর্গে প্রবেশ করে সেটাকে নিজের দখলে আনতে পারে। বস্তুতঃ দুর্গের হিফাযতের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে দুর্গের দরজাসমূহ সংরক্ষিত করা। এজন্যে আগেই তোমাকে দুর্গের সংরক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। তা' না' হলে শত্রুর আক্রমণ ও ক্ষতিসাধন থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং অন্তররূপ দুর্গকে বনী আদমের চিরশত্রু শয়তানের আক্রমণ ও কুমন্ত্রণা থেকে হিফাযত করা যেমন ফরয, তেমনি এই প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও অবগত হওয়া ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে জ্ঞান ও ইল্‌মের উপর কোন ফরয আমল নির্ভর করে, সেই জ্ঞান ও ইল্‌ম হাসিল করাও ফরয হিসাবে পরিগণিত হয়। সুতরাং শয়তানের ধোকা ও প্রতারণার চক্রজাল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল না হলে যেহেতু আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না,—যা মূলতঃ ফরয—সেজন্যে শয়তানের ধোকা ও কুমন্ত্রণার প্রক্রিয়া-প্রণালী সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা বান্দার উপর ফরয।

আদম সন্তানকে প্রতারিত করার জন্য চিরশত্রু শয়তান বহুবিধ প্রক্রিয়া-প্রণালী অবলম্বন করে থাকে। ওয়াস্‌ওয়াসা ও কুমন্ত্রণার বিভিন্ন দরজাপথে সে মানবের হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করার নিমিত্ত সদাব্যস্ত ও সচেষ্ট থাকে। বস্তুতঃ এগুলো মানবের মধ্যকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তিসমূহেরই নামান্তর। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক,—ক্রোধ ও কামাসক্তি। বস্তুতঃ ক্রোধ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। আর এই জ্ঞান-বুদ্ধির দুর্বলতা ও হ্রাসপ্রাপ্তির মুহূর্তেই শয়তান

মানুষের উপর হামলা করার সুযোগ পায়। এ সময় শয়তান মানুষকে খেলার বস্তুতে পরিণত করে এবং ফুটবলের মত তাকে ব্যবহার করে, যেমন শিশু-কিশোররা এ দিয়ে ইচ্ছামত খেলা করে থাকে। বর্ণিত আছে,—একদা জনৈক বুযুর্গ শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—তুমি বনী আদমকে কিভাবে পরাজিত কর? শয়তান বলেছে, আমি তাদেরকে গোস্সা ও কামাসক্তির সময়গুলোতে হামলা করে থাকি।

দুই,—হিংসা ও লোভ-লালসা। এ দুই প্রবৃত্তির কারণে মানুষ জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায় এবং কান থাকতেও বধিরে পরিণত হয়, হক ও প্রকৃত কর্তব্যের অনুভূতি সে পূর্ণতঃ হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে শয়তান তখন তার উপর উত্তমরূপে সওয়ার হয়ে বসে। এভাবে ক্রমান্বয়ে শয়তান তার অন্তরে কামভাবের সৃষ্টি করে, তখন সে চরম ঘৃণ্য ও লজ্জাকর কর্মেও লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে কিশ্তীতে সওয়ার হলেন এবং জীব-জন্তুর এক এক জোড়া সাথে উঠিয়ে নিলেন, তখন নৌকাতে একজন বৃদ্ধলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে চিন্তে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমাকে এই কিশ্তীতে উঠার কে অনুমতি দিয়েছে?' বৃদ্ধ বললো,—আমি এজন্যে আরোহন করেছি, যাতে আপনার আহ্বানে সাড়া দানকারী ঈমানদার লোকদের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমি তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে পারি, ফলে তাদের অন্তর থাকবে আমার সাথে এবং আপনার সাথে থাকবে শুধু তাদের বাহ্যিক দেহাবয়ব। হযরত নূহ্ (আঃ) বললেন,—'হে অভিশপ্ত ইবলীস! খোদার দুশমন! তুই এখান থেকে বের হয়ে যা।' এ সময় ইবলীস যে কথাটি বলেছিল তা' হচ্ছে,—'হে নূহ্! আমি পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করে থাকি।' আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালামকে ওহী পাঠালেন ঃ 'হে নূহ্! তুমি তাকে শুধু দু'টি বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর, অপর তিনটি বিষয় তোমার জানার প্রয়োজন নাই।' হযরত নূহ্ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—সেই দু'টি বিষয় এমন, যা আমি ব্যক্ত করার পর আপনি আমার কথার বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য

হবেন ; কিন্তু সেজন্যে আমাকে যেন আপনি বঞ্চিত করে পশ্চাতে ফেলে না রাখুন। বিষয় দু'টি হচ্ছে,—লোভ–লালসা ও হিংসা–বিদ্বেষ। 'বস্তুতঃ এই হিংসার তাড়নায় আমি নিজে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছি। আর লোভ–লালসা সেই ব্যাধি যা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে বেহেশ্‌তে নিষিদ্ধ ফল খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর থেকে আমি বনী আদমকে শিকার করার জন্য লোভ–লালসার হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকি।

তিন,—উদরপূর্তি করে খাওয়া। সম্পূর্ণ হালাল ও পাক–পবিত্র খাদ্যদ্রব্যও অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করলে কামপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে। এটাকেও শয়তান হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, একদা অভিশপ্ত ইবলীস হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে হাজির হলে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইবলীসের সর্বশরীরে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ প্রচুর পাত্র দেখা যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—এ পাত্রগুলো কিসের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে? ইবলীস বললো, 'এগুলো কামপ্রবৃত্তি ও খাহেশাত দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছি, বনী আদমকে আমি এগুলোর সাহায্যে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্‌য়া জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাকে শিকার করার জন্যেও কি এতে কোন ফাঁদ আছে? সে বললো,—জী–হাঁ, কখনও কখনও আপনি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে থাকেন, তখন আমি আপনাকে নামায ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফেল করে দিই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—আরও কিছু আছে? শয়তান বললো,—আর কিছু নাই। অতঃপর হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্ সালাম বললেন,—আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আর কোনদিন আমি উদরপূর্তি করে খাবো না। ইবলীস বললো,—আজ থেকে আমিও দৃঢ় সংকল্প করছি যে, কোনও দিন আমি কোনও মুসলমানকে সদুপদেশ দিবো না।'

চার,—বাড়ী–ঘর, পোষাক–পরিচ্ছদ, দ্রব্য–সামগ্রী ও গৃহ–উপকরণে সাজ–সজ্জা ও চাকচিক্যের অভিলাষী হওয়া। শয়তান যখন কারও অন্তরে এসব অহেতুক বিষয়ের প্রবলতা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে তার উপরে উত্তমরূপে চেপে বসে এবং সর্বদা তাকে গৃহ নির্মাণ, গৃহের ছাদ ও দেওয়াল মেরামত, বাড়ী প্রশস্তকরণ এবং এগুলোর সাজ–সজ্জা ও চাকচিক্যের মধ্যে ব্যাপৃত

করে রাখে। কিভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় কেবল এহেন চিন্তায় তাকে উন্মত্ত করে রাখে। তার অন্তঃকরণে এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার আয়ু অনেক দীর্ঘ, বহুকাল তুমি দুনিয়াতে বাঁচবে। এসব ধোকা ও প্রতারণার জালে তাকে আবদ্ধ করার পর শয়তান তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, পুনঃ পুনঃ তার কাছে এসে তাকে প্রতারিত করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। ফলে, অনেকেই এহেন জঘন্য অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের আখেরাত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঁচ,—আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশা না করে গায়রুল্লাহ্ তথা মানুষের কাছে আশা করা এবং তাদের সাহায্য ও সম্পদের উপর ভরসা করা। হযরত ছফওয়ান ইব্‌নে সুলাইমান (রহঃ) বলেন,—একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হানযালা (রাযিঃ)-এর নিকট অভিশপ্ত ইবলীস উপস্থিত হয়ে বলেছিল ঃ 'হে ইব্‌নে হানযালা! আমি আপনাকে একটি তত্ত্বকথা শিক্ষা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে তা' শ্রবণ করুন এবং স্মরণ রাখুন।' তিনি বললেন,—আমার সেকথা জানার কোন প্রয়োজন নাই। ইবলীস বললো,—আপনি প্রথমে শুনে নিন, তারপর যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে গ্রহণ করবেন, নতুবা প্রত্যাখ্যান করবেন—'হে ইব্‌নে হানযালা! একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সমুদয় বিষয়ে আশা করুন এবং তাঁরই নিকট সবকিছুর প্রার্থনা করুন, অন্যদের কাছে সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্খা পরিহার করুন। আপনি যখন কারও প্রতি রাগান্বিত হন, তখন নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কেননা আমি ক্রোধের সুযোগে মানুষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকি।'

ছয়,—কাজে-কর্মে অস্থির হওয়া এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতা পরিত্যাগ করা। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কাজে-কর্মে অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া করা শয়তানের অভ্যাস ; শয়তানের পক্ষ থেকেই এ ভাব ও মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়। পক্ষান্তরে স্থিরতা ধীরতা ও চিন্তা-ফিকির করে কাজ করার তাওফীক খাসভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ অস্থির চিত্ত নিয়ে কাজ করার সময় শয়তান এমনভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে থাকে যে, সে তা' মোটেও অনুভব

করতে পারে না।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ইবলীসের শিষ্যরা ইবলীসের নিকট হাজির হয়ে বললো,—আজকে অকস্মাৎ বহু বুত-প্রতিমা ধ্বসে পড়েছে।' ইবলীস বললো,—'তা' হলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এমন হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর ; আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।' একথা বলে সে আকাশে উড়ে সমগ্র অঞ্চল এমনকি বিজন এলাকাগুলোও প্রদক্ষিণ করে কোন কিছুর সন্ধান পেল না। এমন সময় হঠাৎ কোন এক সূত্রে জানতে পেল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশ্তাগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে। তখন সে শিষ্যদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললো ঃ 'অদ্য রাত্রে একজন নবীর জন্ম হয়েছে, ইতিপূর্বে যখনই কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়েছে, আমি সেখানে উপস্থিত রয়েছি ; কিন্তু অদ্যকার রাত্রির ঘটনায় আমি উপস্থিত থাকতে পারি নাই।' বস্তুতঃ শয়তান তখন থেকেই বনী আদমকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তার শিষ্যদেরকে সে বলেছিল, আজ থেকে তোমরা যদি আদমের কোন ক্ষতি করতে চাও, তা' হলে তাড়াহুড়া এবং আলস্য ও মন্থরতার হাতিয়ার ব্যবহার কর।

সাত,—সোনা-রূপা, অর্থসম্পদ ও রকমারী মাল সামান। যেমন গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু ও জায়গা-যমীন প্রভৃতি। এসব উপকরণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতই যোগাড় করা হবে, নির্ঘাত সেগুলো শয়তানের আবাস ও আখ্ড়ায় পরিণত হবে।

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন,—'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভুষিত করা হলো, তখন শয়তান তার শিষ্যদেরকে বলেছিল,—'আজকে দুনিয়াতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ; যাও, তোমরা তদন্ত করে আস বিষয়টা কি? শিষ্যরা বহু ঘুরে-ফিরে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করলো। শয়তান তখন নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিষয়টি খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হলো। বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে বললো,—আজকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুবুওয়াত প্রদান

করেছেন।' এরপর শয়তান তার শিষ্যদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পাঠাতো, অন্ততঃ তাদেরকে যেন পথভ্রষ্ট করে আসে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারেও কৃতকার্য হতো না ; ফিরে এসে সকলেই নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করতো। শয়তান পুনর্বার তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের নামাযে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করার জন্য পাঠাতো। এবারও তারা ফিরে এসে পূর্ববৎ ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করতো। অবশেষে শয়তান তাদেরকে বলেছে,—'হে আমার শিষ্যরা ! তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর, এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব সম্পদে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন আমরা আমাদের পরিকল্পনায় কৃতকার্য হতে পারবো।'

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। এমন সময় অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর কাছে হাজির হয়ে বলতে লাগলো,—'হে ঈসা ! আপনি তো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন।' এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তৎক্ষণাৎ মাথার নীচ থেকে পাথরটি অপসারণ করে শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন,—'নিয়ে যা, দুনিয়ার এ অংশটুকুও তোকে দিয়ে দিলাম।

আট,—ধন-সম্পদে কৃপণতা করা এবং অভাব-অনটনের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকা। এ দু'টি ব্যাধির কারণেই মানুষ আল্লাহ্র রাস্তায় দান-খয়রাত ও নেক কাজে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সর্বদা প্রচুর ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করার নেশায় মেতে থাকে। পরিশেষে আখেরাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর থাকে না। কৃপণতার আরেকটি ক্ষতি এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করার মানসে সর্বদা হাটে-বাজারে ঘুরাফেরা করতে থাকে। অথচ বাজার হচ্ছে শয়তানের আখড়া ও বিচরণক্ষেত্র।

নয়,—মাযহাবের ব্যাপারে গোড়ামি করা, নফস ও কাম-প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করা, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে, আত্মার জন্য মারাত্মক ব্যাধি। এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওলী-দরবেশ ও ফাসেক-ফাজের নির্বিশেষে বহু লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ এক বর্ণনায় প্রকাশ যে, অভিশপ্ত

ইবলীস বলেছে,—'আমি উম্মতে মুহাম্মাদীকে বহুবিধ পাপে লিপ্ত করেছি ; কিন্তু তওবা ও অনুতাপের দ্বারা তারা আমার কোমর ভেঙ্গে ফেলেছে। অবশেষে আমি তাদেরকে এমন পাপে লিপ্ত করার ফন্দি আঁটলাম, যা থেকে তারা কখনও তওবা করবে না ; তা' হচ্ছে, রিপুর অনুসরণ ও যথেচ্ছাচারিতা। অভিশপ্ত ইবলীস এক্ষেত্রে সত্যই বলেছে। কেননা সরলপ্রাণ বান্দারা এ কথা আদৌ জানে না যে, খাহেশ ও রিপুর অনুসরণে পাপের উপকরণ রয়েছে ; সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের অন্তরে তওবার প্রশ্নই জাগ্রত হয় না।

দশ,—মুসলমানদের সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা পোষণ করা। এটা জঘন্য পাপ। এ থেকে কঠোরভাবে পরহেয করা উচিত। অনুরূপ কাউকে কোন বিষয়ে অপবাদ দিতে নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি অপরের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, কারও সম্পর্কে অপবাদ রটায় বা দোষচর্চা করে, এটা মূলতঃ দোষ চর্চাকারী ব্যক্তিরই দুর্বলতা ; প্রকারান্তরে তার ভিতরগত অন্যায় ও অপরাধ-প্রবণতাই অন্যের প্রতি কুধারণা ও দোষচর্চার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র। সুতরাং পুণ্যবান হতে হলে কর্তব্য হচ্ছে, এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। এ ব্যাপারে সুচিকিৎসার জন্য অধিক পরিমাণে যিকরের সাহায্য নেওয়া উচিত।

ইব্‌নে ইসহাক বলেন ঃ যখন মক্কার কাফেররা দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরাম ক্রমে ক্রমে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওনা হচ্ছেন, তখন তাদের আন্দায হয়ে গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এখন আর মক্কায় অবস্থান না করে অন্যত্র (মদীনায়) অবস্থান গ্রহণ করে নিচ্ছেন। কাজেই তারা মহা চিন্তায় পড়ে গেল এবং তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত রাখতে আরম্ভ করলো। মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে—এ আশংকাও তারা করতে লাগলো। এ ব্যাপারে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সেজন্যে তারা পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন্নাদওয়া'তে (কা'বা সংলগ্ন গৃহে) এক গোপন সভা আহ্বান করলো। এটি ছিল কুছাই ইব্‌নে কিলাবের ঘর। এখানে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরামর্শের জন্য সভা আহ্বান করতো। এ গৃহটির সঙ্গতিপূর্ণ নাম রেখেছিল তারা دَارُ النَّدْوَة (বা সভাকক্ষ)। যখনই কুরাইশীদের কোন

বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিতো তখনই সংশ্লিষ্ট সুধীজনকে ডেকে 'দারুন্নাদওয়া'তে বসেই তারা উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই গৃহে একমাত্র কুরাইশী ছাড়া অন্য কারও জন্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সেই গৃহে আবু জাহ্লের প্রবেশাধিকার ছিল। এরা সপ্তাহে একদিন রোজ শনিবার সমবেত হতো। এজন্যেই লোকমুখে একথা শ্রুত হয় যে, 'সপ্তাহের শনিবার হচ্ছে ধোকা ও প্রতারণার দিন।' অভিশপ্ত ইবলীসও এক বৃদ্ধের বেশে সেই সভায় উপস্থিত হয়। বড় গাম্ভীর্য সহকারে মোটা কম্বল ও রেশমের টুপি পরিধান করে দরজার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান। সকলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছে,—'আমি 'নজদ' এলাকার একজন প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। আপনারা যে ব্যাপারের পরামর্শ করতে বসেছেন, আশা করি আমি আপনাদেরকে সে ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও উত্তম পন্থা বলে দিতে পারবো।' এ কথা শুনে তারা সকলেই শয়তানকে বসতে অনুমতি দেয়। বসার সুযোগ পেয়ে শয়তান নিজেই পরামর্শ কার্য পরিচালনা করতে লাগলো।

মুহাম্মদ তাদের ধর্মের অশেষ ক্ষতি করেছে। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের কি করা উচিত। সমবেত একশত লোকের মধ্যে—মতান্তরে পনের জনের মধ্যে—আবুল-বুহ্তারী (পরবর্তীতে সে বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছে) প্রস্তাব করলো,—'তাকে লোহার বেড়ী পরিয়ে বন্দী করে রাখা হোক। অতঃপর দেখ—তার মত আরও অন্যান্য কবিদের যে দশা হয়েছে, তারও তাই হবে।' বৃদ্ধ বললো,—'না ; তবে সর্বনাশ! লোহার জিঞ্জীর দিয়ে বেঁধে তোমরা তাকে বন্দী করে রাখবে সে অপর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে তার ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। অতঃপর সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করবে, তোমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা যখন বেড়ে যাবে, তখন তোমাদের উপর চড়াও করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ফেলবে।' সুতরাং এ প্রস্তাব তেমন কোন মঙ্গলজনক প্রস্তাব নয় ; অন্য কোন তদবীর চিন্তা কর।

আসওয়াদ ইব্নে রবীয়া বললো,—'তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হউক।' বৃদ্ধ শয়তান বললো,—'না ; এটাও হতে পারে না। কারণ, একে মদীনায় তার প্রচারকার্য খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। এরপর সে নিজে গিয়ে

কাজ আরম্ভ করলে তার মধুর ব্যবহার ও ভাষার যাদুক্রিয়ায় অতি অল্পদিনে তার শিষ্যসংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তখন সদলবলে সে তোমাদের উপর হামলা করে তোমাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে।. অতঃপর তোমাদের সাথে যাচ্ছে তা' ব্যবহার করবে ; অথচ তখন তোমাদেরও করার কিছু থাকবে না। সুতরাং এ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব পেশ কর।'

আবূ জাহল প্রস্তাব করলো,—'তাকে হত্যা করা হোক। প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ হতে একজন করে যুবক আসবে এবং সকলে মিলে একযোগে তাকে হত্যা করবে। তা'হলে বনী আবদে মুনাফ আরবের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস পাবে না। বড়জোর হত্যার জরিমানা বাবদ একশত উটের দাবী করবে ; এটা আদায় করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।' শয়তান ইবলীস এই প্রস্তাবের প্রশংসা করে দৃঢ় সমর্থন জানালো। অন্যান্যরাও উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করে হত্যাকার্য সমাধা করার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, একদিন মধ্যরাত্রিতে এ কাজ সমাধা করা হবে।

এদিকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাদের কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সবকিছু জানিয়ে আরজ করলেন যে, অদ্য রাত্রিতে আপনি স্বীয় শয্যায় রাত্রিযাপন করবেন না।

এদিকে মুশরিকরা নির্দিষ্ট রাত্রিতে নিজেদের হীন আশা পূর্ণ করার মানসে নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবীজীর বাসগৃহ বেষ্টন করে ফেলে। উদ্দেশ্য, যখনই দরজা খুলে তিনি বের হবেন, অমনি একযোগে সকলে তাঁকে আক্রমণ করবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)-কে নবীজীর বিছানায় নবীজীর চাদরে—যে চাদর গায় দিয়ে তিনি জুমা ও দুই ঈদের নামায পড়াতেন—শরীর ঢেকে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। বস্তুতঃ হযরত আলী (রাযিঃ)-ই প্রথম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দ্বীন ও নবীর হিফাযতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পূর্ণভাবে উদ্যত হয়েছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الثَّرٰى
وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَبِالْحَجَرِ

'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ; খোদার ঘর তওয়াফকারী ও হজরে-আসওয়াদ চুম্বনকারীদের শ্রেষ্ঠ মানবের হিফাযতে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছি।'

رَسُوْلُ اِلٰهٍ خَافَ اَنْ يَمْكُرُوْا بِهٖ
فَنَجَاهُ ذُوْالطَّوْلِ الْاِلٰـهُ مِنَ الْمَكْرِ

'তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহান রাসূল, শত্রুর চক্রান্তের তিনি প্রবল আশংকা করেছেন ; কিন্তু মহা শক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে হিফাযত করেছেন।'

وَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِي الْغَارِ اٰمِنًا
مُوَقًّى وَفِيْ حِفْظِ الْاِلٰهِ وَفِيْ سِتْرِ

'হুওর গুহায় পূর্ণ নিরাপত্তায় তিনি যখন রাত্রিযাপন করেছেন, তখন খাসভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযতের পর্দায় আবৃত রেখেছিলেন।'

وَبِتُّ اُرَاعِيْهِمْ وَمَا يَتِّمُّوْنَنِيْ
وَقَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِيْ عَلَى الْقَتْلِ وَالْاَسْرِ

'আমি প্রতি মুহূর্তে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রেখেছি এবং তারা আমার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা নিচ্ছে, তাও লক্ষ্য করেছি। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে নিহত অথবা বন্দী হওয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।'

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের চোখে আবরণ টেনে দিয়েছিলেন ; কেউ

কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। নবীজীর হাতে এক মুষ্টি মাটি ছিল। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন 'সূরা ইয়াসীন'। فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (আমি তাদের চোখে পর্দা এঁটে দিয়েছি, কাজেই তারা দেখে না) পর্যন্ত তিলাওয়াত করে হাতের মাটি তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এই মাটি তাদের চোখে-মুখে গিয়ে পড়ে এবং তারা কোন কিছু দেখতে অসমর্থ হয়। আর নবীজী ইচ্ছানুযায়ী তাদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। পরে একজন পথিক তাদের সমবেত হওয়ার কারণ জানতে পেরে বললো,—'তোমরা বৃথা এখানে বসে আছো ; খোদার কসম, তিনি তোমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে চলে গেছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি ছুঁড়ে গেছেন।' এ কথা শুনে সকলেই মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, সত্য সত্যই প্রত্যেকের মাথায় তখনও মাটি রয়েছে। তারপর তারা গৃহে উকি দিয়ে দেখলো, একজন বিছানায় শুয়ে আছে, নবীজীর চাদর দিয়ে তার গাত্র আচ্ছাদিত। এরূপ দেখে তারা বলতে লাগলো, না ; আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে আছে। অতঃপর পূর্বানুরূপ তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। ভোর সকালে যখন হযরত আলী (রাযিঃ) সেই বিছানা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তাদের ভুল ভাঙ্গলো ; বলতে লাগলো,—'রাতের পথিক আমাদেরকে ঠিকই বলেছিল।' এ ঘটনাকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ

'আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশে।' (আনফাল ঃ ৩০)

কবির ভাষায় ঃ

لَا تَجْزَعَنَّ فَبَعْدَ الْعُسْرِ تَيْسِيْرٌ
وَكُلُّ شَيْئٍ لَّهُ وَقْتٌ وَتَقْدِيْرٌ

'আপনি বিচলিত হবেন না ; কেননা কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে এবং প্রতিটি কার্য ও বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে।'

وَلِلْمُقَدِّرِ فِيْ اَحْوَالِنَا نَظَرٌ
وَفَوْقَ تَدْبِيْرِنَا لِلّٰهِ تَدْبِيْرٌ

'তকদীরের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রয়েছে ; বস্তুতঃ তাঁর কুদরত ও তদবীরের কার্যকারিতা আমাদের সকল চেষ্টার উর্ধ্বে।'

এখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীকে হিজরত করার আদেশ দিলেন ; ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

'বলুন ঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। আর দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে এমন বিজয়, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকে।' (ইস্‌রা ঃ ৮০)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ 'হিজরতের হুকুমের সাথে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)-কে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতেও হুকুম করা হয়েছিল।'

হাকেম (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—হিজরতে আমার সফরসঙ্গী কে হবে? হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছিলেন ঃ 'আবু বকর'। অতঃপর নবীজী হযরত আলী (রাযিঃ)-কে বিষয়টি জানিয়ে দেশের বহুলোকের আমানত একটি একটি করে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আমরা চল্‌লাম—তুমি থাক ; সকলের আমানত পাওনা-দেনা বুঝিয়ে দিয়ে তুমিও চলে এসো।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'হিজরতের সেই দিনটিতে আমরা হযরত আবু বকরের গৃহে ছিলাম। সময়টা ছিল দ্বি-প্রহর, প্রচণ্ড গরম পড়ছিল তখন।

তাব্‌রানী কিতাবে হযরত আস্‌মা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সকালে-বিকালে দু'বার

আমাদের বাড়ী আসতেন। কিন্তু সেইদিন দুপুর বেলা হঠাৎ তাঁর আগমনে আমরা বিচলিত ও স্তম্ভিত হলাম। আমি বল্লাম,—'আব্বাজান! ওই যে নবীজী আসছেন, মাথায় রোমাল ঢাকা দিয়ে।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'প্রিয় নবীজীর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান ; এ সময় তিনি অবশ্যই কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসছেন।'

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ী আগমনপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁকে চৌকিতে উপবেশন করালেন। এবার নবীজী বললেন ঃ 'আবু বকর! আপনার সাথে গোপন আলাপ আছে ; সুতরাং আপনি একা থাকুন।' হযরত আবু বকর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ হুযুর! এরা তো আপনার আপন জন ; এই আয়েশা ও আসমা ছাড়া এখানে আর কেউ নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে,—'এরা তো আমারই সন্তান।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়েছি। তৈরী হউন ; আপনি সফরসঙ্গী।' হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন,—'আমি পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে আছি এবং এ উদ্দেশে দু'টি তাজা উষ্ট্রীও খরিদ করে রেখেছি ; তন্মধ্যে আপনার যেটি পছন্দ হয় গ্রহণ করুন।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,—'আমি এর মূল্য পরিশোধ করে নিবো।' বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে হুযুরের উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের ন্যায় মহামূল্য ইবাদত জান-মাল উভয়টার দ্বারা সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ ফযীলত হাসিল করা।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমরা অতি শীঘ্র প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে দিলাম ; চামড়ার এক থলিতে খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম।' ওয়াকেদীর বর্ণনামতে সেই খাদ্য ছিল বকরীর গোশত।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাযিঃ) 'ছওর' পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করলেন। তাঁরা তিনদিন সেই গুহায় অবস্থান করেছিলেন। 'ছওর' মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। 'ছওর ইব্‌নে আবদে মুনাফ' নামক এক ব্যক্তি কোন কালে এই গুহায় অবতরণ করেছিল। তা' থেকেই এই পাহাড়ের নামকরণ হয় 'ছওর'।'

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযিঃ) বাড়ীর পশ্চাৎদিকের একটি জানালার পথে বের হয়ে 'ছওর' পাহাড় অভিমুখে রওনা হয়ে যান। আবূ জাহ্‌ল তখন তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে কিছুই ঠাহর করতে পারে নাই। নির্বিঘ্নে তাঁরা গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

আবু বকর তনয়া আসমা (রাযিঃ) বলেন,—'আমার পিতা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিয়ে বাড়ী হতে বের হয়েছেন। কুরাইশীরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে আশে-পাশে চতুর্দিকে উন্মত্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। প্রত্যেক পথে কিছুসংখ্যক লোক তাঁদের অন্বেষণে পাঠিয়ে দিল। পদচিহ্ন বিশারদ কতিপয় লোক নবীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অথচ নবীজী তখন সেই গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন। কিন্তু তাদের মনে সেই গুহাতে খোঁজ করার চিন্তাই উদিত হয় নাই। অবশেষে এই চরম ব্যর্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোষণা করলো যে, 'মুহাম্মদ ও আবূ বকরকে যে ব্যক্তি ধরে আনতে পারবে তাকে মাথাপিছু একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।'

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রাযিঃ) ছওর গুহায় প্রবেশের পর তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা গুহামুখে উম্মে গায়লান নামক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করে দিলেন। ফলে কাফেরদের দৃষ্টি গুহাভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে নাই। সেইসঙ্গে আল্লাহর আর মহিমা! একটি বড় মাকড়সা গুহামুখে ঘন জাল বুনে দেয়। এর অব্যবহিত পর ভোরের দিকে এক জোড়া কবুতর কোথা হতে এসে বাসা বাঁধে ও ডিম দিয়ে সেখানেই বসে যায়। আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সফরসঙ্গী আবূ বকরকে হেফাযত করার এটা ছিল একটি কুদরতি উপায়। কথিত আছে—হরম শরীফে অবস্থানরত কবুতরগুলো সেই কবুতর জোড়ারই বংশোদ্ভূত।

ইতিমধ্যে কাফেররা ছওর পাহাড়ের সব জায়গা বিশেষ করে গুহাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলো—বাকী শুধু এই গুহাটি। তাদের সাথে লাঠি-সোটা ঢাল-তলোয়ার সবই ছিল। এই গুহাটির মুখে মাকড়শার অক্ষত জাল, তদুপরি কবুতর দুইটি দেখে ভাবলো—ভিতরে কেউ নাই। একজন বললো, ভিতরে

প্রবেশ করেই দেখা যাক কেউ আছে কিনা। নবীজী তাদের এসব কথা শুনছিলেন। গুহার উক্তরূপ অবস্থা দেখে উমাইয়া ইব্‌নে খলফ বললো,– এর ভিতরে তারা থাকতে পারে না। কারণ, কেউ এই গুহায় প্রবেশ করলে মাকড়সার জাল কি আর আস্ত থাকতো? আর বন্য কবুতরই কি এখানে বাসা বেঁধে ডিম দিতো? কেউ কেউ বললো ঃ 'এই জাল আমি মুহাম্মদের জন্মের পূর্ব থেকেই দেখে আসছি।' অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা ফিরে যায়। বস্তুতঃ এ ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের বিকাশ, যা শত্রুপক্ষকে সৈন্য–সামন্তের সাহায্যে পরাভূত করার চাইতে অনেক উর্ধ্বের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদ্ভিদের ছায়া ও অতি দুর্বল ও একান্ত নিরীহ দুইটি মূক প্রাণীর দ্বারা এত প্রবল ও পরাক্রমশালী দুর্দান্ত অসুরদের এরূপে পরাজয় ঘটান। কবি ইব্‌নে নকীবের ভাষায় ঃ

وَدُوْدُ الْقَزِّ اِنْ نَسَجَتْ حَرِيْرًا ه يَجْمُلُ لُبْسُهٗ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ فَاِنَّ الْعَنْكَبُوْتَ اَجْمَلُ مِنْهَا ه بِمَا نَسَجَتْ عَلٰى رَأْسِ النَّبِىِّ ـ

'বুননকৌশলী রেশম পোকার বুনা রেশমী সূতার দ্বারা তৈরী বস্ত্রের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোহারিত্বপূর্ণ ; কিন্তু মাকড়সা ঐ রেশম পোকার চাইতেও অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ। কারণ, ছওর গুহায় মাকড়সার বুনা জাল প্রিয় নবীজীর হিফাযতে তাঁর পবিত্র মাথার উপর শোভা পেয়েছিল।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে,—হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন ঃ 'গুহামুখে দাঁড়িয়ে যখন কাফেররা জল্পনা কল্পনা করছিল, তখন আমি বিচলিত হয়ে হুযূরের নিকট আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যদি একটু নীচের দিকে তাকায়, তা'হলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিচল ও প্রশান্ত চিত্তে বললেন ঃ

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ

'যে দুইয়ের সাথে তৃতীয় সত্তা খোদ আল্লাহ্ পাক রয়েছেন, তাদের কোন ভয় নাই।'

সীরাতবেত্তাগণ লিখেছেন,—'হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) বিচলিত হয়ে উক্তরূপ আশংকা প্রকাশ করার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা যদি আমাদেরকে দেখে ফেলে, তা'হলে আমরা এদিকে বের হয়ে যাবো। হযরত আবূ বকর তাকিয়ে দেখেন, গুহার অপরদিকে খোলা পথ রয়েছে, অদূরেই সমুদ্র তীরে নৌকা ও মাঝি মাল্লা সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষমান।'

হযরত হাসান বসরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে,—'হিজরতের রাত্রিতে পথ অতিক্রমকালে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রে আবার কখনো পশ্চাতে চলছিলেন। আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,– 'আমার আশংকা হয়—দুশমন ওঁত পেতে সম্মুখে বসে আছে ; তখন আমি আপনার সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে যাই।' হুযূর বললেন ঃ 'হে আবূ বকর ! তা'হলে কি তুমি কামনা কর যে, অনিবার্য কোন বিপদে আমার স্থলে তুমিই নিহত হও ?' হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কসম করে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটি আমি অবশ্যই কামনা করি।'

'ছওর' গুহার নিকটবর্তী হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি অপেক্ষা করুন ; আমি গুহার অভ্যন্তরভাগ পরিস্কার করে নিই।' পর্বত–গুহা ; জনমানবের চলাচল সেখানে ছিল না। ছিদ্রের ফাঁকে ফাঁকে সাপ–বিচ্ছু থাকাও বিচিত্র নয়। তাই নবীজীকে গুহার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে হযরত আবূ বকর প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। কোথাও কিছু না পেয়ে গায়ের চাদর ছিড়ে গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবুও একটি ছিদ্র কাপড়ের অভাবে বাকী থেকে যায়। হযরত আবূ বকর নিজের পায়ের গোড়ালী সেই ছিদ্রের মুখে রেখে নবীজীকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে ডাকলেন। নবীজী গুহায় প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকরের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

ক্লান্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ হযরত আবূ বকর অনুভব করলেন, খোলা গর্তটির ছিদ্রপথে রক্ষিত পায়ে কিসে যেন দংশন করলো। দংশনের বেদনা ক্রমেই তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললো। অসহ্য বেদনায় তাঁর সারাটি দেহ বিষে

জর্জরিত হয়ে উঠলো। তথাপি প্রিয় নবীজীর ঘুমে ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি একটুও নড়া-চড়া কিংবা আহা-উহু পর্যন্ত করছিলেন না। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও ভীষণ বেদনার দরুন তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো একেবারে আঁ-হযরতের চেহারা মুবারকের উপর। প্রিয় নবীজীর নিদ্রা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হয়ে গেল। আবূ বকর জানালেন, তাকে সাপে দংশন করেছে। নবীজী নিজের মুবারক থুথু ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষের অসহ্য যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল। আবূ বকর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বৃহস্পতিবার দিন প্রস্থান করেছিলেন। তিন দিন 'ছওর' গুহায় অবস্থান করার পর সোমবার দিন সেখান থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হন। তখন সময়টা ছিল রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিক। এভাবে তিনি ১২ই রবীউল আউয়াল রোজ শুক্রবার পবিত্র মদীনা-মুনাওয়ারায় গিয়ে পৌছেন।

যাকারিয়া নামক জনৈক বুযুর্গের অন্তিম সময়ে তার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক বন্ধু কালেমা তাইয়্যেবা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه তালকীন করে তাকে পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু সেই বুযুর্গ তা পাঠ না করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি পুনরায় তালকীন করেন। এবারও সেই বুযুর্গ মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন তৃতীয় বার তালকীন করলেন, তখন তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করে বললেন ঃ 'না'। এতে বন্ধু অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বুযুর্গের জ্ঞান ফিরে আসলে চক্ষু উন্মীলন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কি আমাকে কিছু পড়তে বলেছিলে? বন্ধু বললেন ঃ 'হাঁ, আপনাকে কালেমা পড়ার জন্য তিনবার উদ্বুদ্ধ করেছি, দুইবার আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তৃতীয়বার স্পষ্ট অস্বীকার করে 'না' বলে দিয়েছেন।' বুযুর্গ বললেন ঃ প্রকৃত ঘটনা এই যে, অভিশপ্ত ইবলীস এক পেয়ালা পানি হাতে নিয়ে আমার শিয়রে দাঁড়ানো ছিল। বারবার সে পাত্রটিকে নড়া-চড়া দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল পানির প্রয়োজন আছে কি? আমি প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলে সে আমাকে বলছিল 'তা'হলে তুমি একথা সাক্ষ্য দাও যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র।' তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পুনরায় সে আমার দিকে

এসে সেই কথাই বললো। তখনও আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয়বার যখন সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলো, তখন আমি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলেছি ঃ 'না' কিছুতেই আমি তা' সাক্ষ্য দিবো না। তারপর শয়তান পেয়ালাটি যমীনের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে পলায়ন করেছে। সুতরাং তোমাদের তালক্বীনের সময় আমি আসলে শয়তানের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করছিলাম ; তোমাদের তালক্বীন বা কালেমা তাইয়্যেবাকে নয়। শুন, আমি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছি,—'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে,– এক ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রতারণার প্রক্রিয়া–প্রণালী সম্পর্কে জানতে চেয়ে আল্লাহ্র কাছে আবেদন করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বপ্নযোগে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার পদ্ধতি এভাবে দেখিয়েছেন যে, কাঁচের মত স্বচ্ছ–পরিস্কার দেহের অধিকারী একজন লোক, যার ভিতর–বাহির সব স্পষ্ট দেখা যায়, তার ভিতরে দেখা গেল— শয়তান একটি ব্যাঙের আকৃতিতে তার কাঁধ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছে এবং তার একটি সুদীর্ঘ শুঁড় রয়েছে। শুঁড়টিকে সে লোকটির অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়ে তাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। যখনই লোকটি আল্লাহ্র যিকর করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায়।

আয় আল্লাহ্! শয়তান থেকে আমাদেরকে পানাহ্ দিন। বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রভাব থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন। আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাদেরকে যিকর ও শোকর করার তাওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ১৭
আমানত ও তওবা

মুহাম্মদ ইব্‌নে সেকান্দর (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেন ঃ একদা আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) একদা পবিত্র কা'বা ঘর তওয়াফ করার সময় দেখলেন, একজন লোক পদে পদে কেবল হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পড়ছে। হযরত সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি অন্যান্য তাসবীহ-তাহলীল না পড়ে কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করছো ; এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি তোমার বিশেষ কোন ঘটনা আছে?' লোকটি হযরত সুফিয়ানের পরিচয় জেনে বললো ঃ 'আপনি যদি দেশের খ্যাতনামা বুযুর্গ না হতেন, তা'হলে এ রহস্য সম্পর্কে আপনাকে কিছুই বলতাম না। শুনুন,—'একবার আমি আমার পিতার সাথে পবিত্র কা'বাঘর তওয়াফের উদ্দেশে বের হই। পথে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমি إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ার পর তার চেহারা বস্ত্রাবৃত করে রেখে দিই। কিছুক্ষণ পর আমি বিষন্ন মনে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি,—অত্যন্ত সুশ্রী-সুদর্শন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত একজন লোক,—যার শরীর থেকে খোশবু চতুর্দিকে মোহিত হয়ে পড়ছিল—আমার পিতার নিকট এসে চেহারার উপর রক্ষিত চাদর সরিয়ে মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে, আমার পিতার চেহারা দিব্যি পরিস্কার ও সফেদ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি প্রস্থান করতে উদ্যত হলে আমি তাঁর হাত ধরে বললাম,—'আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই, যার ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা এই সফরে আমার পিতার উপর এক বড় অনুগ্রহ করেছেন, তাঁকে আমি চিনতে চাই।' তিনি বললেন ঃ 'তুমি আমাকে চিনো না? আমিই তো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), পবিত্র কুরআন আমারই উপর নাযিল হয়েছে। তোমার পিতা বহু অন্যায়-অপরাধ করে নিজের উপর জুলুম করেছে ; কিন্তু সে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে আমার উপর দরূদ পড়তো।

এই বিপদের সময় সে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আর আমি আমার প্রতি দরূদ পাঠকারীকে সাহায্য করে থাকি।' অতঃপর আমি জাগ্রত হই এবং দেখি, পিতার চেহারা সম্পূর্ণ শুভ্র, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।'

আমর ইব্‌নে দীনার আবু জা'ফরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ نَسِىَ الصَّلٰوةَ عَلَىَّ فَقَدْ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ ـ

'আমার প্রতি যে দরূদ পাঠ করে না, সে জান্নাতের বিপরীত পথে চলছে।'

'আমানত' (امانت) শব্দটি আম্‌ন (امن) ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে, মুক্ত থাকা, নিশ্চিন্ত হওয়া। বস্তুতঃ 'আমানতে'র গুণে অলংকৃত ব্যক্তি বাতিলের কলুষতা হতে মুক্ত—পবিত্র এবং হকের উপর নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'খিয়ানত'(خيانت), যা 'ত্রুটি' ও 'দোষ' এর অর্থবোধক 'খূন' (خون) ধাতু হতে নির্গত। বস্তুতঃ খিয়ানতের মাধ্যমে কলুষমুক্ত একটি বস্তুকে ত্রুটিপূর্ণ ও দুষ্ট করে দেওয়া হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে 'আমানত' ও 'খিয়ানত' নামকরণের তাৎপর্য এখানেই।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِى النَّارِ ـ

'ধোকা, প্রতারণা ও খিয়ানতের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهٗ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهٗ وَوَجَبَتْ اُخُوَّتُهٗ ـ

'যে ব্যক্তি লোকজনের সাথে মেলামেশা করা সত্ত্বেও কারও উপর জুলুম বা বে-ইনসাফী করে না, অনুরূপ মানুষের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনও মিথ্যা ও খিয়ানতের আশ্রয় নেয় না, এমন ব্যক্তি বস্তুতঃই

পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী, সততা ও মহত্ত্বগুণ তার স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। এহেন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করা চাই।'

মরু–আরবের জনৈক বেদুঈন লোক একটি গোত্রের প্রশংসা করে বলেছিল,—'এরা আমানত ও সত্যের সংরক্ষণে উম্মাদ–অনুরাগী, অঙ্গীকার ও ওয়াদা–ভঙ্গের কল্পনাও তারা করে না, কোন মুসলমানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোন ত্রুটি করে না, তাদের দায়িত্বে কারও কোন হক বা পাওনা অবশিষ্ট নাই,তারা এবংবিধ বহু চমৎকার গুণাবলীর অধিকারী।' আফসুস! বেদুঈনের প্রশংসিত সেই লোকেরা আজ দুনিয়াতে নাই ; পরন্তু আমরা দেখছি, মনুষ্য–পোষাক পরিধান করে আজ হিংস্র জন্তুরা আমাদের সম্মুখে বিচরণ করছে। কবির ভাষায় ঃ 'বিশ্বাস করার মত মানুষ এ জগতে কে আছে? সৎ ও মহৎ লোকের জন্য যোগ্য বন্ধু পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক মানুষকে বাদ দিলে আর বাকীরা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে ; যদিও তারা বাহ্যতঃ মনুষ্য–পোষাক পরে মানব সমাজে বিচরণ করে।'

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'শীঘ্রই এমন এক যমানা আসছে, যখন মানুষের মধ্য থেকে 'আমানতে'র গুণটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। লোকেরা পরস্পর লেন–দেন ও ক্রিয়া–কর্ম আন্জাম দিবে ; কিন্তু 'আমানত' কারও মধ্যে থাকবে না, এবং তা' এতোই দুষ্প্রাপ্য ও কঠিন বস্তু হবে যে, লোকেরা বলাবলি করবে, অমুক গ্রামে অমুক গোত্রে একজন 'আমানতদার লোক' আছে।'

তওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াত ও অসংখ্য হাদীসের দ্বারা তওবার ফর্যিয়ৎ ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

'মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা কর, যাতে সফলকাম হতে পারো।' (নূর ঃ ৩১)

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তিকে তওবার হুকুম

করা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা।' (তাহ্রীম ঃ ৮)

'নাছূহ' (نصوح) শব্দের মর্ম হচ্ছে—এমন স্বচ্ছ, নির্মল ও সনিষ্ঠ তওবা, যার মধ্যে শির্ক রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতার লেশমাত্র থাকে না।

নিম্নের এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তওবার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে, তাদেরকে ভালবাসেন।' (বাকারাহ্ ঃ ২২২)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلتَّائِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'তওবাকারী আল্লাহ্র বন্ধু, তওবাকারী গুনাহ্ থেকে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'কোন ঈমানদার ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা'তে কিরূপ আনন্দিত হোন, তা' তোমরা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারবে। যেমন কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে একটি জনমানবহীন মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। যেখানে ভয়-ভীতির কোন অন্ত নাই। সেই ব্যক্তির সঙ্গে তার আরোহণের জন্তুটিও ছিল। ব্যক্তিটি ক্লান্তিভরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ইত্যবসরে তার জন্তুটি খাদ্য ও পানীয় সহ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জন্তুটিকে না পেয়ে হতাশ হয়ে সেটিকে খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় সে বাহন ব্যতীত বাহিরেও আসতে

পারে না ; আর তথায় পড়ে থাকলে খাদ্য বিহনে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে, অধিকন্তু প্রখর-রৌদ্রের প্রাণান্তকর তাপ তো আছেই। লোকটি এই চিন্তা করে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে স্বীয় বাহুতে মাথা রেখে অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষায় নিদ্রিত হয়ে পড়লো। অতঃপর হঠাৎ নিদ্রা হতে উঠে দেখলো, তার আরোহণের উটটি খাদ্যসম্ভার সহ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। এইরূপে নিরাশার আঁধারে আশার আলো দেখতে পেয়ে তখন ঐ লোকটির যেমন আনন্দের সীমা থাকবে না, তদ্রূপ কোন বান্দা পাপের পথ হতে দ্বীনের পথে ফিরে এসে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবূল করলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে মুবারকবাদ দিলো। এই সুবাদে জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস্ সালামও এসে বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনার তওবা কবূল করেছেন ; আপনার মনের আকাংখা পূর্ণ হয়েছে, চক্ষু জুড়িয়েছে।' হযরত আদম (আঃ) বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! এখন তওবা কবূলের পর কি জানতে পারি যে, আমার মকাম ও অবস্থান কোন পর্যায়ে?' তখন ওহী আসলো ঃ 'হে আদম! তোমার আওলাদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য আমি দুঃখ-ক্লেশ ও যাতনা-সাধনা অবধারিত করে দিয়েছি, আর তোমার সূত্রে তারা 'তওবা' উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হবে। তাদের যে-কেউ আমার কাছে তওবা করবে, আমি অবশ্যই তা' কবূল করবো, তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবো ; এ ব্যাপারে আমি কোনরূপ কৃপণতা করবো না। কেননা আমার ছিফত হচ্ছে, বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী, আমি বান্দার অতি নিকটবর্তী। হে আদম! তওবাকারী ব্যক্তিকে আমি হাশরের ময়দানে এভাবে উত্থিত করবো যে, সে আনন্দভরে হাসতে থাকবে, তার প্রার্থনা আমি কবূল করবো।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِالتَّوْبَةِ لِمُسِيْءِ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ

وَلِمُسِيءِ النَّهَارِ اِلَى اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔

'রাত্রিতে যে পাপে লিপ্ত হয়েছে, তার গুণাহ্মাফীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হস্ত প্রসারিত করে তাকে সারাদিন ডাকতে থাকেন। আর দিবসের পাপাচারীকে তওবার জন্য সারারাত্র ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র ডাক অব্যাহত থাকে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কখনও এমন হয় যে, বান্দা গুনাহ্ করে এবং গুনাহের কারণেই সে জান্নাত লাভের সুযোগ পায়।' জিজ্ঞাসা করা হলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি করে সম্ভব?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'উক্ত গুনাহের কারণে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, সর্বদা তা' থেকে দূরে থাকে—এভাবে কৃত পাপের তওবা তাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ

'লজ্জা ও অনুতাপ বান্দার গুনাহের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।'

বর্ণিত আছে,—'একদা একজন হাবশী লোক হুযূরকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন ইবাদত করি, তখন কি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দেখেন? হুযুর বললেন ঃ 'অবশ্যই দেখেন।' এ কথা শুনে লোকটি সজোরে এক চিৎকার দিল। পরক্ষণেই দেখা গেল তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে।'

শয়তান ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্র কাছে কিছুকাল হায়াত প্রার্থনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন। তখন সে বলেছিল,—'হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম, বনী আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু থাকে, আমি তাদেরকে তোমার আনুগত্য হতে বিমুখ করে রাখবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, প্রতি মুহূর্তে আমি বনী আদমের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখবো।'

হাদীস শরীফে আছে,—'নেক আমল পাপকে এমনভাবে মোচন করে দেয়, যেমন পানি ময়লা-কদর্যকে দূর করে দেয়।'

হযরত সায়ীদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন) এই আয়াতটি এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে পাপকার্য করার পর তওবা করে, আবার পাপে লিপ্ত হয় আবার তওবা করে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র ফরমান রয়েছে যে, পাপী লোকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের তওবা কবূল হবে, আর পরম পুণ্যবানদেরকে (ছিদ্দীকীন) হুঁশিয়ার করে দাও যে, যদি তাদের হিসাব লওয়া হয়, তা' হলে তারা শাস্তির যোগ্য হবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি পাপের কথা স্মরণ করে দুঃখিত হয় এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে শঙ্কিত হয়, তার পাপ আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।'

একদা এক বুযুর্গ থেকে একটি পাপকার্য সংঘটিত হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, পুনরায় যদি এমন হয়, তা' হলে আমি তোমাকে শাস্তি দিবো। তিনি আরজ করলেন,—'আয় পরওয়ারদিগার! আপনি মহাশক্তিমান, অসীম কুদরতের মালিক, আর আমি দুর্বল ক্ষীণকায় আপনার এক মাখ্‌লূক। সুতরাং আপনার ইয্‌যতের কসম, যদি আপনি দয়া করে আমাকে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা না করুন, তা' হলে আমার নিজ ক্ষমতায় গুনাহ্ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।' এ কাকুতির ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'একজন পাপী লোক তওবা করতে চায়, তার তওবার কোন অবকাশ আছে কি?' একথা শুনে হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) স্বীয় চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন ঃ 'জান্নাতের বহু দরজা আছে সেগুলো সময় সময় খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয় ; কিন্তু একমাত্র তওবার দরজাটি কখনও বন্ধ করা হয় না ; বরং সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশ্‌তা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। সুতরাং তোমরা নেক আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হয়ো না।'

বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন যুবক ছিল। দীর্ঘ বিশ বছর সে আল্লাহ্

তা'আলার ইবাদত–বন্দেগী করেছে। পরবর্তী বিশ বছর সে আল্লাহ্র না–ফরমানী ও অবাধ্যতার মধ্যে কাটিয়েছে। একদা সে আয়নার ভিতর দৃষ্টি করে দেখে, তার দাঁড়ি পাকতে আরম্ভ করেছে। তখন সে অনুতাপ করে বলেছে,—'হে মাওলা! বিশ বছর আমি তোমার ইবাদত করেছি, তারপর বিশ বছর তোমার না–ফরমানীতে কাটিয়েছি। এখন যদি আমি আবার তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করি, তা' হলে কি তুমি আমার তওবা কবূল করবে? একথা বলার পর গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো,—'তুমি আমাকে মহব্বত করেছো, তখন আমিও তোমাকে মহব্বত করেছি। আবার যখন তুমি আমাকে পরিহার করেছো, আমিও তোমাকে পরিহার করেছি, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছো, তখন আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি এবং তোমার উপর আযাব নাযিল করি নাই। এখন যদি তওবা করে তুমি আমার দিকে ফিরে আসো, তা' হলে আমি তোমার তওবাও কবূল করে নিবো।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْسَى الْحَفَظَةَ مَا كَانُوا كَتَبُوا مِنْ مَسَاوِي عَمَلِهِ وَأَنْسَى جَوَارِحَهُ مَا عَمِلَتْ مِنَ الْخَطَايَا وَأَنْسَى مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَقَامَهُ مِنَ السَّمَاءِ لِيَجِيْءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْخَلْقِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ.

'বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন এবং গুনাহ্ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্তাদেরকে তার গুনাহ্ ভুলিয়ে দেন। অনুরূপ সেই তওবাকারী ব্যক্তির অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যেগুলোর সাহায্যে সে গুনাহ্ করেছে, যমীনের যে অংশে সে গুনাহ্ করেছে এবং আসমানের নীচে যেখানে সে গুনাহ্ করেছে, এসব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে দেন, যাতে দুনিয়ার কোন মাখ্লূক ক্বিয়ামতের ময়দানে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে।'

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বিশ্ব জগত সৃষ্টি করার চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচে লিখে রেখেছেন,—যে ব্যক্তি তওবা করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে, অনুরূপ যে ব্যক্তি নেক আমল করবে এবং সঠিক হেদায়াতের পথে চলবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো।'

স্মরণ রেখো,—ছোট-বড় প্রত্যেকটি গুনাহ্ থেকে তওবা করা ফরযে আইন। কেননা ছোট গুনাহ্ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে মানুষ বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সাহস করে বসে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৩৫)

বস্তুতঃ 'তাওবাতুন্নাছুহে'র অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তঃকরণ উভয় দিক থেকেই তওবা করবে। পচা-গান্ধা গলিজের উপর সুদর্শন রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়ে রাখলে দর্শক প্রথমতঃ বিস্মিত হবে বটে ; কিন্তু উপর থেকে আচ্ছাদনটি সরিয়ে নিলে, পূঁতিগন্ধময় গলিজ বেরিয়ে আসবে, তখন যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিবে। অনুরূপ, মাখ্লুকের দৃষ্টি হয় বাহ্যিক রূপের উপর ; কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বান্দার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা হবে, তখন ফেরেশ্তাগণ তাদের চেহারা ফিরিয়ে নিবে।

এ জন্যেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আমলের বাহ্যিক রূপ দেখেন না ; বরং তিনি তোমাদের অন্তরের অবস্থা দেখেন।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে, যারা নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে ; কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তাদেরকে প্রকৃত তওবাকারী হিসাবে গণ্য করা হবে না। কারণ, তারা তওবার সঠিক তরীকা অবলম্বন করে নাই ; দুনিয়াতে তারা বাহ্যতঃ তওবা করেছে বটে ; কিন্তু কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় নাই, ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার দৃঢ়সংকল্প করে নাই, যাদের উপর জুলুম করেছে, তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, তাদের হক আদায় করে নাই ; অথচ এদের জন্য সে সুযোগ ছিল। অবশ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করা সম্ভব না হয়, অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এস্তেগ্‌ফার ও মঙ্গল কামনা করে, তা' হলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা পাওনাদারদের রাজী করে তওবাকারীকে পরিত্রাণ দিবেন। এক্ষেত্রে আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে, গুনাহ্ করে ভুলে যাওয়া এবং এমন গাফেল হওয়া যে, তওবা করার কথা অন্তরে উদয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে, সর্বদা স্বীয় কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, অকস্মাৎ কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করা ; এ ব্যাপারে গাফেল ও বিস্মৃত মোটেও না হওয়া। যেমন জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِى جَرَائِمَهُ
لَا تَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَا سَلَفَا

'ওহে পাপী, চরম পর্যায়ে উপনীত অপরাধী! তোমার পাপাচারের কথা ভুলে যেয়ো না ; অতীতের পাপরাশি সব স্মরণ কর।'

وَتُبْ اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرَا
يَا عَاصِيًا وَاعْتَرِفْ اِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا

'এবং মৃত্যুর পূর্বেই সতর্ক হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীয় গুনাহ্ স্বীকার করে অনুতপ্ত হও এবং সত্যিকারের তওবা কর।'

ফকীহ্ আবুল-লাইস (রহঃ) সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার দ্বার-প্রান্তে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হুযূর বললেন,—তাকে ভিতরে আসতে দাও। অতঃপর যুবক কাঁদতে কাঁদতে ভিতরে প্রবেশ করলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে আরজ করলো ঃ 'হুযূর! আমি মারাত্মক গুনাহ্ করে ফেলেছি ; তাই মহান আল্লাহ্র ভয়ে আমি রোদন করছি।' হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করেছো? কাউকে না-হক কতল করেছ?' সে বললো ঃ 'না'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, চাই সে গুনাহ্ সাত আসমান-যমীন ও পাহাড়ের সমপরিমাণই হোক না কেন।' যুবক আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গুনাহ্ এর চাইতেও বড় এবং অধিক মারাত্মক।' হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তা' হলে কি তোমার গুনাহ্ আল্লাহ্র কুরসীর চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ 'আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক।' হুযূর বললেন ঃ 'তোমার গুনাহ্ কি আল্লাহ্র আরশের চাইতেও বড়?' যুবক বললো ঃ আমার গুনাহ্ খুবই মারাত্মক। আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ তোমার গুনাহ্ কি স্বয়ং আল্লাহ্র চাইতেও বড়? অর্থাৎ,— আল্লাহ্র ক্ষমা সবচাইতে বেশী। যুবক বললো ঃ হুযূর! আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। হুযূর বললেন ঃ 'তা' হলে শুনো, মহান আল্লাহ্ বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দেন।'

অতঃপর হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গুনাহ্ করেছো? আমাকে বলো। সে বললো,—হুযূর! তা' ব্যক্ত করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। হুযূর পুনরায় তাকে বলতে নির্দেশ করলেন। সে বললো,—'আমি বিগত সাত বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি। কিছুদিন হয় এক আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তাকে দাফন করার পর কবর খুঁড়ে আমি তার কাফন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা দিলো। ফলে, আমি যুবতীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। অতঃপর আমি কিছুদূর যেতে না যেতেই যুবতী হঠাৎ কবর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো,—'ওহে

যুবক! তোর ধ্বংস হোক, মহাবিচারকের (আল্লাহ্র) প্রতি কি তোর কোন ভয় নাই, তিনি মজলুমের পক্ষ হয়ে জালেমের প্রতিশোধ নিবেন ; তুই আমাকে অগণিত মৃতের সম্মুখে লজ্জিত করলি এবং আল্লাহ্র সম্মুখে আমাকে না-পাক অবস্থায় দাঁড় করালি।' একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীঘ্র তার গর্দান ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন ঃ 'হে ফাসেক! তুই তো জাহান্নামের উপযুক্ত কাজ করেছিস।' অতঃপর যুবক আল্লাহ্র দরবারে তওবা করতে করতে বের হয়ে গেলো। দীর্ঘ চল্লিশ রাত্র সে একাধারে আল্লাহ্র কাছে অনুতাপ ও কান্নাকাটি করার পর আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে বললো,—'ওগো খোদা! মুহাম্মদ, আদম ও ইব্রাহীমের খোদা! যদি তুমি আমাকে মা'ফ করে দিয়ে থাকো, তা' হলে এ খবর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দাও। আর যদি আমাকে মা'ফ না করে থাকো, তা' হলে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমকে জ্বালিয়ে দাও এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর।' অতঃপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার রব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাখ্লূক কি আপনি সৃষ্টি করেছেন না আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন?' হুযুর বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা।' হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবককে ডেকে উক্ত সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে জনৈক ব্যক্তির অবস্থা এই ছিল যে, সে তওবার উপর অটল থাকতে পারতো না। যখনই তওবা করতো, পরক্ষণেই সে তার বিপরীত কার্যে লিপ্ত হয়ে যেতো। বিশ বছর পর্যন্ত তার এই অবস্থা বলবৎ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ 'হে মূসা! আমার এই বান্দাকে বলে দাও যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত।' মূসা (আঃ) তাকে এই সংবাদ পৌছিয়ে দিলেন। সে খুবই চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ে বিজন প্রান্তরে চলে গেলো

এবং সেখানে সে বলতে লাগলো ঃ 'ওগো খোদা! তোমার অনন্ত রহমত কি শেষ হয়ে গেছে, না আমার না-ফরমানী তোমার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তোমার অফুরন্ত ক্ষমার ভাণ্ডার কি শূন্য হয়ে গেছে, না তুমি বান্দার প্রতি ক্ষমার বিষয়ে কৃপণতা করছো? বান্দার কোন্ পাপটি এমন আছে যা' তোমার অনন্ত-অনাদি ক্ষমা ও দয়া-গুণের চাইতে বড়। অন্যায়-অপরাধ করা তো বান্দার সহজাত স্বভাব, এ স্বভাব কি তোমার অনন্ত মহিমাকে অতিক্রম করতে পারে? না ; তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। তুমি যদি তোমার বান্দার প্রতি রহমত ও দয়াবর্ষণ বন্ধ করে দাও, তা' হলে সে কার কাছে আশা করবে? আর তুমি যদি তাকে বিমুখ করে দাও, তা' হলে সে কার দ্বারে ধন্না দিবে? যদি আমি দুর্ভাগার প্রতি তোমার রহমত ও দয়ার দরজা বন্ধ হয়ে থাকে, আর শাস্তি যদি আমার জন্য অবধারিত থাকে, তা' হলে তোমার সকল বান্দার আযাব একা আমাকে দাও, আমি সকলের পক্ষ থেকে এই আযাব গ্রহণ করে নিবো।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি আমার সেই বান্দার কাছে গিয়ে বল,—তুমি যদি সমগ্র পৃথিবী ভরে গুনা'ও করে থাকো, তবু আমি তা' ক্ষমা করে দিলাম। কেননা, তুমি আমার কুদরত ও দয়ার ছিফাতকে উপলব্ধি করেছো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ صَوْتٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ صَوْتِ عَبْدٍ مُذْنِبٍ تَائِبٍ يَقُوْلُ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ لَبَّيْكَ يَا عَبْدِى سَلْ مَا تُرِيْدُ اَنْتَ عِنْدِى كَبَعْضِ مَلَائِكَتِى اَنَا عَنْ يَّمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَفَوْقِكَ وَقَرِيْبٌ مِّنْ ضَمِيْرِ قَلْبِكَ اشْهَدُوْا يَا مَلَائِكَتِى اَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ

'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয় আওয়ায হচ্ছে, গুনাহের পর তওবাকারী বান্দার আওয়ায, যে আল্লাহ্কে ডেকে বলে—'ইয়া রব্ব!' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ওহে বান্দা! আমি তোমার সম্মুখেই আছি,

তোমরা যা ইচ্ছা, আমার কাছে চাও, তোমার মর্যাদা আমার কাছে কোন কোন ফেরেশ্‌তার সমতুল্য, আমি তোমার ডান, বাম, উপর সর্বদিকে বিরাজমান এবং তোমার অন্তরের অতি নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মা'ফ করে দিলাম।'

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন,—আল্লাহ্ তা'আলার বহু বান্দা এমন আছে, যারা জীবনে প্রথমতঃ পাপের বৃক্ষ রোপন করেছে ; অর্থাৎ,—জীবনে বহু গুনাহ্ করেছে। পরবর্তীতে অতীত কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পাপবৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে তওবার পানি সিঞ্চন করেছে। অতঃপর সেই বৃক্ষে স্বীয় অতীত জীবনের উপর দুঃখ ও আক্ষেপের ফল দেখা দিয়েছে। এখন উন্মাদনা ব্যতিরেকেই তারা আল্লাহ্‌র পাগল। বড় জ্ঞানী ও বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তাদেরকে নির্বোধ জ্ঞান করে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র আরেফীন ও যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত। তারা অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিষ্কলুষতার জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনার অমৃত পান করেছে। সীমাহীন কষ্ট ও দুঃখ-যাতনা বরদাশ্‌ত করেছে। ফলে, তাদের অন্তর আসমানী পরিবেশে 'স্বচ্ছ' স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ধ্যান ও ভাবনা আল্লাহ্‌র মহামহিয়ান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারা লজ্জা ও অনুতাপের পত্র-পল্লবিত ছায়ায় বিচরণ করে। তারা স্বীয় আমল-নামাতে নিজেদের গুনাহ্ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর অনুতপ্ত ও বিনয়াবনত অন্তরে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তারা 'তাকওয়া' ও খোদাভীতির সিঁড়িতে আরোহণপূর্বক বুযুর্গীর উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার তিক্ততা তাদের নিকট মিষ্ট অনুভূত হয়। শক্ত বিছানা তাদের গাত্রে নরম ও মোলায়েম বোধ হয়। চরম-সাধনার ফলশ্রুতিতে তারা মুক্তি ও পরিত্রাণের রশি ধারণ করতে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের রূহ্ অতি উচ্চতায় ভ্রমন করে এবং নায-নে'আমতের সুশোভিত বাগিচায় বিচরণ করে। এভাবে তারা চরম ও পরম ইয্‌যতের মর্যাদায় চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত হয়।

অধ্যায় ঃ ১৮

স্নেহ-মমতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জান্নাতে কেবল দয়ার্দ্রচিত্ত লোকেরাই প্রবেশ লাভ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সকলেই তো দয়ার্দ্রচিত্ত।' হুযূর বললেন,—'কেবল নিজের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয় ; বরং প্রকৃত দয়া হচ্ছে, নিজের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অপরের প্রতিও দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।'

নিজের প্রতি দয়া ও রহম প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে,—সমস্ত পাপকার্য পরিহার করে খালেছ তওবা করতঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে আখেরাতের আযাব হতে আত্মরক্ষা করা। আর অপরের উপর রহম করার অর্থ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ -

'প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে, যার কথায় ও কাজে অপর কোন মুসলমান কষ্ট না পায় ; বরং তার দ্বারা সকলেই শান্তি পায়।'

শুধু মুসলমানই নয়, গোটা মানব বরং জীব-জন্তুর প্রতিও রহম করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে,—কোন পথিক কঠিন পিপাসায় পতিত হয়। একস্থানে একটি কুঁয়া দৃষ্টিগোচর হলে, তাতে নেমে সে পানি পান করে উপরে উঠার পর দেখে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিপাসার আতিশয্যে জিহ্বা বের করে রেখেছে। পথিক ভাবলো, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এটিরও তো অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। একথা ভেবে সে নিজের পা থেকে চামড়ার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা পথিকের এই কাজটিকে পছন্দ করলেন এবং তাকে মা'ফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! তা' হলে কি জীব-জানোয়ারের প্রতিও রহম করলে তাতে আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?' আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অবশ্যই, প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলা সওয়াব রেখেছেন।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গভীর রাত্রিতে একাকী ঘুরা-ফেরা করছিলেন। পথে এক জায়গায় মুসাফিরদের একটি কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। তাঁর আশংকা হলো, রাত্রিতে তাদের মাল-সামান চুরি না হয়ে যায়। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আউফের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন ঃ 'আমীরুল-মুমিনীন! এতো রাত্রিতে আপনি এখানে?' হযরত উমর বললেন ঃ 'আমি এই কাফেলার পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, আশংকা হলো, রাত্রিতে এরা ঘুমিয়ে যাবে, এই সুযোগে তাদের মাল-সামান চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, তাই চল, আমরা তাদের মাল-সামান পাহারা দেই।' অতঃপর কাফেলার নিকটবর্তী একটি স্থানে বসে উভয়েই তাদের মাল-সামান হেফাযতের জন্য সারারাত্রি পাহারা দিলেন। ফজরের সময় হযরত উমর আওয়ায দিলেন,—'ওহে কাফেলার লোকজন! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তোমরা উঠ।' যখন দেখলেন, তারা জাগ্রত হচ্ছে, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।'

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য অগণিত আদর্শ। সুতরাং আমাদের উচিত, তাঁদের অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

'(তাঁরা) নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' (ফাত্হ ঃ ২৯)

তাঁদের জীবনালেখ্যে লক্ষ্য করা যায়, শুধু মুসলমানই নয়, প্রতিটি সৃষ্ট-জীবের প্রতি তাঁরা ছিলেন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ-মমতাশীল। এমনকি বিধর্মী প্রজাদের প্রতিও তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেছেন।

একদা আমীরুল-মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) একজন বিধর্মী প্রজাকে দেখলেন, দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা করছে। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। হযরত উমর

তাকে বললেন ঃ 'আমি তোমার প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় ব্যবহারে ত্রুটি করছি ; যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তোমার নিকট থেকে কর (ট্যাক্স) ওসূল করেছি, আর এখন তোমার প্রতি আমি লক্ষ্য নিচ্ছি না। একথা বলে হযরত উমর (রাযিঃ) তার জন্য বায়তুল-মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-কে দেখি, উটের পিঠে আরোহণ করে সকাল সকাল 'আব্‌তাহ্' অঞ্চলে ঘুরাফেরা করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ 'বায়তুল-মালের একটি উট হারিয়ে গেছে, তা' তালাশ করছি।' আমি বল্‌লাম, 'হে আমীরুল-মুমিনীন! আপনি এভাবে কষ্ট করে পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব কঠিনতর করে দিয়ে যাচ্ছেন।' হযরত উমর বললেন ঃ 'হে আবুল হাসান (হযরত আলীর উপনাম)! মুহাম্মদকে নুবুওয়াত প্রদানকারী খোদার কসম, সাধারণ একটি বকরীর বাচ্চাও যদি ফুরাত নদীর তীরে চলে যায়, আর আমি সেটার হেফাযত না করি, তা'হলে ক্বিয়ামতের দিন এজন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।' অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলমান প্রজাসাধারণের হেফাযত করে না যেসব শাসক, যারা প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানে গাফেল, তাদের কোনই মূল্য নাই, কিছুতেই স্বীকৃতি দেওয়া যায় না তাদেরকে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমার উম্মতের আব্‌দাল বুযুর্গগণ নামায-রোযার আধিক্যের কারণে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না ; বরং তাঁরা বেহেশ্‌তে এজন্যে যাবে যে, তাঁদের অন্তর হবে নিষ্কলুষ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং তাঁদের হৃদয় হবে উদার, সকলের প্রতি তারা হবে দয়ার্দ্রচিত্ত ও সহানুভূতিশীল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ
يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ

'মহৎ ও দয়াশীল লোকদের প্রতি অনন্ত দয়াবান (আল্লাহ্) অনুগ্রহ করেন।

সুতরাং দুনিয়ার মাখ্লুকের প্রতি তোমরা দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তা'হলে ঊর্ধ্বজগতের সকলেই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, সে অন্য কারও দয়া পায় না। অনুরূপ যে অপরকে ক্ষমা করে না, সে কারও ক্ষমা পায় না।'

হযরত মালেক ইব্‌নে আনাস (রাযিঃ) বলেন,—রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের হক চারটি। এক, সৎ ও পুণ্যবান লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। দুই, পাপী ও অপরাধী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিন, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা। চার, পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তিকে ভালবাসা।'

একদা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছেন ঃ 'ইয়া রব্ব! আপনি আমাকে কোন্ বিষয়টির কারণে বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'আমার সৃষ্টির প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে।'

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তিনি শিশু-বাচ্চাদের পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত বন্দী পাখী খরিদ করে মুক্ত করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'হে পাখী! যাও দীর্ঘদিন বেঁচে থাক।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'মুসলমানদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ। দেহের যে-কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহটি পীড়িত হয়, জরাগ্রস্ত হয় এবং বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। অনুরূপ যে কোন একজন মুসলমানের দুঃখ-যাতনায় সকল মুসলমান জর্জরিত হবে।'

বনী ইসরাঈল গোত্রের একজন আবেদ লোক একটি জনপদ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় সেখানকার লোকজনকে দুর্ভিক্ষের কারণে কঠিন জঠর-জ্বালায় অস্থির দেখে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে মনে মনে আরজু-আকাংখা করেছিলেন,—'হায়! আজকে যদি আমার কাছে এদের ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ আটা থাকতো, তা'হলে আমি তৎসমুদয় এদেরকে দান করতাম, তারা তৃপ্ত হয়ে খেতো।' আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ

'তুমি তাকে জানিয়ে দাও, তার শুধু উক্ত আকাংখার কারণে আমি সেই পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি।' হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ -

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চাইতে উত্তম।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পথিমধ্যে ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়। তার এক হাতে ছিল মধু অপর হাতে ছিল ভস্ম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইবলীস বললো,—মধু আমি তাদেরকে পান করাই, যারা গীবত ও পরনিন্দা করে, আর ভস্ম আমি এতীমের মুখে মেখে থাকি, যাতে লোকজন তার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে অনুকম্পা প্রদর্শন না করে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'এতীমের প্রতি যখন জুলুম করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র আরশ তার কান্নার কারণে কাঁপতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—'হে আমার ফেরেশ্‌তারা ! দেখ, এই এতীমকে কে কাঁদাচ্ছে, যার পিতাকে আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اٰوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি এতীমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে, প্রতিদানে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দিবেন।'

'রওজাতুল-উলামা' কিতাবে আছে,—'হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে এক দুই মাইল পর্যন্ত লোক তালাশ করতেন, যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খানা খাবেন।'

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) কাঁদতে ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'আজকে এক সপ্তাহ যাবৎ আমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসে না। জানিনা, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা।'

হাদীস শরীফে আছে,—'যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করবে, জান্নাত

তার জন্য অবধারিত। আর যদি কেউ ক্ষুধার্তের সম্মুখ থেকে খাদ্যবস্তু সরিয়ে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে আপন করুণা সরিয়ে রাখবেন এবং তাকে দোযখের শাস্তি দিবেন।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ ـ

'মহৎ ও দানশীল লোক আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী, তারা জান্নাতেরও অতি নিকটে, সাধারণ লোকজনও তাদের ভালবাসে এবং দোযখ থেকে তারা বহু দূরে। পক্ষান্তরে, কৃপণ ও সংকীর্ণ-হৃদয় লোক আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, সর্বসাধারণও তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ; কিন্তু তারা দোযখের অতি নিকটবর্তী।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيْلِ ـ

'স্বল্প ইবাদতকারী দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি অধিক ইবাদতকারী কৃপণ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ।'

হাদীস শরীফে আছে,—'চার প্রকারের লোক ক্বিয়ামতের দিন বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে ঃ এক, যে আলেম স্বীয় ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। দুই, যে ব্যক্তি সর্ববিধ অশোভন কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে মুক্ত-পবিত্র থেকে হজ্জকার্য সমাধা করে। তিন, যে ব্যক্তি ইসলামের কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশে জিহাদ করে শহীদ হবে। চার, যে দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে এবং একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দ্বীনের পথে অর্থব্যয় করে। এসব লোক সমভাবে (বিনা হিসাবে) জান্নাতে

প্রবেশ করবে, কেউ কারও আগে যাওয়ার জন্য বিবাদ করবে না।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বহু বান্দাকে বিশেষভাবে প্রচুর নে'আমত দান করেছেন, উদ্দেশ্য হলো, এসব নে'আমতের দ্বারা অন্যান্য বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বঞ্চিত রেখেছেন, তারা উপকৃত হবে। সুতরাং এসব নে'আমতের ব্যাপারে যারা কৃপণতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে সেই নে'আমত অপসারণ করে অন্যের কাছে হস্তান্তর করে দিবেন।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'বস্তুতঃ দয়া ও মহত্ত্ব বেহেশ্‌তের একটি বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা সর্বদা পৃথিবীর দিকে নত হয়ে রয়েছে। এসবের যে কোন একটিকে যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, সে বেহেশ্‌তের পথে অগ্রসর হবে।'

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—এক ব্যক্তি আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি?' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ 'ধৈর্য ও দয়া।'

হযরত মিক্বদাম ইব্‌নে শুরাইহ্ পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার আল্লাহ্‌র রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' আল্লাহ্‌র রাসূল ইরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ

'মাগফিরাত তোমার জন্য অবশ্যম্ভাবী, যদি তুমি মানুষকে খাওয়া-দাওয়া করাও, সমাজে সালামের প্রচলন ঘটাও এবং লোকজনের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বল।'

অধ্যায় ঃ ১৯
নামাযে খুশু-খুজূ বা হুযূরে ক্বাল্‌ব

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্‌ সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আসমানে একজন অতি সম্মানিত ফেরেশ্‌তা দেখেছি, যিনি একটি পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট, চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাকে ঘিরে বসে আছে ; সকলেই তার খেদমতে নিয়োজিত। এ ফেরেশ্‌তার প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই সম্মানিত ফেরেশ্‌তা বর্তমানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় 'ক্বাফ পর্বতে' বসে বসে কাঁদছেন এবং তার সুন্দর ডানাগুলো ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আমাকে দেখে তিনি বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! তুমি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে?' আমি তার এ করুণ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,—'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রিতে আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন; তখন আমি তার অভিবাদনে না দাঁড়িয়ে পালঙ্কের উপরেই বসা ছিলাম। আমার এই অবহেলার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এ শাস্তি দিয়েছেন।' হযরত জিব্‌রাঈল বলেন ঃ 'অতঃপর আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করে সুপারিশ করলাম।' তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ঃ 'হে জিব্‌রাঈল! আমি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি সে আমার প্রিয় হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।' অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তা দরূদ শরীফের বদওলতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন।'

হাদীস শরীফে আছে,—'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হবে। নামায যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা' হলে অপরাপর আমলও গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তার নামাযের সঙ্গে অন্যান্য সকল আমলও প্রত্যাখ্যান করা হবে।' হাদীসে আরও আছে,—'বস্তুতঃ ফরয নামায হচ্ছে অন্যান্য সকল

আমলের জন্য মাপকাঠি স্বরূপ ; যার ফরয নামায পরিপূর্ণ থাকবে, তার অবশিষ্ট আমলও পরিপূর্ণ প্রতীয়মান হবে।' হযরত বুরাইদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নামায ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত, সুন্দর ও আদর্শ।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'দুই ব্যক্তি একই সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের রুকূ'-সিজদা দৃশ্যতঃ একই ; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যমীন ও আসমানের প্রভেদ থাকে।' বস্তুতঃ এ প্রভেদ নামাযে খুশু-খুজু ও হুযুরে ক্বাল্‌বের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ওইসব লোকের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি করবেন না, যারা নামাযের রুকূ'-সিজদায় কোমর সোজা করে না।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি নিয়মিত উযূ করে পরিপূর্ণ রুকূ'-সিজদা ও খুশু-খুজু সহকারে সঠিক সময়ে নামায আদায় করে, তার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়। কবুলিয়তের জন্য যখন ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ করতে থাকে, তখন তা' উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেখায় এবং বলতে থাকে,—'হে নামাযী! তুমি আমাকে যেমন হেফাযত করেছো, আল্লাহ্ পাকও তোমাকে হেফাযত করুন।' পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপূর্ণ উযূ, অপূর্ণ রুকূ'-সিজদা সহকারে অন্যমনস্ক অবস্থায় সঠিক সময়ের বাইরে নামায পড়ে, তার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না ; বরং তা' ঊর্ধ্বারোহণের সময় বিশ্রী কালো বর্ণ ধারণ করে এবং বলতে থাকে,—'খোদা তোমাকে ধ্বংস করুন, যেভাবে আমাকে তুমি ধ্বংস করেছো।' অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী এক জায়গায় পৌঁছলে সেই নামাযকে ছেঁড়া কাপড়ের মত গুজা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।'

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,—'নিকৃষ্টতম চোর হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে।'

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন,—'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে নিক্তি স্বরূপ ; যে ব্যক্তি পুরাপুরি পরিমাপ করবে সেই পুরাপুরি পাবে আর যে

ব্যক্তি মাপে ত্রুটি করবে, তার সতর্ক হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۝

'যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ।' (তাৎফীফ ঃ ১)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযের উদাহরণ হচ্ছে,—ব্যবসায়ী ব্যক্তির ন্যায় ; তাকে লাভবান হতে হলে যেমন, তার মূল পুঁজি সঠিক ও নিখুঁত হতে হয়, তেমনি আল্লাহ্র দরবারে নফল ও অতিরিক্ত ইবাদত কবুল হতে হলে ফরয নামায ও অন্যান্য ফরয ইবাদত নিখুঁত ও সঠিক হতে হয়।'

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামাযের সময় বলতেন,—চল, নামাযের দিকে চল ; স্বীয় পাপের দ্বারা তুমি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছো, নামাযের সাহায্যে তা' নির্বাপিত কর।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে,—

اِنَّمَا الصَّلٰوةُ تَمَسْكُنٌ وَّتَوَاضُعٌ

'বস্তুতঃ নামায হচ্ছে বিনয় ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায যাকে অশুভ ও গর্হিত কাজ হতে বিরত না রাখে, তার নামায তাকে খোদা তা'আলা হতে আরও দূরে সরিয়ে নেয়।'

তিনি বলেন,—'অবহেলিত নামায কখনো অশুভ ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখতে পারে না।'

আরও ইরশাদ হয়েছে,—

كَمْ مِّنْ قَائِمٍ وَّلَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا التَّعَبُ وَالنَّصَبُ

'অনেক নামাযী লোক রয়েছে, যারা শুধু নামাযের পরিশ্রমই করে থাকে, হাকীকত বলতে তাদের কিছুই হাসিল হয় না।' অর্থাৎ,—গাফেল নামাযীদের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বান্দা

নামাযের যতটুকু অংশ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও উপলব্ধি সহকারে আদায় করে, ততটুকু অংশেরই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে ; অতিরিক্ত নয়।'

আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয়–প্রাপ্ত আরিফগণ বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে নামায পরিপূর্ণ হয়। এক, যথার্থ উপলব্ধি ও মনোযোগ সহকারে নামায আরম্ভ করা। দুই, লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে দাঁড়ান। তিন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নামায আদায় করা। চার,ভয় ও আশংকা সহকারে নামায সমাপ্ত করা।' এক বুযুর্গ বলেছেন,—'যে নামাযে আল্লাহ্র সম্মুখে নিজের বিনয় ও বন্দেগীর বিকাশ না হয়, মূলতঃ সেই নামায দুরস্ত হয় না।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'বেহেশ্তে 'আল–আফ্যাহ্ (প্রশস্ত)' নামক একটি ঝর্ণা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঝর্ণার ধারে বেহেশ্তবাসীদের উপভোগের জন্য যাফরান দ্বারা অসংখ্য 'যাফরানী হূর' সৃষ্টি করে রেখেছেন। এরা মুক্তার দানা ও পদ্মরাগ মনির দ্বারা খেলা–ধূলা করে এবং সত্তর হাজার ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণ–কীর্তন করে। তাদের কণ্ঠস্বর হযরত দাউদ (আঃ)–এর কণ্ঠস্বরের চাইতেও বেশী আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর। তারা বলে,—'আমরা ওইসব লোকের জন্য যারা খুশু–খুজু ও হুযূরে ক্বল্বের সাথে নামায আদায় করে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,—অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাত দান করবো এবং আমার দীদার নসীব করবো।'

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন,—'হে মূসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ করো এবং আমার যিক্রে মগ্ন হও, তখন তোমার বাহ্যিক অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যেন অকেজো ও অবসাদ–গ্রস্ত হয়ে যায় আর অন্তর যেন নিষ্ঠা, একগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্বের দ্বারা আবাদ হয়ে যায়। অনুরূপ যখন তুমি আমার যিক্রে মগ্ন হও, তখন তোমার জিহ্বাকে অন্তরের পশ্চাতে রাখ, আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন নেহায়েত বিনয়ের সাথে দাসানুদাসের ন্যায় থাক। ভীত–শঙ্কিত অন্তঃকরণ এবং মিথ্যার কলুষ হতে মুক্ত জিহ্বার দ্বারা মোনাজাত কর।'

রেওয়ায়াতে আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)–এর নিকট (আরও) ওহী পাঠিয়েছেন,—'হে মূসা! তোমার উম্মতের অবাধ্যদের বলে দাও, তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি আমার নিজের

সত্তার কসম করেছি যে, আমাকে যে স্মরণ করবে আমি তাকে স্মরণ করবো ; কিন্তু অবাধ্য ও না-ফরমান লোকেরা যদি তওবা না করে আমাকে স্মরণ করে বা যিক্‌রে মগ্ন হয়, তা' হলে আমি তাদেরকে লা'নত ও অভিশাপের সাথে স্মরণ করবো।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত অভিশাপের সম্পর্ক ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্‌র না-ফরমান বটে ; কিন্তু তাঁর স্মরণ হতে গাফেল নয়। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফলতি ও অবাধ্যতা উভয়টা একত্রিত হলে, অবস্থা আরও কত মারাত্মক রূপ ধারণ করবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলেছেন যে, 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তির নামায যেরূপ হবে ; খুশু-খুজু, হুযূরে ক্বাল্‌ব ও স্বাদ-আস্বাদের দৃষ্টিতে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেই অনুপাতে আরাম-আয়াশে হাশরের ময়দানে উঠাবেন।'

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দাড়ি সঞ্চালন করছে। তখন তিনি বলেছেন যে, এই ব্যক্তির অন্তরে যদি খুশু-খুজু ও হুযূরে ক্বাল্‌ব থাকতো, তা' হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকতো। বস্তুতঃ যে নামাযে খুশু-খুজু থাকে না, সেই নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না।' এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌বের প্রশংসা করেছেন।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ 'নামাযী লোকের অভাব নাই ; কিন্তু মনোযোগ ও হুযূরে ক্বাল্‌ব সহকারে নামায পাঠকারী খুবই কম। হজ্জ্ব পালনকারী বহু আছে ; কিন্তু হজ্জ্বে মাব্‌রূর ক'জন করেছে ; দুনিয়াতে বহু রকমের পাখী আছে ; কিন্তু বুলবুল পাখী খুবই বিরল।'

বস্তুতঃ বিনয় ও একাগ্রতা প্রকাশের জন্য নামাযের চেয়ে উত্তম বস্তু আর নাই। এই বিনয় ও একাগ্রতার দ্বারা নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবূলিয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। নতুবা যে নামাযে একাগ্রতা ও হুযূরে ক্বাল্‌ব নাই, তা' হয় কেবল দায়সারা নামায ; ফরযিয়তের দায়িত্ব চুকানোর জন্য তা' হয়ে থাকে। এরূপ নামাযের দ্বারা কবূলিয়তের মর্যাদা লাভ হয় না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً فِيْهِمَا عَلَى اللّٰهِ بِقَلْبِهٖ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে পুরাপুরি রুজু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, সে পাপ থেকে এমন মুক্ত ও পবিত্র হবে, যেমন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু।'

এ কথা স্মরণ রেখো যে, নামাযের ভিতর আজে-বাজে খেয়াল ও অহেতুক বিষয়ের চিন্তা আসলে নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাফলতি ও অন্যমনস্কতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব খেয়াল ও চিন্তাকে দূর করার নিয়ম হলো,—শোরগোল থেকে দূরে কিছুটা অন্ধকারে নামায পড়া চাই। পরিহিত পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকা চাই না, অথবা এমন পোশাক পরিধান করে নামায পড়া চাই, যার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কেননা লেবাসের চাকচিক্যের প্রতি দৃষ্টি পড়লে নামাযের খুশু-খুজূ অক্ষুন্ন থাকতে পারে না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ জাহ্‌মের দেওয়া একখানি সুন্দর ও চমৎকার চাদর পরিধান করে নামায পড়েছেন; কিন্তু নামায শেষ করার পর তৎক্ষণাৎ তা' খুলে ফেললেন এবং বললেনঃ 'তোমরা এ চাদরখানি আবূ জাহ্‌মকে ফেরৎ দাও, কেননা, এটা আমাকে নামাযের ভিতর অনেকটা অন্যমনস্ক করে ফেলেছে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন তার জুতার নতুন 'তস্‌মা' পরিবর্তন করে পুরাতন 'তস্‌মা' লাগিয়ে দেওয়া হয়।' এর কারণ ছিল, নামাযের সময় নতুন তস্‌মার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নামাযের একাগ্রতা ও খুশু-খুজূ নষ্ট হয়ে যায়।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসা ছিলেন, স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে তার অঙ্গুলিতে যে আংটি ছিল, তা' তিনি খুলে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন,—এটি আমাকে আল্লাহ্ থেকে প্রায় অন্যমনস্ক করে ফেলে। আবার কখনও আমার দৃষ্টি এটার উপরে

পড়ে, আবার কখনও তোমাদের উপর। অর্থাৎ,—তোমাদের সাথে কথা বলার জন্যেও একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হতে পারছি না।

হযরত আবু তাল্‌হা (রাযিঃ) একদা তার নিজস্ব একটি বাগানে নামায আদায় করছিলেন। বাগানটি ছিল খুবই উন্নত, তাতে ফলের বৃক্ষ ছিল খুবই ঘন ঘন। হঠাৎ একটি পাখী বাগানে আটকা পড়ে বাইরে যাওয়ার পথ তালাশ করছিল ; কিন্তু ঘন বৃক্ষের কারণে সম্ভব হচ্ছিল না। হযরত আবু তাল্‌হার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ভুলে গেলেন যে, কত রাকাত নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলাম, আপনি যে কাজে ভাল মনে করেন এটিকে ব্যবহার করুন।'

আরও এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে,—তাঁর প্রচুর খেজুরবৃক্ষের একটি বাগান ছিল। প্রতিটি বৃক্ষে পাকা খেজুর ধরেছিল। একদা নামাযের সময় বাগানের মালিকের দৃষ্টি সেদিকে যাওয়ায় তিনি নামাযের রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছেন ; অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর নিকট হাজির হয়ে গোটা বাগান আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং হযরত উসমানকে বললেন,—'আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন, এ বাগানটিকে দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করুন। অতঃপর হযরত উসমান বাগানটিকে পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি করে দ্বীনের কাজে লাগিয়েছেন।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'নামাযের ভিতর এ চারটি কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় ঃ এক, নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া। দুই, নামাযরত অবস্থায় মুখমণ্ডলে হাত বুলানো। তিন, কঙ্কর সরানো। চার, মানুষের আসা–যাওয়ার পথকে সম্মুখে রেখে নামায আরম্ভ করা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلٌ عَلَى الْمُصَلِّيْ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ـ

'নামাযরত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।'

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন মনে

হতো যেন একটি প্রোথিত স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে।' কোন কোন সাহাবীর নামাযের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রুকূ'তে যেতেন, তখন এমন অনড় ও শান্ত হতেন, যেন পাখীরা জড়-পাথর মনে করে তাদের পিঠের উপর এসে বসে পড়বে। বস্তুতঃ শরীয়তের হুকুম ছাড়াও সরল স্বভাব ও যুক্তির তাগিদও তাই ; পার্থিব রাজদরবারে উপস্থিত হলে যদি সুশান্ত ও বিনয়ী থেকে সেই দরবারের যথার্থ মর্যাদা পালন করা হয়, তা' হলে মহান রাব্বুল-আলামীনের পবিত্র দরবার সেজন্য অধিকতর যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে আছে,—'হে আদম সন্তান! আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মান হও, তখন বিনয়ের সাথে এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। কেননা আমি আল্লাহ্ তোমার প্রভু ; আমি তোমার অন্তর থেকেও তোমার অধিক নিকটবর্তী।'

একদা হযরত উমর (রাযিঃ) মিম্বরে বসে জনসমক্ষে বক্তব্য রেখে বলেছেন, বহু লোক এমন রয়েছে, যারা ইসলামের উপর জীবন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে ; তবুও তারা নিজেদের নামায ঠিক করতে পারে নাই। অর্থাৎ,—খুশু-খুজু ও হুযূরে কাল্‌বের অভাবে নামাযে তারা প্রাণবন্ততা আনতে পারে নাই।

হযরত আবুল-আলিয়া (রহঃ)-কে নিম্নের এ আয়াতটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

'যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে খবর।' (মাউন ঃ ৫)

তিনি বলেছেন ঃ অত্র আয়াতে ওইসব লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা নিজেদের গাফিলত ও অমনোযোগের কারণে নামাযে রাকাতের সংখ্যা ভুলে যায় ; স্মরণ থাকে না যে, দুই রাকাত পড়েছে কি তিন রাকাত।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে ওইসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা গাফলতি করে নামাযের সময় পার করে দেয় ; 'সাহূন' শব্দটির এটাই মর্ম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لاَ يَنْجُوْ مِنِّىْ عَبْدِىْ اِلاَّ بِاَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ -

'বান্দার উপর আমি যেসব ইবাদত ফরয করেছি, সেগুলো আদায় না করা পর্যন্ত সে আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে না।'

অধ্যায় ঃ ২০

গীবত ও চুগলখোরী

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গীবত ও পরনিন্দার দোষ ও ক্ষতিকর হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। গীবতকারী ব্যক্তিকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশ্‌ত ভক্ষণকারীর সাথে উপমা দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط

'তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।' (হুজুরাত ঃ ১২)

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

'এক মুসলমানের হক বিনষ্ট করা অপর মুসলমানের উপর হারাম— রক্তপাত করা, সম্পদ লুণ্ঠন করা, অপমান করা সবই হারাম।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا.

'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।'

গীবতের উক্তরূপ জঘন্যতার কারণ হচ্ছে,—মানুষ ব্যভিচার করে আল্লাহ্‌র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা' কবুল করেন। কিন্তু গীবত হচ্ছে হক্কুল-এবাদ ; বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে পাপীর এই পাপ

মোচন হবে না। গীবতকারী ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে,—যেমন কোন ব্যক্তি তোপ বা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে চতুর্দিকে গোলা-বারুদ ছুঁড়ছে। বস্তুতঃ এভাবেই সে স্বীয় পুণ্য ও নেক আমলকেও ধ্বংস করছে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আগুনের দহনে তার অন্তর গীবতের কলুষ হতে বিমুক্ত না হয়।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমনসব কথাবার্তা বলা, যেগুলো শুনলে সে অপছন্দ করবে।' এসব দোষচর্চা সে ব্যক্তির দেহ, বংশ, কথা, কাজ, ধর্ম, দুনিয়া, আখেরাত, এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আরোহণের জন্তুর সাথে সম্পর্কিত হলেও তা' গীবত বলে পরিগণিত হবে।

আদর্শ পূর্বসূরীদের একজন বলেছেন,—যদি এ কথা বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির গায়ের পোশাকটি লম্বা অথবা খাটো, তা' হলে এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য করা হবে। অতএব ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে এতটুকু বলার দ্বারা যদি গীবত হয়, তা' হলে স্বয়ং ব্যক্তির দোষচর্চা ও সমালোচনা করা কত জঘন্য ও মারাত্মক হবে!

বর্ণিত আছে,—একদা বেটে একজন মহিলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোন প্রয়োজনে উপস্থিত হয়। প্রয়োজন শেষে মহিলা বিদায় নেওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, 'মহিলাটি কি বেটে!' হুযূর বললেন ঃ 'হে আয়েশা! এ দ্বারা তুমি সেই মহিলার গীবত করলে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কারণ, গীবতের ভিতর তিনটি মারাত্মক আপদ রয়েছে ঃ এক, গীবতকারী ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় না। দ্বিতীয়, তার কোন নেক আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তৃতীয়, তাকে অসংখ্য পাপরাশির বোঝা বহন করতে হয়।'

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন চুগলখোর ব্যক্তির অবস্থা নিকৃষ্টতম হবে, দুনিয়াতে সে কিছু লোকের কাছে এক প্রকার বলতো, অন্যদের কাছে সে পূর্বের বিপরীত বলে

ফেতনা সৃষ্টি করতো—এ ধরণের দু'মুখা লোকদের শাস্তিস্বরূপ তাদের দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ۔

'চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বহু মাখ্লুক সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে জিহ্বা দিয়েছেন ; তন্মধ্যে কিছু এমন যারা বুঝিয়ে বলতে পারে আর কিছু পারে না ; কিন্তু মাছের মুখে কোন জিহ্বা নাই—এর কারণ কি? উত্তর,—এর কারণ হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার পর ফেরেশ্তাদের হুকুম করলেন তাকে সিজদা করতে। তখন এক ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর সে সমুদ্রের দিকে গমন করে। সেখানে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় মাছের সাথে। মাছকে আদম সৃষ্টির সংবাদ শুনিয়ে ইবলীস বললো,—'তিনি সমুদ্র এবং স্থলভাগের প্রাণীদেরকে শিকার করবেন।' ইবলীসের মুখে এ কথা শুনে মাছ সমুদ্রের অপরাপর প্রাণীদেরকে উক্ত সংবাদ জানিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মৎস্যকে জিহ্বা থেকে বঞ্চিত করে দেন।

হযরত আমর ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক মদীনাবাসী লোকের এক ভগ্নি মদীনার অদূরেই এক জনপদে বাস করতো। একদা ভগ্নি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পর থেকে সে প্রতিদিন সেবা-শুশ্রূষার জন্য ভগ্নির খেদমতে হাজির হতো। একদিন হঠাৎ সেই ভগ্নি মারা যায়। মৃত্যুর পর তাকে যথারীতি দাফন করা হয়। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে আসলো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। প্রতিবেশী একজনের সহযোগিতায় থলিটি উঠিয়ে নেওয়া হয় ; কিন্তু তখন তারা প্রত্যক্ষ করে যে, কবরের ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভাই তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে মা'কে ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা' বললো,—তোমার বোন পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনে অন্যদের

কাছে সে কথা পৌঁছিয়ে চুগলখোরী করতো।' একথা শুনে ভাই বুঝতে পারলো,—কবরে ভগ্নির আযাব কেন হচ্ছে। অতএব যে ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সে যেন কখনও গীবত ও চুগলখোরীতে লিপ্ত না হয়।

একদা হযরত আবুল্লাইস বুখারী (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশে সফরে বের হলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর দু'টি মাত্র দেরহাম। তিনি কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন,—'হজ্জের এই পবিত্র সফরে বাড়ীতে ফেরা পর্যন্ত সময়ের কোন এক মুহূর্তেও যদি আমি দোষ-চর্চায় লিপ্ত হই, তা' হলে অবশ্যই আমি উক্ত দুই দেরহাম আল্লাহ্র রাস্তায় খয়রাত করে দিবো।' তাঁর প্রতিজ্ঞা এতোই দৃঢ় ছিল যে, তিনি হজ্জের সম্পূর্ণ সফর সূচারুরূপে সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এলেন এবং তাঁর দেরহাম দু'টি পকেটেই রয়ে গেল। অর্থাৎ,—এই দীর্ঘ সফরে তিনি কারও গীবতে লিপ্ত হন নাই। হযরত ইব্নে দীনারকে গীবতের ব্যাপারে উক্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস যে, একশতবার ব্যভিচার করা যত জঘন্য, একবার গীবত করা তার চাইতে অধিকতর জঘন্য।

আবু হাফ্স কবীর (রহঃ) বলেন,—'এক রমযান মাস রোযা না রাখা এতটুকু জঘন্য নয়, যতটুকু জঘন্য একজন লোকের গীবত করা।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন আলেম বা ধর্মজ্ঞানী লোকের গীবত করবে, সে কিয়ামতের দিন এভাবে উত্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে লেখা থাকবে ঃ 'এ ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন,—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিলাম, যারা (মর্মান্তিক শাস্তিস্বরূপ) নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা আঁচড়াতে ছিল এবং গলিত পচা লাশ ভক্ষণ করছিল। জিব্রাঈলকে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন ঃ 'এরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশ্ত ভক্ষণ করতো।'

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন,—'দেহের জন্য দুম্বল (মারাত্মক ফোঁড়া) যতটুকু ক্ষতিকর, মু'মিন ব্যক্তির জন্য অপরের গীবত করা তদপেক্ষ বহুগুণ

বেশী ক্ষতিকর।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন,—'মানুষের অবস্থা এই যে, অন্যের দোষ দেখতে গিয়ে কারও চোখে যদি সামান্য কণা পড়ে, তাও বড় আকারে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু নিজের বেলায় বৃক্ষকাণ্ডটিও ছোট করে দেখা হয়।'

এক সফরে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত উমর ও আবু বকরের সঙ্গে ছিলেন এবং প্রয়োজনে তিনিই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেন। এক স্থানে পৌঁছার পর হযরত সালমান খানার প্রয়োজন দেখা তিনি রন্ধন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে খাওয়ার কিছু নিয়ে আসতে হযরত সালমানকে পাঠালেন ; কিন্তু সেখানেও কিছু ছিল না। তখন হযরত আবু বকর ও উমর মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'সে যদি কোন কুঁয়ার ধারেও যায়, তবুও সেটাকে শুষ্ক পাবে।' এ কথার উপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .... فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

'তোমাদের কেউ কারও গীবত করো না........। (হুজুরাত ঃ ১২)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও (গীবত করে তার) গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্মুখে গীবতকৃত ব্যক্তির গোশ্‌ত পেশ করে বলা হবে, 'এই নাও দুনিয়াতে যার জীবিত অবস্থায় গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছিলে, এখন তার মৃতদেহের গোশ্‌ত ভক্ষণ কর।' অতঃপর তাকে এই পচা গোশ্‌ত খেতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا (তোমরা কেউ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার মাংস খেতে পছন্দ করবে?)

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব করা যেতো, কারণ তখন গীবতের অস্তিত্ব ছিল খুবই কম। কিন্তু এখনকার সময় গীবতের প্রাদুর্ভাবের কারণে লোকজন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে, এর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যেমন কোন

অনভ্যস্ত ব্যক্তি চামড়ার গুদামে গমন করে, তা'হলে দুর্গন্ধের কারণে সেখানে কিছু সময়ও অবস্থান করতে পারে না ; কিন্তু চামড়া শুষ্ককারী ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা চামড়ার উপর বসে খাওয়া–দাওয়া করছে, তবুও অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভব করছে না, গীবতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন,—আমি কোন আসমানী গ্রন্থে পড়েছি ঃ 'গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করে মারা যায়, তবুও সে সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায়, তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীদের মধ্যে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।' (হুমাযাহ ঃ ১)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদের শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ। 'হুমাযাহ' অর্থ,— অসাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী আর 'লুমাযাহ্' অর্থ,—সাক্ষাতে নিন্দাবাদকারী।

উপরোক্ত আয়াতখানি ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে নিন্দাবাদ করতো। আয়াতখানি যদিও এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে ; কিন্তু এর উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা গীবত থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাক ; পুরাপুরিভাবে তা' পরিহার কর, কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য। কারণ, ব্যভিচারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন ; কিন্তু গীবতের জন্য গীবতকৃত ব্যক্তির মার্জনা ব্যতীত আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। অতএব, গীবত করে থাকলে প্রথমতঃ বান্দার নিকট থেকে মাফী হাসিল করা উচিত, সেই সঙ্গে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা করা চাই, যাতে আল্লাহ্‌র হুকুমের অমান্যতাও মাফ হয়ে যায়। তাহলেই পূর্ণ মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তির চেহারা পিছন দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

গীবতকারী ব্যক্তির উচিত,—মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তওবা ও এস্তেগফার করা, যাতে যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে নিন্দাবাদ পৌছার পূর্বাহ্নেই তওবা হয়ে যায় ; এভাবে তার তওবা শীঘ্র কবুল হবে। অন্যথায় বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত তার এই অপরাধ ক্ষমা হবে না।

অনুরূপ যদি কেউ কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তা'হলে কেবল তওবা করলেই গুনাহ্ মোচন হবে না, যাবৎ সেই মহিলার স্বামী তাকে ক্ষমা না করবে।

অনন্তর নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ যদি কেউ পরিহার করে থাকে, তা'হলে তা' থেকে তওবা করতে হবে এবং সেইসঙ্গে অতীত জীবনের পরিত্যক্ত সবগুলোকে ক্বাযা করতে হবে, তবেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমার আশা করা যেতে পারে।

অধ্যায় ঃ ২১
যাকাতের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

'যারা যাকাত দান করে থাকে (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)।'
(মু'মিনূন ঃ ৪)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিকের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর সে যদি যাকাত প্রদান করতঃ সম্পদের হক আদায় না করে, তা'হলে ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদ একত্র করে আগুনের পাত বানানো হবে এবং সেই পরিমাণে তার শরীরকে প্রশস্ত করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা সেই পাতকে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন পুনরায় উত্তপ্ত করে অনুরূপ দাগ দেওয়া হবে এবং এভাবে উপর্যুপরি এক দিবস হতে থাকবে, যে দিবসটির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছরকাল হবে। অতঃপর হিসাব-কিতাব শুরু হবে এবং নিজ প্রাপ্য স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা' উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে,) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।' (তওবা ঃ ৩৪, ৩৫)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'কিয়ামতের দিন ধনী লোকদের ধ্বংস ও আফসূসের সীমা থাকবে না, যাদের উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও গরীব-মিসকীনের হক তারা নষ্ট করেছে।' হকদার গরীব ও ফকীর মিসকীনরা সেদিন আল্লাহ্র দরবারে নালিশ করে বলবে,—'এরা আমাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আপনার আরোপিত ফরয পরিত্যাগ করে আমাদের উপর জুলুম করেছে।' আল্লাহ্ বলবেন,—'আমার সম্মান ও প্রতাপের কসম, আমি তাদের থেকে অবশ্যই তোমাদের হক আদায় করবো এবং তাদেরকে আমার রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবো।' অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

'এবং যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (তারা মুক্তি পাবে)।' (মা'আরিজ ঃ ২৪,২৫)

রেওয়ায়েতে আছে,—হুযূর সাল্লাল্লাহু মি'রাজের রাত্রিতে জঘন্য শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে ছেঁড়া ও জীর্ণ কাপড়ের টুকরা লাগিয়ে রাখা হয়েছে, চতুষ্পদ জানোয়ারের মত জাহান্নামের উত্তপ্ত গরম ও কন্টকপূর্ণ জঙ্গলে তারা চরছে। আল্লাহ্র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা ওইসব লোক যারা যাকাত আদায় করতো না ; অথচ তাদের উপর যাকাত ফরয ছিল ; বস্তুতঃ এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করেন নাই ; তিনি জুলুম হতে পবিত্র।

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী তাবেয়ী যুগের কয়েকজন বুযুর্গ হযরত আবূ সিনান (রাযিঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত হোন। পরক্ষণেই তিনি বললেন,—'চলুন, আমাদের একজন প্রতিবেশীর ভাইয়ের ইনতেকাল হয়েছে ; তার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে আসি।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বুযুর্গ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ ফিরয়াবী বলেন ঃ 'অতঃপর আমরা সকলেই যখন সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম, তখন সে সজোরে চিৎকার করে বিলাপ করছিল—মনে হচ্ছিল যে দুঃখে তার কলিজা ফেটে যাবে। আমরা সকলেই তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রবোধ দিচ্ছিলাম ; কিন্তু সে শান্ত হচ্ছিলো না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—'তুমি কি জানো না? মৃত্যু সকলের জন্য এক অবধারিত সত্য, তারপরেও তুমি এভাবে রোদন করছো কেন?' সে বললো,—'অবশ্যই আমি তা' জানি ; কিন্তু আমার ভাইয়ের দিবা–রাত্রি অবিরত আযাব হচ্ছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এ বিষয়ে তুমি কি করে জানলে? সে বললো,—'আমার ভাইকে দাফন করার পর সকলেই কবরের পার্শ্ব থেকে চলে যায় ; কিন্তু আমি একাকী সেখানে বসেছিলাম, হঠাৎ কবরের ভিতর থেকে আওয়ায আসলো,—'হায়! সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলো ; আমাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ; অথচ আমি নিয়মিত নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি।' একথা শুনে আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। তৎক্ষণাৎ কবরের উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেখি,—ভিতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং ভাইয়ের গলদেশে আগুনের বেড়ী লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ভাইয়ের কষ্টে অস্থির হয়ে সমবেদনায় আমি তার গলদেশ থেকে আগুনের বেড়ীটি খুলে ফেলার জন্য হাত বাড়ালাম, সাথে সাথে আমার অঙ্গুলি ও হাত পুড়ে গেল ; এই দেখুন অবস্থা।' আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করলাম, আগুনে দগ্ধ হয়ে তার হাত কালো হয়ে গেছে। সে আরও বলতে লাগলো,—তারপর অপারগ হয়ে কবরে পুনরায় মাটি দিয়ে আমি ফিরে আসলাম। এখন আপনারাই বলুন, আমি কেন রোদন করবো না? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার ভাই দুনিয়াতে এমন কি পাপ করতো? সে বললো,—'আমার ভাই দুনিয়াতে মাল–সম্পদের যাকাত দিতো না।' আমরা বললাম,—এক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এমন ধারণা না করে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৮০)

আর তোমার ভাইকে ক্বিয়ামতের পূর্বেই আযাব দিয়ে শেষ করে নেওয়া হচ্ছে। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করে সাহাবী হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা উল্লেখপূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মৃত্যুর পর আমরা এ ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি না ; অথচ মুসলমানের ব্যাপারে তা প্রত্যক্ষ করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ ইহুদী-খৃষ্টানদের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ; সেজন্যে ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে কদাচিৎ এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সতর্ক করেন এবং শিক্ষা প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

'অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।'

(আন'আম ঃ ১০৪)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, তারা যদি যাকাত আদায় না করে, তা' হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারা ইহুদী-নাসারাদের পর্যায়ভুক্ত, অনুরূপ যারা 'উশর' বা উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ প্রদান করে না তারা মজূসী তথা অগ্নিপূজকদের পর্যায়ভুক্ত। আর যারা উভয় প্রকারের কোনটাই আদায় করে না, তারা ফেরেশ্তা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

অভিশপ্ত। তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) আরও বলেন ঃ সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে যাকাত ও উশর প্রদান করে ; কিয়ামতের দিবস তার কোন প্রকার শাস্তি হবে না। কবরের আযাব তার মাফ হয়ে যাবে, তার দেহ জাহান্নামের উপর হারাম করে দেওয়া হবে, বিনা হিসাবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিবস তার কোনরূপ পিপাসা দেখা দিবে না।

অধ্যায় ঃ ২২

জেনা বা ব্যভিচার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

'এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, (তারা সফলকাম হয়ে গেছে)। (মু'মিনূন ঃ ৫)

অর্থাৎ,—নিজেদের লজ্জাস্থানকে যারা (অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলী হতে সংরক্ষণ করে, তারা সফলকাম।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج

'নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।'

(আন'আম ঃ ১৫১)

অর্থাৎ,—সর্বপ্রকার অশ্লীল ও লজ্জাকর কাজ থেকে দূরে থাক। চাই সেটা বড় হোক কিংবা ছোট ধরণের হোক যেমন জেনা–ব্যভিচার, পর মহিলাকে চুম্বন করা, তাকে স্পর্শ করা, তার প্রতি কামাতুর দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'মানুষের হাত, পা এবং চোখের দ্বারাও জেনা হয়।' তাই আল্লাহ্ পাক হুকুম করেছেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط

'মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের

যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে।' (নূর ঃ ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্বীয় চোখের সাহায্যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সংযত থাকে। অনুরূপ লজ্জাস্থানকে সর্ববিধ গর্হিত ও অশ্লীল ক্রিয়া-কর্ম থেকে হেফাযত করে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকখানি আয়াতে জেনা ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

'যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।' (ফুরকান ঃ ৬৮)

অর্থাৎ,—এহেন লোকদেরকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। 'আছাম' জাহান্নামের একটি অংশের নাম। কেউ কেউ বলেছেন,—'আছাম' হচ্ছে জাহান্নামের একটি গহ্বর ; যখন এর মুখ খোলা হয়, তখন দোযখবাসীরা সেই গহ্বরের দুর্গন্ধে দিশাহারা হয়ে বিকট আওয়াযে চিৎকার করতে থাকে।

এক সাহাবী বলেন ঃ 'তোমরা সর্বদা জেনা থেকে পরহেয কর এবং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা, জেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি ছয় প্রকার আপদ ও ক্ষতিতে পতিত হয়। তন্মধ্যে তিন প্রকার দুনিয়াতে এবং অপর তিন প্রকার আখেরাতে। দুনিয়ার তিন প্রকার হচ্ছে,—এক, রোযী-রোযগারে অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়, আয়ু কমে যায় অথবা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা নসীব হয় না। তৃতীয়, চেহারা কালো হয়ে যায়। অপর তিন প্রকার আপদ—যা আখেরাতে দেখা দিবে তা' হলো,—এক, আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত থাকবেন। দ্বিতীয়, হিসাব-নিকাশে কঠোরতা করা হবে। তৃতীয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরজ করেছিলেন,—'ইয়া রব্ব্! ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি কি?' আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাকে আগুনের এমন একটি পোষাক পরিয়ে দেওয়া হবে, যদি সেই পোষাক কোন বিরাটকায় পর্বতের উপর রাখা হয়, তা' হলে সেই পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

কথিত আছে, ইবলীস শয়তান একজন অসতী মহিলাকে এক হাজার

অসৎ পুরুষ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে।

'আল-মাসাবীহ' গ্রন্থে আছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ وَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهٖ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ۔

'যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে আসে এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে ; অতঃপর যখন সে উক্ত অপকাজ হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে।'

'আল-ইকনা' কিতাবে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্র নিকট মানুষের এর চাইতে বড় গুনাহ্ আর হতে পারে না যে, সে এমন কোন গর্ভাশয়ে বীর্যপাত করবে, যা তার জন্য বৈধ ও হালাল নয়।'

এর চাইতে অধিকতর জঘন্য অপরাধ হলো, সমকামিতা বা পুং মৈথুন। হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সমকামিতায় লিপ্ত হবে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না ; অথচ পাঁচ বছরের দূরত্ব হতেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাযিঃ) একদা আপন গৃহের দরজার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমন সময় সুন্দর সুশ্রী একটি বালকের উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন,—কিহে, সেই ফেতনা কি এখনো আছে, না চলে গেছে? আরজ করা হলো, 'চলে গেছে।' অতঃপর তিনি দরজা খুলে বাহিরে আসলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো,—' হে আবদুল্লাহ! আপনি কি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূলের পবিত্র যবানে কোন হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ 'খবরদার! এ বয়সের বালকদের প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, তাদের সাথে কথা বলা হারাম, তাদের সাথে উঠা-বসাও হারাম।'

কাজী ইমাম (রহঃ) বলেছেন,—আমি এক বুযুর্গকে বলতে শুনেছি যে, একজন স্ত্রীলোকের সাথে শয়তান থাকে একটি ; কিন্তু একজন বালকের সাথে শয়তান থাকে আঠারোটি।'

বর্ণিত আছে,—যে ব্যক্তি কোন বালককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচশত বছর পর্যন্ত শাস্তি দিবেন। আর কোন স্ত্রীলোককে কামাতুর হয়ে চুম্বন করা সত্তরজন কুমারীকে ধর্ষণ করা অপেক্ষাও জঘন্য। অনুরূপ যদি কেউ একজন কুমারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা' হলে সে যেন সত্তর হাজার বিবাহিতা মহিলার সাথে জেনা করলো।'

'রওনাকুত্-তাফাসীর' গ্রন্থে ইমাম কাল্বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—সর্বপ্রথম লূত জাতির অপকর্মটির (পুং মৈথুন) সূচনা করেছে চির অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান। সে একটি সুন্দর-সুশ্রী কিশোর বালকের আকৃতি অবলম্বন করে লূত জাতির কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর তারা ইবলীসের সাথে সর্বপ্রথম কুকর্মে লিপ্ত হয়। তারপর থেকে প্রত্যেক নবাগত মুসাফিরের সাথেই তাদের উক্ত কর্ম চলতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য হযরত লূত আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করেন তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে উক্ত কুকর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন এবং একনিষ্ঠ চিত্তে এক আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন, কিন্তু তারা বিরত হয় নাই। অতঃপর হযরত লূত তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ও গজবের ভয় প্রদর্শন করেন। তাতেও অসভ্যরা সেই কর্ম থেকে বিরত না হয়ে বরং আল্লাহ্র নবীকে বলতে লাগলো ঃ 'তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাক, তা' হলে আমাদের উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল করে দেখাও।' অবশেষে হযরত লূত আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

'প্রভু! আমাকে এই দুর্বৃত্ত জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।'

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে হুকুম করলেন লূত জাতির উপর পাথর বর্ষণ করতে। প্রতিটি পাথরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। কুরআনের

ভাষা مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ এর মর্ম এটাই। এভাবে প্রচণ্ড পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

বর্ণিত আছে, লূত জাতির উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে তাদের একজন লোক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মক্কায় গমন করেছিল। আল্লাহ্র গজবের নির্ধারিত একটি পাথর সেই লোকটিকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার হেরেম শরীফে উপস্থিত হয়; কিন্তু হেরেমের সংরক্ষক ফেরেশ্তাগণ পাথরটিকে এই বলে বাধা দিয়েছেন যে, 'হেরেমের ভিতর তাকে তুমি ধ্বংস করতে পারবে না; এটা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকা।' অতঃপর পাথরটি হেরেমের বাইরে প্রত্যাবর্তন করে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যালোকে অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর লোকটি হেরেমের সীমানা থেকে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাথরটি তার মাথায় পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লোকটি আল্লাহ্র এই গজবে ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর স্ত্রীও আযাব থেকে বাঁচার জন্য বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুম ছিল কোন ঈমানদার ব্যক্তি যেন গজব নাযিলের সময় পশ্চাতে স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে চোখ ফিরেও না দেখে। তা' সত্ত্বেও হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী যখন আযাবের ভীষণ গর্জন শুনে পিছন দিকে তাকালেন এবং আফসূস করে বলতে লাগলেন, হায় আমার জাতি! হায় আমার সম্প্রদায়! তখন সাথে সাথে একটি কংকর এসে তাকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'পরদিন ভোরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং গোটা বস্তিকে সমূলে উৎপাটন করে স্বীয় ডানার একপার্শ্বে রেখে আকাশের অতি নিকটবর্তী হলেন; তখন আসমানের ফেরেশ্তাগণ সেই বস্তির মোরগের ডাক ও কুকুরের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখান থেকে গোটা বস্তিকে উল্টিয়ে সজোরে মাটিতে আছ্ড়ে মারলেন। এভাবে লূত সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই আযাবে লিপ্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরা ছিল মোট পাঁচটি নগরের অধিবাসী। তন্মধ্যে 'সাদূম' শহরটি ছিল সর্ববৃহৎ। সূরা বারা'আতে উক্ত শহরের উল্লেখ রয়েছে। এ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ।

অধ্যায় ঃ ২৩

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও পিতা-মাতার হক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط

'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।' (নিসা ঃ ১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ○ اُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ○

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

'(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা' ছিন্ন করে আর দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা যথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত। (বাকারা ঃ ২৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

'এবং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা' ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা' ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।' (রা'দ ঃ ২৫)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃজনের মহান কার্য সমাপ্ত করলেন, তখন আত্মীয়তার রেহেম দাঁড়িয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা করে তা' থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে, আমি তার অনুকূলে থাকবো, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করবে, তার থেকে আমি আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলবো। আল্লাহ্‌র এ কথা শুনে রেহেম সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অতঃপর নবীজী কুরআনের একখানি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ 'ক্ষমতা লাভ করলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরক বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেন।' (মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'জুলুম-অত্যাচার এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা অপেক্ষা জঘন্য কোন গুনাহ নাই। এ অপরাধের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দেওয়া হবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।'

নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,—'বনী আদমের আমল প্রতি জুমার রাত্রিতে পেশ করা হয় ; কিন্তু আত্মীয়তা ছেদনকারীর আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।'

ইব্‌নে হাব্বান প্রমুখ রেওয়ায়াত করেছেন ঃ 'তিন প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক, মদ্যপায়ী। দ্বিতীয়, আত্মীয়তা ছেদনকারী। তৃতীয়, যাদু-টোনায় বিশ্বাসী।'

ইমাম আহমদ, ইবনু আবিদ্দুন্‌য়া ও ইমাম বায়হাক্বী রেওয়ায়েত করেছেন যে, এই উম্মতের বেশ কিছু লোকের ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটবে যে, একদা রাত্রিতে তারা পানাহার, আনন্দ-উল্লাস ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে ; সকল বেলা তাদের চেহারা-ছুরত বানর ও শূকরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার উপর পাথর বর্ষণ করা হবে। অন্যান্য লোকেরা পরস্পর বলাবলি করবে,—অদ্য অমুক গোত্রকে অথবা অমুক বাড়ীর লোকদেরকে মাটি গ্রাস করে ফেলেছে। এদের অনেকের উপর লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় পাথর বর্ষণ করা হবে আবার অনেকের উপর ধ্বংসাত্মক তুফান ও ঝড়ো হাওয়া চালিয়ে দেওয়া হবে, যেমন আদ জাতির বেলায় করা হয়েছিল, তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে না হয়ে সীমিত আকারে হবে। এরা ওইসব লোক যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, নর্তকী ও গায়িকা নিয়ে বিনোদনে মত্ত থাকে, সূদের লেন-দেন করে, আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট করে। এখানে আরও এক প্রকার লোকের উল্লেখ ছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী জা'ফর তা' বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ এনে বলেছেন,—'ওহে মুসলমান!

আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর ; কেননা আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের ন্যায় শীঘ্রতর ফলপ্রদ নেক আমল আর দ্বিতীয়টি নাই। অনুরূপ কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা থেকে বিরত থাক ; কেননা জুলুম-অত্যাচার অপেক্ষা শীঘ্রতর নগদ শাস্তি আনয়নকারী পাপ অপরটি নাই। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপকার ও হিত সাধন কর। কেননা মানুষ হাজার বৎসরের ব্যবধান হতে বেহেশ্তের সুগন্ধ পাবে ; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তা ছেদনকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি অহংকারভরে মাটিতে চাদর হেঁচড়িয়ে চলে, এসব লোক বেহেশ্তের সুঘ্রাণ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে।' (তাব্‌রানী আওসাত)

একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,—'অদ্যকার এ মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন লোক যেন না বসে।' তৎক্ষণাৎ একজন যুবক মজলিস থেকে উঠে তার খালার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে—ইতিপূর্বে তাদের পরস্পর মনোমালিন্য ছিল—খালা তাকে মা'ফ করে দেওয়ার পর পুনরায় সে মজলিসে এসে শরীক হয়।' (ইস্‌বাহানী)

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ -

'আত্মীয়তা ছেদনকারী লোকদের উপর কখনও আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বর্ষিত হয় না ; এরা চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন,—আত্মীয়তা ছেদনকারী কোন ব্যক্তি যেন এ মজলিশে উপস্থিত না থাকে। মজলিসে উপবিষ্ট এক যুবকের ফুফুর সাথে কয়েক বৎসর যাবৎ মনোমালিন্য ছিল, তৎক্ষণাৎ সে মজলিস হতে উঠে ফুফুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্তর স্বচ্ছ করে নিয়েছে।

হাদীসে আছে, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী একজন লোকও থাকে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (তাব্‌রানী)

হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) ফজরের নামাযান্তে বললেন, 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তিকে আমি আল্লাহ্‌র

শপথ করে বলছি, যেন সে অত্র মজলিস থেকে উঠে যায়। কেননা আমরা এখন আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করবো ; দো'আর মজলিসে আত্মীয়তা ছেদনকারী লোক থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা দো'আ কবুল করেন না।' (তাব্রানী)

হাদীসে আছে,—'আত্মীয়তার রেহেম আল্লাহ্র আরশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত সে বলছে,—আমার বন্ধন যে রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন, আমার বন্ধন যে ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে ছিন্ন করুন।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি রহমান অর্থাৎ দয়ালু। আত্মীয়তা রেহেম অর্থাৎ দয়ারই নামান্তর। আমার 'রহমান' (দয়া) নাম হতে ছাঁটাই করে এই 'রেহম' নাম সৃষ্টি করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি রেহেম তথা আত্মীয়তার হক পালন করে, আমি তার প্রতি সদয় হই, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করে, আমি তার সাথে আমার ভালবাসা ছিন্ন করে ফেলি।'

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম হচ্ছে কোন মুসলমানকে অপমান করা। আর আত্মীয়তার রেহেম রহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত বৃক্ষশাখা। এটিকে যে ছিন্ন করবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমদ)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'রাহমান বৃক্ষের সাথে জড়িত রেহেম আল্লাহ্র কাছে নালিশ করে থাকে, ওগো খোদা! আমাকে ছিন্ন করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, ওগো খোদা! আমার উপর জুলুম করা হয়েছে, ওগো খোদা! ওগো খোদা!—এভাবে সে আর্তনাদ করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তুমি কি রাজী নও যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখবে, আমি তার সাথে ভালবাসা বজায় রাখব, আর তোমাকে যে ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে মহব্বত ছিন্ন করবো? (আহমদ ও ইব্নে হাব্বান)

রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'রেহেম গো-কীট সদৃশ বস্তু, আল্লাহ্র আরশকে সে চিমটে ধরে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সে তীব্র ভাষায় চিৎকার করে বলছে,—'হে আল্লাহ্! আমার বন্ধন যে রক্ষা করেছে, আপনি তাকে

রক্ষা করুন, আর আমাকে যে ছিন্ন করেছে, আপনি তাকে ছিন্ন করুন। (মুসনাদে বায্যার)

মুসনাদে বায্যার কিতাবে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'আরশের সাথে তিনটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় সম্পৃক্ত রয়েছে। এক, রেহেম,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সাথে সম্পৃক্ত, আমাকে যেন ছিন্ন না করা হয়।দ্বিতীয়, আমানত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আপনার সাথে জড়িত হয়ে রয়েছি, আমাকে যেন খেয়ানত করে পৃথক না করা হয়। তৃতীয়, নে'আমত,—সে বলছে ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার সান্নিধ্যে রয়েছি, না-শোকরী করে আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ না করা হয়।

বায়হাকী শরীফে আছে,—আরশের নিম্নতলে সীলমোহর লাগানোর সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। যখন আত্মীয়তার হক নষ্ট করা হয়, তখন রেহেম আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তা পাঠিয়ে আত্মীয়তার হক বিনষ্টকারীর অন্তরে সীলমোহর লাগিয়ে দেন। পরিণামে সে হতবুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং হাশরের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের আতিথেয়তা করে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে এবং তার উচিত যেন কথা বললে ভাল কথা বলে, নতুবা খামোশ থাকে।'

আরও বর্ণিত হয়েছে,—'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'তোমরা নিজেদের বংশ-পরম্পরা শিক্ষা করে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, আত্মীয়তার হক প্রতিপালনে পারস্পরিক ভালবাসা

বৃদ্ধি পায়, সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং আয়ু দীর্ঘ হয়।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمْرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيْتَةَ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

'যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনা করে এবং অপমৃত্যু হতে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আত্মীয়তার হক পালন করে।' (বায্‌যার, হাকেম, যাওয়ায়েদুল-মুসনাদ)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তওরাত গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবিকা কামনাকারী ব্যক্তি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।' (বায্‌যার, হাকেম)

আবু ইয়'লা মাওসেলী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'দান-খয়রাত এবং আত্মীয়তার হক প্রতিপালনের দ্বারা আল্লাহ্ তা'অলা দীর্ঘায়ু দান করেন, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং আপদ-বিপদ দূরীভূত করেন।'

আবু ইয়া'লা মাওসেলী (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ 'খাস্'আম' গোত্রের একজন লোক বর্ণনা করেছেন, একদা আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'ঈমান।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'শির্‌ক।' আমি বললাম, অতঃপর? তিনি বললেন ঃ 'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।' আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'অসৎ কাজে উৎসাহিত করা এবং সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করা।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ফেললো। আল্লাহ্‌র রাসূল তখন সফররত অবস্থায় ছিলেন। লোকটি

জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমলের নির্দেশনা করুন, যদ্দ্বারা আমি দোযখ থেকে বাঁচতে পারি এবং বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর বিরতি করে সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ লোকটির উদ্দেশ্য সৎ। অতঃপর হুযূর লোকটিকে তার জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন। সে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ

تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔

'তুমি এক আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়তার হক পালন কর।' লোকটি বিদায় নেওয়ার পর হুযূর বললেন ঃ 'যদি সে আমার উপদেশ অনুযায়ী আমল করে, তা'হলে অবশ্যই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।'

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'বিনয় ও মহত্ত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ আনয়ন করে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার দীর্ঘায়ু ও স্বচ্ছল জীবন দান করে।'

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَتْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَاَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ وَاٰمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে,—যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করে, সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে সৎকাজে উৎসাহিত ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে।' (ইব্নে হাব্বান, বায়হাক্বী)

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—'আমার পরম প্রিয় দোস্ত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসীয়ৎ করেছেন ঃ এক,—দুনিয়ার ব্যাপারে যারা আমার অপেক্ষা উন্নত, আমি যেন তাদের সাথে নিজেকে তুলনা না করি। দুই,—যারা আমার তুলনায়

কষ্টে এবং অবনত অবস্থায় আছে, আমি যেন তাদের প্রতি দৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। তিন,—গরীব মিসকীনকে যেন ভালবাসি এবং সর্বদা তাদের নিকটবর্তী হয়ে থাকি। চার,—আত্মীয়-স্বজনকে যেন প্রসন্ন রাখি ; যদিও তারা আমার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। পাঁচ,—দ্বীনের ব্যাপারে যেন কাউকে পরওয়া না করি। ছয়,—তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলতে দ্বিধা না করি। সাত,—অধিক পরিমাণে যেন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করি। কেননা এটি বেহেশতের ধনভাণ্ডারসমূহের একটি।' (তাব্‌রানী, ইব্‌নে হাব্বান)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'শ্রেষ্ঠতম গুণ কোন্‌টি? আমি কি তোমাদেরকে তা বলে দিবো না? শুন, 'যদি কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কর, কেউ যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর এবং যদি কেউ তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।' (তাব্‌রানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও শ্রেষ্ঠতম আমল হচ্ছে, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, বঞ্চিতকারীকে দান করা এবং গালি-গালাজকারীকে ক্ষমা করা।' (তাব্‌রানী)

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক আমলের নির্দেশনা করবো না? সাহাবায়ে কেরাম তীব্র উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِى
مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

'যদি কেউ তোমার সাথে মুর্খতা ও গোয়ারতুমীর ব্যবহার করে, তুমি তার সম্মুখে ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে পেশ আস। যদি কেউ তোমার প্রতি জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। যদি কেউ তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যদি কেউ তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তুমি তাকে

ভালবাসার সূত্রে গেঁথে নাও।' (তাবরানী)

হাদীস শরীফে আছে,—'কারও উপকার ও হিতসাধন করা এমন ইবাদত, যা' সর্বাপেক্ষা শীঘ্র সওয়াবের ভাগী করে। আর কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা এমন পাপ, যা সর্বাপেক্ষা শীঘ্র আযাব ও শাস্তির উপযুক্ত করে তোলে।' (ইব্‌নে মাজাহ্‌)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—'আত্মীয়তা ছেদন, খিয়ানত ও মিথ্যার চাইতে বড় গুনাহ আর নাই ; এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে শীঘ্র নগদ শাস্তি-প্রাপ্ত হয় এবং আখেরাতেও তার শাস্তি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন এমন পুণ্যকাজ, যার পুরস্কার ও প্রতিফলন দুনিয়াতেই নসীব হয় ; হক প্রতিপালনকারীর ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে বরকত হয় ; যদিও আত্মীয়বর্গ জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকে, তথাপি তার বরকতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয় না।'

অধ্যায় ঃ ২৪
পিতা-মাতার হক

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'কোন মানুষই পিতার হক আদায় করতে পারে না, তবে যদি কোন সময় তাঁকে ক্রীতদাস অবস্থায় দেখতে পায় এবং খরিদপূর্বক মুক্ত করে দেয়, তাতে পিতার হক (কথঞ্চিৎ) পালন হতে পারে।'

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—একদা জনৈক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিজরত এবং জিহাদের অঙ্গীকারে আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি।' আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন? লোকটি বললো, তারা উভয়ই জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তুমি যদি আল্লাহ্‌র কাছে আজ্‌র ও ছওয়াব পেতে চাও, তা'হলে তুমি তোমার পিতা-মাতার খেদমতে ফিরে যাও এবং তাদের কাছে উপস্থিত থেকে সদ্ব্যবহার কর।'

একদা এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমি জিহাদ করতে অক্ষম, সেই শক্তি ও সামর্থ আমার নাই।' আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছেন?

লোকটি বললো, আমার মা জীবিত আছেন। হুযূর বললেন ঃ 'যাও, তুমি তোমার মা'র খেদমতে নিয়োজিত থাক ; তা'হলে তুমি উমরাহ এবং জিহাদের সওয়াব পাবে।' (আবূ ইয়া'লা, তাব্‌রানী)

তাব্‌রানী কিতাবে আরও বর্ণিত হয়েছে,—এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করবো। আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমার মা কি জীবিত আছেন?' লোকটি বললো, হাঁ, জীবিত আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

اِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ۔

'তুমি তোমার মায়ের পদতলে পড়ে থাক, এখানেই তোমার জান্নাত।'

ইব্‌নে মাজাহ শরীফের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি কি হক রয়েছে?' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ۔

'তাঁরাই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে জানালো যে, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করেছেন, এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়। হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বললেন,—'আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلٰى ذٰلِكَ اِنْ شِئْتَ اَوْ دَعْ

'পিতা হচ্ছেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, ইচ্ছা হয় তুমি সেই দরজার হেফাযত কর, অথবা স্বেচ্ছায় তুমি তা' ধ্বংস কর।' (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার এক স্ত্রীর সাথে খুবই ভালবাসা ছিল ; কিন্তু আমার পিতা হযরত উমর (রাযিঃ)

তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদা হযরত উমর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর তিনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হুকুম করলেন।' (ইব্‌নে হাব্বান, তিরমিযী)

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّ لَهُ فِىْ عُمُرِهٖ وَيُزَادَ فِىْ رِزْقِهٖ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনের দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা কামনা করে, সে যেন পিতা–মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়–স্বজনের হক প্রতিপালন করে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে,—আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে সন্তান পিতা–মাতার খেদমত করবে, তাকে সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন।' (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, হাকেম)

'ইব্‌নে মাজাহ' শরীফে বর্ণিত হয়েছে,— হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাপাচার মানুষের রিযিকে অভাব ও দরিদ্রতা আনয়ন করে। তকদীরকে একমাত্র দো'আই ফিরিয়ে রাখতে পারে আর জীবনের দীর্ঘায়ু একমাত্র পিতা–মাতার খেদমতের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

বর্ণিত আছে,—'পরপুরুষের স্ত্রী'র প্রতি দৃষ্টি করো না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পাক–পবিত্র ও সংযমশীল থাক। তা'হলে তোমার স্ত্রী'ও পাকদামান থাকবে। অনুরূপ স্বীয় পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তা'হলে তোমার সন্তান–সন্ততি তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার কোন ভাই যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে আসে, তা'হলে সে ন্যায়ভাবে আসুক বা অন্যায়ভাবে অবশ্যই তুমি তাকে অভিনন্দন জানাও এবং তার অভিপ্রায়

গ্রহণ করে নাও। অন্যথায় হাশরের ময়দানে হাউজে কাউসারে তোমার উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলতে লাগলেন, 'লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক, নাকে খত লাগুক।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এহেন অপমানকর বদ্‌দো'আ আপনি কার জন্য করলেন? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যেকোন একজনকে দুনিয়াতে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও তাদের খেদমত করে নিজের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে নিতে পারলো না।

তাব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণপূর্বক বললেন, আমীন, আমীন, আমীন। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, এক্ষণে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বললেন,—'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় জীবদ্দশায় রমযান মাস পাওয়া সত্ত্বেও এর বরকত ও ফযীলতের ওসীলায় আপন পাপ মোচন করতে পারলো না ; বরং মৃত্যুর পর তার দোযখেই প্রবেশ করতে হয়, এমন লোকের উপর ধিক, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বহু দূরে পড়ে থাকুক। অতঃপর আমি এই বদ্‌দো'আর সমর্থনে 'আমীন' বলেছি।'

ইব্‌নে হাব্বানের বর্ণনায়,—'হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বদ্‌দো'আ করেছেন, বিতাড়িত হোক ওইসব লোক, যারা স্বীয় পিতা-মাতা উভয়কে বা যেকোন একজনকে পেল ; অথচ তাদের খেদমত করে বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী করে নিতে পারলো না। অতঃপর সমর্থনে আমি বলেছি 'আমীন।'

হাকেম রেওয়ায়াতটি পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে সর্বশেষ অংশটি এভাবে রয়েছে,—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছেন,—যে সন্তান পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে নিজে জান্নাত লাভ করতে পারলো না, তার প্রতি ধিক্‌, 'সে বিতাড়িত হোক।' আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন,—'আমীন'।

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—'যদি কেউ কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তাকে দোযখের

অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাকে পেয়েও তাদের খেদমত করে আল্লাহ্র নিকট হতে ক্ষমা হাসিল করতে পারলো না, তার উপর ধিক্, রহমত হতে সে বহু দূরে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কে? হুযূর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেও হুযূর বললেন ঃ 'তোমার মা।' লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'অতঃপর তোমার পিতা তোমার সেবা ও সদ্ব্যবহারের হকদার।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু বকর তনয়া হযরত আসমা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,—একদা আমার মা আমার নিকট আসলেন। হুযূরের যুগে তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম,—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মুসলমান নন ; এমতাবস্থায় কি আমি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবো? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'অবশ্যই তুমি তোমার মা'র খেদমত করবে এবং তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।'

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

رِضَا الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ۔

'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অনুরূপ পিতা-মাতাকে যদি অসন্তুষ্ট করা হয়, তা'হলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। (ইব্নে হাব্বান ও হাকেম)

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি আরজ করেছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি, আমার জন্য কি তওবা'র কোন সুযোগ আছে? হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার মা কি জীবিত আছেন?'

সে বললো, 'জ্বী না।' হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো, 'জ্বী হাঁ।' হুযুর বললেন ঃ 'তুমি তোমার খালার খেদমত কর এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (তিরমিযী, ইব্‌নে হাব্বান, হাকেম)

এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার ইন্‌তেকালের পর তাঁদের জন্য আমার কি হক পালন করতে হবে? তিনি উত্তর করলেন ঃ 'তাদের পাপ-মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে দো'আ কর, তাঁদের সাথে তোমার কৃত প্রতিশ্রুতি এবং তাঁদের কৃত ওসিয়ৎ পালন কর। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান কর এবং তাঁদের আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (আবু দাঊদ ও ইব্‌নে মাজাহ্)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)-এর সাথে মক্কার এক জায়গায় জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোকের সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে তিনি সালাম নিবেদন করলেন, স্বীয় উষ্ট্রীর উপর তাকে আরোহণ করালেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নিজের মাথার পাগড়িখানা উপহার দিলেন। সফরসঙ্গী হযরত ইব্‌নে দীনার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এরা বেদুঈন লোক, সামান্য সম্মানেই এরা তুষ্ট, আপনি এতো অধিক সম্মান প্রদর্শন করলেন এর কারণ কি? হযরত ইব্‌নে উমর বললেন ঃ 'এই বেদুঈনের পিতা আমার পিতার (হযরত উমরের) দোস্ত ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,—পিতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক ও কর্তব্য হচ্ছে, সন্তান পিতার বন্ধু-বান্ধব ও তাদের আত্মীয়-প্রিয়জনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু বুরদাহ্ (রাযিঃ) বলেন,—একদা আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন,—'আপনি জানেন? আমি আপনার নিকট কেন উপস্থিত হয়েছি? অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পরেও তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায়, সে যেন পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করে। সেমতে আমার পিতার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, আমি চাই আপনার প্রতি আমার সেই

হক পালন করতে।' (ইব্‌নে হাব্বান).

সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে ঃ পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তারা সেই গুহায় প্রবেশ করার পর একটি বৃহৎ পাথর খসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলতে লাগলো—তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে ওসীলা বানিয়ে দো'আ করলে এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। তাদের একজন বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন কাঠের সন্ধানে আমাকে বহু দূর যেতে হয়েছিল। যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে না পারায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়েই রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করি নাই। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গকে দুধ খাওয়াতেও ভাল লাগে নাই। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপেক্ষমান রইলাম। এদিকে আমার সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল এবং তাঁরা জেগে উঠে দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি এ কাজটি একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে এই পাথরের দরুন আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা' দূর করে দাও। এতে পাথরটি কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারলো না।

অন্য একজন বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি খুব বেশী ভালবাসতাম। একদা আমি তার সঙ্গে মিলনের আকাংখা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে রাজী হলো না। অতঃপর এক দুর্ভিক্ষের সময় সে আমার নিকট এলে আমি তাকে নির্জনে মিলনের শর্তে একশত বিশটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিলাম। এতে সে রাজী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম এবং তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বললো ঃ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না।' এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ

একমাত্র তোমারই সন্তোষ লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তা'হলে আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরটি আরও কিছুটা সরে গেল ; কিন্তু এই ফাঁক দিয়েও তারা বের হতে পারলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম, তাদের সবাইকে পারিশ্রমিক দিয়েছি ; কিন্তু একজন তার প্রাপ্য হক ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি তার সেই হক ব্যবসায় খাটিয়েছি। তাতে ধন-দওলত অনেক বেড়ে গেছে। কিছুকাল পর সেই ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার হক দাও। আমি বললাম ঃ যত উট, গরু, ছাগল, গোলাম দেখছো সবই তোমার হক। সে বললো ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা তুমি আমার সাথে উপহাস করো না। আমি তাকে বললাম ঃ আমি উপহাস করছি না। তারপর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছু রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তা'হলে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরটি সরে গেল এবং তারা সকলেই বের হয়ে আসলো।

অধ্যায় ঃ ২৫
যাকাত ও কৃপণতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে 'এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে' তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করেছে, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।' (আলি-ইমরান ঃ ১৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

'মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না।' (হা-মীম সিজদাহ ঃ ৭)

যারা যাকাত আদায় করে না, তাদেরকে উক্ত আয়াতে মুশরিক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوَّقَ بِهِ عُنُقُهُ

'যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন তার এসব পুঞ্জীভূত সম্পদ বিষাক্ত অদ্ভূত এক টেকো সাপের আকার

ধারণ করবে এবং তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে দংশন করতে থাকবে।'

রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'হে মুহাজিরগণ! পাঁচ প্রকারের দোষ ও অসৎ স্বভাব হতে আমি সর্বদা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি।

এক,—যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হয় এবং তারা এমন এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষরা কখনও দেখে নাই।

দুই,—কাজ-কারবারে মাপ ও ওজনে কম করা। যে জাতি এহেন গর্হিত কাজে অভ্যস্থ থাকবে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন মারাত্মক আকার ধারণ করবে। জালেম বাদশাহ্ তাদের শাসনকর্তা হবে এবং প্রতিনিয়ত প্রজার উপর তার জুলুম-অত্যাচার চলতে থাকবে।

তিন,—যাকাত প্রদান না করা। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন জাতিকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে অনাবৃষ্টিতে তাদের মারাত্মক দশা হতো।

চার,—আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন ; তাদের ধন-সম্পদ শত্রুরা যবর দখল করে নেয়।

পাঁচ,—আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করা। যে জাতি আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কখনও দুর হয় না ; তারা সর্বদা অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন এবং দানশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্রিত হতে পারে না ঃ কৃপণতা ও অসৎ স্বভাব।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে

না।'

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তোমরা কৃপণতার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। কেননা এটা এমন এক অভিশাপ যে, এরই কারণে মানুষ যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত হয়।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'ধন-সম্পদে কৃপণতা করা অতিশয় নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ।

হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে কৃপণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কৃপণতা হচ্ছে, মানুষের এ কথা চিন্তা করা যে, আমি ব্যয় করলাম তো ধ্বংস হয়ে গেল, আর জমা করে রাখলাম তো এটাই আমার বড় কাজ হলো।'

বস্তুতঃ কৃপণতার উৎসমূল হচ্ছে, ধনলিপ্সা, দুর্লোভ-দুরাশা, দারিদ্র্যের আশংকা, সন্তানের মোহ-মায়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'সন্তান-বাৎসল্য মানুষকে অনেক সময় কৃপণ ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।'

অনেক সময় এমনও লোক দেখা যায় যে, তারা যাকাত প্রদান করতে অসম্মত, কেবল টাকা-পয়সার প্রতি দৃষ্টি করে চোখ জুড়ায়, অর্থ-কড়ি গণনা করে তৃপ্তি লাভ করে, হাতের মুঠোতে রেখে স্বাদ গ্রহণ করে অথচ সে খুব ভাল করেই জানে যে, একদিন মরতে হবে, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

হযরত বিশ্র (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীলের (কৃপণ) সাথে দেখা-সাক্ষাত করাও আপদের কারণ হয়। কেননা তার দিকে তাকালে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়।'

তদানীন্তন কালেও আরবের লোকেরা কৃপণতা ও কাপুরুষতাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দোষণীয় মনে করতো। যেমন এ বিষয়ের উপর জনৈক কবির বিবৃতি হচ্ছে ঃ 'তোমরা কাজে-কর্মে নিশ্চিন্তে ব্যয় করতে থাক, দারিদ্র্যকে মোটেও ভয় করো না। কেননা, রিযিক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত পরিমাণে বন্টিত হয়ে গেছে।'

বখীল (কৃপণ) ব্যক্তির অপমান ও হেয় প্রতিপন্নতার জন্য এ শাস্তিই

যথেষ্ট যে, ১. ধন-সম্পদ সে অপরের জন্য জমা করে ; নিজের জন্য ব্যয় করাটা তার ভাগ্যে জুটেনা। ২. অথচ এ সম্পদের জের হিসাবে আবর্তিত যাবতীয় কায়-ক্লেশ ও প্রায়শ্চিত্ত সব তারই পোহাতে হয়। ৩. সঞ্চিত সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ৪. কোনরূপ আনন্দ ও পুলক অনুভব করেনা ; সর্বদা বিষন্নমন হয়ে থাকে। ৫. মালের কল্যাণ থেকে মাহ্‌রূম থাকে।

'আল-হেকামুল মানসূরা' গ্রন্থে আছে,—'বখীলকে একথা চূড়ান্তভাবে শুনিয়ে দাও যে, তার কুক্ষিগত ধন-সম্পদ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে নতুবা তৎসমুদয় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর হবে। নিজে উপভোগ করা কোনক্রমেই তার ভাগ্যে জুটবে না।'

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বখীল ব্যক্তি কখনও ন্যায়-নিষ্ঠ ও আমানতদার হয় না। অতএব তার ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কেননা মজ্জাগত খেয়ানতের ফলশ্রুতিতে নিজের অভাব ও স্বল্পতার ভয়ে সে অন্যের মাল অধিক পরিমাণে দখল করে থাকে।'

হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস্‌ সালাম একদা ইবলীসকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'ওহে ইবলীস! আচ্ছা, বল দেখি মানুষের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় আর কে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ?' সে বলেছে,—'আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হচ্ছে, যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও বখীল, আর সবচেয়ে বেশী অপছন্দ হচ্ছে, যে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও ছখী (মহৎ ও দানশীল)।' হযরত ইয়াহ্‌য়া জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? ইবলীস বললো,—বখীল ব্যক্তির বুখ্‌ল বা কৃপণতা এমন একটি দোষ যে, সে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও আমি তার মন্দ পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকি। কিন্তু ছাখাওয়াত বা মহত্ত্ব ও দানশীলতা এমন এক গুণ যে, আমার সর্বদা আশংকা হয় ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইবলীস বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেলো,—'আপনি যদি আল্লাহ্‌র নবী ইয়াহ্‌য়া না হতেন, তবে আমি একথা কিছুতেই বলতাম না।'

অধ্যায় ঃ ২৬

দুর্লোভ, দুরাশা ও উচ্চাভিলাষ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اِثْنَتَانِ طُولُ الْأَمَلِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَى

وَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِى الْآخِرَةَ وَاتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ـ

'তোমাদের ব্যাপারে যে দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের আমি সর্বাধিক আশংকা বোধ করি তা' হচ্ছে,—এক, দুর্লোভ ও দুরাশা। দুই, প্রবৃত্তির খাহেশ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ।' বস্তুতঃ দীর্ঘ আশার পরিণামে মানুষ আখেরাতকে ভুলে যায় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে দেয়।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদেরকে আমি এরূপ তিনটি বিষয়ের কথা বলছি, যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে, তারা তিন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,—এক, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও মোহগ্রস্ত ব্যক্তি এমন অভাব ও দারিদ্র্যে পতিত হবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়। দুই, দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তি সর্বদা এমন ব্যস্ততায় থাকবে, যা কোনদিন শেষ হওয়ার নয়। তিন, ধন-দৌলতের ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এমন বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, যা কোনদিন দূর হওয়ার নয়।'

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হিম্‌স্‌বাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন,- 'তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো, যেগুলোতে তোমরা চিরকাল বসবাস করতে পারবে না। তোমরা অন্তরে দুর্লোভ ও দীর্ঘ আশা পোষণ করেছো, যেগুলো কোনদিন পূরণ হওয়ার নয়। তোমরা প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য কুক্ষিগত করেছো, যেগুলো কোনদিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের

অপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত ও পাকা-পোক্তা অট্টালিকা প্রস্তুত করেছে, অনেক বেশী সম্পদ জমা করেছে এবং তোমাদের তুলনায় অধিক দীর্ঘ আশা পোষণ করেছে ; কিন্তু কোথায়, আজকে তাদের কোন অস্তিত্ব আছে? সবই তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে, লয় ও বিলুপ্তির অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।'

হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'আপনি যদি আপনার দুই পূর্বসূরীর পদাংকানুসরণ করতে চান, তা' হলে আপনার পরিধেয় পোশাক তালি লাগান, নিজের পাদুকা নিজেই মেরামত করুন। দীর্ঘ আশা পরিহার করুন, পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই পানাহার শেষ করুন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্র হযরত শীস্ (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের ওসীয়ৎ করেছেন এবং পরবর্তীতে নিজের সন্তানদিগকেও এ ওসীয়ৎসমূহ প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

এক,—পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো না ; চিরস্থায়ী জান্নাতের নায-নে'আমতের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, পরিণামে আমাকে সেখান থেকে বের হতে হয়েছে।

দুই,—স্ত্রীলোকের খাহেশ ও আরজুর অনুসরণ করো না ; আমি আমার স্ত্রী'র কথায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলাম। পরিণামে আমাকে চরম লজ্জিত হতে হয়েছে।

তিন,—যে কোন কাজ করতে মনস্থ কর, সর্বপ্রথম সেই কাজের শেষ পরিণাম কি হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে নাও ; কেবল এতটুকু বিষয় চিন্তা না করার কারণে আমাকে বহু দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

চার,—যে কোন কাজ করতে যদি তোমার মনে দ্বিধা বোধ হয়, তা' হলে সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর ; নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি ধাবিত হওয়ার পর আমার দ্বিধা অনুভূত হয়েছিল ; তবুও ভক্ষণকার্য ত্যাগ না করার পরিণামে আমাকে লজ্জিত হতে হয়েছে।

পাঁচ,—প্রতিটি কাজে পরামর্শ গ্রহণ কর ; আমিও যদি ফেরেশ্তাদের সাথে পরামর্শ করে নিতাম, তা' হলে আমাকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন,—হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)বলেছেন ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না, আবার সন্ধ্যায়ও পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না ; প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, আর জীবনের নিঃশ্বাস যে পর্যন্ত আছে, প্রতিটি মুহূর্তকে সুযোগ মনে করে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। অনুরূপ পীড়াগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থ দেহে কিছু করে নাও ; কেননা তুমি নিশ্চয় করে জাননা যে, পরবর্তী মুহূর্তটিতে তুমি বেঁচে থাকবে।

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তোমরা সকলেই কি জান্নাত লাভ করতে চাও?' তাঁরা বললেন ঃ 'অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ 'তা' হলে তোমরা আশা খাট করে নাও এবং হক আদায় করে যথার্থভাবে আল্লাহ্কে লজ্জা কর।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ 'আমরা তো আল্লাহ্কে লজ্জা করি।' হুযুর বললেন ঃ

لَيْسَ ذٰلِكَ بِالْحَيَاءِ وَلٰكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ تَذْكُرُوا الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى وَتَحْفَظُوا الْجَوْفَ وَمَا وَعٰى وَالرَّاْسَ وَمَا حَوٰى وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاٰخِرَةِ يَدَعْ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَهُنَالِكَ اسْتَحْيَاءُ الْعَبْدِ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

'কেবল এতটুকুই নয় ; বরং প্রকৃত লজ্জা হচ্ছে, তোমরা সর্বদা কবর ও কবরের অভ্যন্তরের কঠিন পরীক্ষা ও জটিল সমস্যার কথা স্মরণ কর, স্বীয় উদর ও উদরস্থিত এবং মস্তক ও মস্তকস্থিত (যাবতীয় পানীয়, খাদ্য, পরিচ্ছদ, চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা-পরিকল্পনা) সবকিছুর হেফাজত কর। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আখেরাতে শান্তি ও পুরস্কার কামনা করে, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আকর্ষণে বে-পরওয়া হয়ে তা' পরিত্যাগ করে। মূলতঃ এটাই হচ্ছে আল্লাহ্কে লজ্জা করার মর্ম।' এভাবে জীবন গড়েছে যারা, তারাই আল্লাহ্র ওলী এবং তাঁর বন্ধুত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'এই উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণের সূচনা হয় দুনিয়া ত্যাগ ও আখেরাতের

প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও অনুরাগ থেকে, আর ধ্বংস ও বিনাশের পূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘটে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশায় গিয়ে।'

হযরত উম্মে মুন্‌যির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশা'র সময় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে লজ্জা কর না?' সকলেই জিজ্ঞাসা করলো,—তা' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হুযুর বললেন ঃ 'তোমরা এতো প্রচুর মাল–সম্পদ জমা করেছো, যেগুলো ভোগ করে শেষ করতে পারবে না, এতো দীর্ঘ আশা পোষণ করছো, যেগুলো পূর্ণ হওয়ার নয় এবং বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছো যেখানে চিরকাল বাস করতে পারবে না।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত উসামা (রাযিঃ) একটি দাসী খরিদ করলেন। যার দাম এক মাস পর দেওয়ার কথা ছিল। এ কথা শুনে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'উসামা কত দীর্ঘ আশাই না করেছে! ওই সত্তার কসম, যার পবিত্র মুঠোতে আমার প্রাণ, একবার চক্ষু উন্মীলন করার পর পরবর্তী পলকের আশা আমি করতে পারি না ; আশংকা হয় এ–ই বুঝি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। খাদ্য এক লুকমা মুখে উত্তোলন করার পর চিবানো পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করতে পারি না।' অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ 'তোমাদের যদি অনুভূতি থাকে, তা' হলে তোমরা নিজেদেরকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। কারণ মৃত্যু তোমাদের জন্য অবধারিত নিতান্ত সত্য প্রতিশ্রুতি, যেকোন মুহূর্তে তা' উপস্থিত হতে পারে তখন সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার তোমাদের কোনই ক্ষমতা থাকবে না।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন,—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির উদ্দেশে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু পানি পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই তিনি তায়াম্মুম করে নিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পানি সন্নিকটেই তো আছে। হুযুর (সঃ) ইরশাদ করলেন ঃ 'জানি না, পানি পর্যন্ত পৌছতে মৃত্যু আমাকে অবকাশ দিবে কিনা।'

একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাঠি হাতে নিয়ে একটি সম্মুখে, দ্বিতীয়টি পার্শ্বে এবং তৃতীয়টি বেশ দূরে মাটিতে গেড়ে উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা জান? এগুলো কি?

সাহাবীগণ উত্তর করলেন,—আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ কাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'এটা হচ্ছে মানুষ, আর পার্শ্বেই হচ্ছে তার মৃত্যু, আর ঐ দুর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে তার আশা-আকাঙ্খা, যেগুলো অন্তরে বহন করে বেচারা আদমের সন্তান ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে ; কিন্তু তৎপূর্বেই মৃত্যুর বাধা এসে তাকে চিরবঞ্চিত ও অপমানিত করে ফেলে।'

একদা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম লক্ষ্য করলেন, জনৈক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। তিনি দো'আ করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্। এই বৃদ্ধের দুনিয়ার আশা তুমি রহিত করে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ কোদাল রেখে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আবার দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তার আশা-আকাংখা আবার ফিরিয়ে দাও।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ উঠে পুনরায় কাজ আরম্ভ করে দিল। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ বললো ঃ 'কাজ করতে সময় মনে আমার চিন্তা আসলো, আর কতকাল এ বৃদ্ধ বয়সে আমি পরিশ্রম করে যাবো,—এই ভেবে আমি কোদাল রেখে বসে গেছি। কিছুক্ষণ পর আবার খেয়াল আসলো, যতদিন হায়াত আছে বেঁচে থাকবো ; তখন পুনরায় কোদাল হাতে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।'

অধ্যায় ঃ ২৭
সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্বমগ্নতা এবং হারাম বিষয়াবলী বর্জন করা

আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদতের অর্থ হচ্ছে, বান্দার প্রতি আরোপিত প্রতিটি ফরযকার্য যথাযথভাবে পালন করা, নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়সমূহ পরিহার করা, তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান কায়মনোবাক্যে প্রতিফলিত করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' (কাসাস ঃ ৭৭)

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে, বান্দা যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদতে মগ্ন থাকে।

স্মরণ রেখো,—প্রকৃত ইবাদত হচ্ছে,—আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ পরিচয় ও মর্যাদার উপলব্ধি হাসিল করা এবং সর্বদা অন্তরে তা' জাগরুক রাখা, সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-শঙ্কিত থাকা, একমাত্র তাঁরই কাছে আশা-আকাংখা প্রকাশ করা, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র মর্জ্জিমত চলা এবং প্রতিনিয়ত নিজের চুলচেরা ও সচেতন হিসাব-নিকাশ নিতে থাকা। বান্দা যদি এরূপ সদ্‌গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়, তা' হলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঈমানের হাকীকত থেকেই মাহ্‌রূম। কেননা, আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় ব্যতিরেকে বান্দার ইবাদত-বন্দেগীই শুদ্ধ হবে কি-করে? সুতরাং বান্দার উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, অনাদি-অনন্ত সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র মা'রেফাত হাসিল করা, যার জ্ঞানের পরিধির কোন সীমা ও পরিমণ্ডল নাই, তাঁকে ছাড়া আর সবই সসীম। সকল সসীমের অনন্ত ঊর্ধ্বে যার স্থান, যার কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত নাই ; তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

এক বেদুঈন হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—ইবাদতের সময় আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ থাকেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'অবশ্যই ; যদি না–ই দেখি, তবে তার ইবাদত করি কেন?' বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি তাঁকে কিভাবে দেখেন?' তিনি বললেন ঃ 'স্থূলদ্রষ্টারা তাঁকে দেখতে সক্ষম নয় ; তাঁকে দেখতে হলে প্রয়োজন অর্ন্তদৃষ্টির ঃ ঈমানের হাকীকত যাদের নসীব হয়েছে, তারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীকে আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন ঃ 'এটা একান্ত রহস্যাবৃত খোদায়ী ভেদ, স্বীয় প্রিয়জনদেরই আল্লাহ্ তা'আলা তা' দান করে থাকেন, নিকটতম কোন ফেরেশ্‌তাও তা' জানতে পারে না।'

হযরত কা'ব আহ্‌বার (রাযিঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে যদি আদম–সন্তানের এক সরিষার দানা পরিমাণও একীন হাসিল হয়, তবে সে পানির উপর দিয়ে পদব্রজে চলতে আরম্ভ করবে।' বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার পরম করুণা যে, তিনি তাঁর 'পরিচয়লাভে অপরাগতার স্বীকৃতি'কেও 'ঈমান' বলে গণ্য করেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র 'যথার্থ শোকর আদায় করতে অক্ষমতা' প্রকাশ করাকে 'শোকর' হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। মাহ্‌মূদ ওয়ার্‌রাক বলেছেন ঃ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নে'আমতের শোকর আদায় করা'ও আমার প্রতি তাঁর এহ্‌সান ও স্বতন্ত্র আরেকটি নে'আমত, সুতরাং একবার শোকর আদায়ের পর পুনরায় শোকর আদায় করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দুনিয়াতে যত দীর্ঘকালই বেঁচে থাকি না কেন, তাঁর শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না।'

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যত ও একচ্ছত্র প্রভুত্বের জ্ঞান যার হাসিল হয়েছে, তার অবশ্যই স্বীয় উবূদিয়্যত ও দাসত্বের স্বীকৃতি প্রতিফলিত হবে। সুতরাং উক্ত জ্ঞান ও স্বীকৃতির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বান্দার অন্তরে ঈমান পরিপক্ক হবে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে আমল ও ইবাদত সুদৃঢ়তর হবে। অনন্তর ঈমান দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ বাহ্যিক ও আন্তরিক। শুধু মুখে স্বীকার করার নাম বাহ্যিক ঈমান। আর আন্তরিক ঈমান হচ্ছে, মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে একীন করা। আর এই ঈমানের ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে

পদমর্যাদায় তারতম্যও থাকে অবশ্য। ফলে, ইবাদত-বন্দেগীতেও পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য পরিস্ফুটিত হয় ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও সকলের জন্য 'ঈমান' শব্দটি প্রযোজ্য। অবশ্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে ঈমানের মধ্যেও পার্থক্য ও তারতম্য ঘটে থাকে ঃ

এক,—ইখ্‌লাস। ইখ্‌লাসের সারকথা হচ্ছে, স্বীয় আমল ও ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে দাবী না করা ; কেননা তোমাকে এই ইবাদতের তাওফীকটুকুও তিনিই দিয়েছেন, তিনিই তোমার আমলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং এতে তোমার কোনই কৃতিত্ব নাই। অতএব যদি সওয়াবের লোভও শাস্তির ভয়ে ইবাদত কর, তা' হলে এটা হবে নিছক ইখ্‌লাস-পরিপন্থী কাজ। কারণ তখন তুমি নিজের স্বার্থে ইবাদত করলে ; আল্লাহ্‌র জন্যে নয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ সেই কুকুরের মত হয়ো না, যাকে ভয় দেখিয়ে কাজ নিতে হয়, অনুরূপ সেই মজদুরের ন্যায়ও হয়ো না সে পরিশ্রমিক না পেলে কর্ম ত্যাগ করে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ
اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ قف خَسِرَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত।' (হজ্ব ঃ ১১)

বরং বান্দার উপর আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্ব পূর্বাহ্নেই ফরয ও অপরিহার্য হয়েছে, কারণ তিনি পূর্বেই আমাদের প্রতি অসংখ্য অগণিত এহ্‌সান ও কৃপা করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি আমাদেরকে ইবাদতের হুকুম করেছেন

অধিকতর পুরস্কার ও সওয়াব প্রদানের জন্য। এরপরেও যারা অবাধ্যতা করে পাপাচারে লিপ্ত হলো, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তির বিধান করবেন—এটা তাঁর আদ্‌ল ও ইনসাফ।

দুই,—তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সারমর্ম হচ্ছে—নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে এবং মুসীবতে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে, অতঃপর কোনরূপ হতাশ না হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। এজন্যেই তাওয়াক্কুলকারীগণ উত্তমরূপে বিশ্বাস করেন যে, দুঃখ-মুসীবত ও প্রয়োজনের দাবী প্রভৃতি তকদীরের নির্ধারিত বিধানেরই ফলশ্রুতি এবং সকল আসবাব ও উপকরণও তাঁরই ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারীগণ কখনও আল্লাহ্ থেকে বিমুখ হয়ে গায়রুল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হন না।

তিন,—রেজা। 'রেজা'র অর্থ হচ্ছে,—সর্বাবস্থায় তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যারা তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়।' আরেক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'অনেক আনন্দের বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো মূলতঃ দুঃখ, আবার অনেক দুঃখের বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো মূলতঃ আনন্দ।'

বস্তুতঃ উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমানই যথেষ্ট ঃ

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

'তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে।' (বাক্বারা ঃ ২১৬)

স্মরণ রেখো,—আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত পরিপূর্ণভাবে করতে হলে দুনিয়ার মায়া-মোহ পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'সর্বাপেক্ষা সারগর্ভ নসীহত হচ্ছে, আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ শৈথিল্য ও অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। এসব কলুষ ও অন্তরায় দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ; অথচ দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়বস্তু মুহূর্তকালের জন্য লীলা-খেলা মাত্র। সুতরাং এই অত্যাল্প সময়টুকু তুমি ইবাদতে নিয়োজিত করতে পারলেই আখেরাতের জীবনে অনন্ত সাফল্য লাভ করে চিরধন্য হতে পারবে।'

জনৈক সাহাবী আরজ করেছিলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট

মৃত্যু পছন্দনীয় নয় ; এর কারণ কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার কাছে কি মাল-দৌলত আছে?' বললেন, হাঁ। হুযূর ইরশাদ করলেন ঃ

قَدِّمْ مَالَكَ فَاِنَّ الْمَرْءَ عِنْدَ مَالِهٖ ـ

'প্রথমে তুমি নিজের মাল-দৌলতকে পাঠিয়ে দাও ; কেননা মানুষের অন্তর মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং মাল আগে পাঠিয়ে দিলে পরে নিজেরও যেতে ইচ্ছা হবে।'

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ 'নেকী হাসিল করার তিনটি উপকরণ রয়েছে,—কথা, দৃষ্টি ও নীরবতা। কথা হওয়া চাই আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে অর্থহীন প্রলাপ। দৃষ্টি হওয়া চাই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ; তা' না-হলে সেটা হবে ভ্রষ্টতা। নীরবতা হওয়া চাই আখেরাতের ফিকিরের সাথে ; তা' না-হলে সেটা হবে নিরর্থক ক্রীড়া-কৌতুক।'

দুনিয়ার মায়া-মোহ ত্যাগ করার পন্থা হচ্ছে, অন্তরে কখনও জাগতিক বিষয়বস্তুর চিন্তা-কল্পনা আনয়ন করবে না এবং এগুলোকে হৃদয়ে কোনরূপ স্থান দিবে না। কেননা চিন্তা-ফিকিরের সাথে মানব-প্রবৃত্তির গভীর সম্পর্ক আছে বিধায় অন্তরে এর মাধ্যমে পার্থিব লোভ-লালসার অনুপ্রবেশ ঘটে।

অনুরূপ দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতে হলে অবৈধ দৃশ্যের প্রতি তাকাবে না। কেননা এহেন অবৈধ দৃষ্টির দ্বারা মানবাত্মা নিশ্চিতভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'কুদৃষ্টি শয়তানের অব্যর্থ তীরসমূহের একটি ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে নিজকে কুদৃষ্টি হতে বিরত রাখবে, তার উন্নততর ঈমান নসীব হবে, যার স্বর্গীয় আস্বাদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করবে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত না করে স্বাধীন-বেয়াড়া ছেড়ে দিয়েছে, সে অর্ন্তজ্বালায় দগ্ধীভূত হয়, পরন্তু লোকজনের সম্মুখে অপমানিত হয় এবং দোযখে তার অবস্থান দীর্ঘতর হয়।'

আফ্লাতুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানবাত্মার জন্য মানুষের কোন

অঙ্গটি অধিক ক্ষতিকর? বলেছিলেন ঃ কর্ণ অথবা চক্ষু। এ দুটি আত্মার জন্য দুই ডানাস্বরূপ। পাখীর ন্যায় সে উক্ত ডানাদ্বয়ের সাহায্যে স্বাভাবিক চলাফেরা করে। তন্মধ্যে একটি কেটে গেলে অপরটির সাহায্যে বড় কষ্টে তার চলতে হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌নে যাউ' বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র সম্মুখে এবং বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে একজন মানুষ হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্বীয় নজরকে সে স্বাধীন ছেড়ে রেখেছে ; সুযোগ পেলেই অবৈধ দৃষ্টিপাত করে।'

জনৈক বুযুর্গ একজন লোককে সুদর্শন একটি বালকের সাথে হাসি-তামাশায় লিপ্ত দেখে বলেছিলেন ঃ 'ওহে! এ হীন কার্যে মত্ত হয়ে তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস করছো ; জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তরের পবিত্রতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা বরবাদ করে দিচ্ছো। তোমার নেকী-বদী লিপিবদ্ধকারী এবং তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশ্‌তাদেরকে কি তুমি মোটেই লজ্জা কর না, ভয় কর না? এসব কার্য তারা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে ; তোমার দিকে তারা তাকিয়ে দেখছে, এই হীন অবস্থায় তুমি লিপ্ত রয়েছো, তারা আল্লাহর দরবারে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হচ্ছে, এটা তোমার প্রকাশ্য খেয়ানত ; এভাবে তুমি নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ বস্তুতঃ কুদৃষ্টি হচ্ছে, শয়তানের জাল; এরই সাহায্যে সে সাধককে ফাঁদে আটকিয়ে নেয়। চোখের দৃষ্টির অনুসরণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রতারিত হয়। সুতরাং দৃষ্টির হেফাযত প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতের নামান্তর। এভাবে সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করে সাধক অনন্ত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যথায় তার সকল আমল-ইবাদত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রকৃত ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের প্রতি সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি হারাম দ্রব্যাদি পরিহার করবে, তার তওবা ও খোদা-প্রাপ্তি নসীব হবে। যে হালাল রিযিক গ্রহণ করবে, সে

তাকওয়া ও খোদা-ভীরুতার গুণে ভূষিত হবে। যে ফরযসমূহ পালন করবে, সে প্রকৃত মুসলিম হবে। যার রসনা সংযত হবে, সে যাবতীয় স্খলন থেকে রক্ষা পাবে। যে বান্দার হক আদায় করবে, সে কেসাস-দণ্ড থেকে মুক্ত থাকবে। যে সুন্নতের অনুসরণ করে চলবে, তার সমস্ত আমল পবিত্র ও বরকতময় হবে। আর যার ইখ্‌লাস ও নিষ্ঠা থাকবে, তার আমল ও ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পবিত্র ও হালাল জীবিকা উপার্জন কর, নেক আমল কর, আল্লাহ্‌র নিকট একদিনের অধিক রিযিক কামনা করো না এবং নিজকে সর্বদা মৃত বলে জ্ঞান কর।'

ঈমানদারের কর্তব্য,—স্বীয় আমলের কারণে আত্মগৌরব ও অহমিকায় লিপ্ত না হওয়া। কারণ, এটা মস্ত বড় আপদ ; সাধকের আমল ও ইবাদতকে ধ্বংস করতে এই আত্মগৌরব ও অহমিকাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুতঃ স্বীয় আমল ও ইবাদতে গৌরবান্বিত হওয়া আল্লাহর প্রতি কৃপা প্রদর্শনেরই নামান্তর ; অথচ স্বীয় কৃত ইবাদতের অবস্থা কি?—গৃহীত না উপেক্ষিত—সাধকের তা' কিছুই জানা নাই। বরঞ্চ ইবাদত করে আত্ম-গরিমায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সেই পাপ অধিকতর উত্তম, পরিণামে যা তওবা, অনুতাপ ও আত্ম-সমর্পণের কারণ হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝

'তারা দেখতে পাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতো না।' (যুমার ঃ ৪৭)

অর্থাৎ,—দুনিয়াতে তারা যেসব আমলকে খাঁটি ইবাদতরূপে আন্‌জাম দিয়েছিল, সেগুলোই আখেরাতে তাদের আমলনামায় পাপ হিসাবে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে রিয়াকারী ও আত্মগর্বিত আবেদদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

'স্বীয় পালনকর্তার ইবাদতে সে যেন কাউকে শরীক না করে।'
(কাহফ ঃ ১১০)

ইবাদতে শির্ক করার অর্থ হচ্ছে, রিয়া করা এবং অহেতুক লজ্জাবশতঃ ইবাদত বর্জন করা অথবা লজ্জাবশতঃ গোপনে ইবাদত করা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ এ আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরাপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।' (বাক্বারাহ ঃ ২৮১)

হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে নসীহত করেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার লক্ষণ ঃএক,- যা পাও নাই, তা' সম্পর্কে আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট চিত্তে তাওয়াক্কুল করবে। দুই,—যা পেয়েছো, সে জন্যে আল্লাহ্‌র প্রতি রেজা' ও শোকর প্রকাশ করবে। তিন,—যা থেকে বঞ্চিত হয়েছো, তার উপর ছবর করবে।'

'আল-হেকামুল-মানসূরা' কিতাবে আছে,—'মুসীবতের সময় যে ধৈর্যধারণ করে, সে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।'

ছবরের কয়েকটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঃ এক,—ফরয ইবাদতের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,—উত্তম সময় নির্বাচন করে ফরযকার্য সম্পাদন করা। দুই,—নফল ইবাদতসমূহের উপর ছবর করা, অর্থাৎ,— অধ্যবসায়ের সাথে নফল ইবাদত করা। তিন,—প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর উৎপীড়নে ছবর করা। চার,—রোগ-শোকে ছবর করা। পাঁচ,—অর্ধাহার, অনাহার ও দারিদ্র্যে ছবর করা। ছয়,—পাপকার্য পরিহার করার ব্যাপারে ছবর করা, অর্থাৎ,—রিপুর তাড়না, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দমন করা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করা এবং সর্ববিধ সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে চলা।

অধ্যায় ঃ ২৮

মৃত্যুর চিন্তা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ـ

'তোমরা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ধ্বংসকারী মওতের কথা বেশী পরিমাণে স্মরণ কর।' অর্থাৎ,—মওতের কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তরে মায়া-মোহ ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকবে এবং এভাবে অচিরেই মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত বিদূরিত হয়ে আখেরাত ও আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হবে।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'মানুষ যেমন মওতের কথা অবগত আছে, জীব-জন্তুরাও যদি তেমনভাবে অবগত থাকতো, তবে তোমাদের খাওয়ার উপযুক্ত কোন তাজা জীবই পাওয়া যেতো না ; সকল জীবই মৃত্যুর চিন্তায় দুর্বল-কৃষ হয়ে যেতো।'

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাশরের দিন শহীদদের সঙ্গে আরও কোন লোক শাহাদতের ফযীলত-প্রাপ্ত হবে কি?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'হাঁ, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে-ও শহীদের দলভুক্ত হবে।'

মৃত্যুর ধ্যান ও চিন্তার এতো অধিক ফযীলত হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এদ্বারা মানুষ পার্থিব জগতের মায়া-মোহ থেকে মুক্ত ও নিবৃত্ত থাকে এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকার্যে সদা নিমগ্ন থাকে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ـ

'মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহারস্বরূপ।'

কেননা দুনিয়া তার জন্য বন্দীখানা ; এখানে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাতে হয়, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে হয়, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে শয়তানের মুকাবেলা করতে হয়,—অতঃপর মৃত্যুই তাকে এসব দুঃখ-যাতনা হতে রেহাই প্রদান করে।

হাদীস শরীফে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ -

'মৃত্যু মুসলমানকে পাপ থেকে পাক পবিত্র করে দেয়।'

তবে শর্ত হলো, সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হবে, আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপে অপর কেউ কষ্ট পেলে হবে না। একজন মুসলমানের সৎগুণাবলী যা হওয়া উচিত, সবই তার মধ্যে থাকতে হবে ; সকল কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, সকল ফরয দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হবে, তবেই মৃত্যু এই মুসলমান ব্যক্তির জন্য ছগীরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্তির কারণ হবে।

একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'হাসি-ঠাট্টার অহেতুক আসরকে যে বস্তুটি তিক্ত করে দেয়, তোমরা সেই বস্তুটিকে স্মরণ কর।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বললেন ঃ 'মৃত্যু'।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ يُمَحِّصُ الذُّنُوْبَ وَ يُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا -

'তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ; কেননা মৃত্যুর চিন্তা পাপরাশিকে বিলুপ্ত করে দেয়, দুনিয়ার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মায়।' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا -

'মানুষের উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।'

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাওয়ার সময় একদল লোককে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টা করতে দেখে বললেন ঃ

اذْكُرُوا الْمَوْتَ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ

'মৃত্যুকে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তা'হলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তির খুবই প্রশংসা করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'সে ব্যক্তি কি মৃত্যুর চিন্তা করে?' লোকেরা বললো, মৃত্যুর চিন্তা সে করে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা'হলে সে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য নয়, যা তোমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলে।'

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা আমরা দশজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম ; সর্বশেষে উপস্থিত হয়েছি আমি। তখন একজন আনসারী লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্মানী ব্যক্তি কে?' বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানী ও সফলকাম।'

রবী ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ 'অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে মৃত্যুর চাইতে উত্তম আর কিছু নাই, যেটির জন্য মু'মিন ব্যক্তি অপেক্ষমান থাকে।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'আমার খোঁজ তোমরা কাউকে দিও না; আমি নির্জনতা ভালবাসি ; আমার মঙ্গলের জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট দো'আ করো।'

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী স্বীয় ভ্রাতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয় কর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, এমন এক জগতে (আখেরাতে) পৌছার পূর্বেই তুমি উক্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নাও, যেখানে তোমাকে চিরকাল

জীবিত থাকতে হবে।'

হযরত ইব্‌নে সীরিন (রহঃ)-এর সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি শঙ্কিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যেতেন।

হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রতি রাতে মওতের আলোচনার জন্য ফক্বীহ্‌গণের মজলিস অনুষ্ঠান করতেন, তারা যখন মৃত্যু এবং ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা আলোচনা করতেন, তখন তিনি তা' শুনে রীতিমত বিলাপ করে কাঁদতে থাকতেন।

হযরত ইব্‌রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ 'দু'টি বিষয়ের চিন্তা দুনিয়াকে আমার নিকট বিষাদময় করে দিয়েছে। এক,—মৃত্যু, দ্বিতীয়, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়।' হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে, দুনিয়ার মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে গেছে।'

হযরত আশ্'আস (রহঃ) বলেন,—হযরত হাসান (রাযিঃ)-এর মজলিসে যখনই আমরা উপস্থিত হতাম, কেবল মৃত্যু, আখেরাত ও দোযখের আলোচনাই শ্রবণ করতাম।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন,—একদা হযরত আয়েশার নিকট জনৈকা মহিলা স্বীয় অন্তরের কাঠিন্যের কথা আরজ করলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন ঃ 'মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, তা'হলে তোমার মন নরম হবে। অতঃপর সেই মহিলা উপদেশ অনুযায়ী মৃত্যুর ধ্যান করলে তার মন বস্তুতই নরম হয়েছে এবং এজন্যে পরবর্তীতে একদিন সেই মহিলা হযরত আয়েশা'র খেদমতে শোকরিয়া জ্ঞাপন করতে এসেছেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তাঁর দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হতো। হযরত দাউদ (আঃ) মৃত্যুর চিন্তায় অধীর হয়ে এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর শরীরের গ্রন্থিসমূহ পৃথক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, পুনরায় যখন আল্লাহর রহমত ও দয়ার আলোচনা করা হতো তখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মৃত্যু থেকে পলায়ন করে না বা দুঃখিত হয় না।' হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল

আযীয (রহঃ) জনৈক বুযুর্গের নিকট নসীহত প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আপনি সর্বপ্রথম খলীফা যিনি নিহত না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত আপনার সকল পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ মৃত্যু থেকে রেহাই পায় নাই, এখন আপনার পালা এসেছে।' এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হযরত রাবী' ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) স্বীয় বাসগৃহে কবর খনন করে রেখেছিলেন, প্রতিদিন কয়েকবার সেখানে তিনি শয়ন করতেন এবং মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করে বলতেন,—'আমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মৃত্যুবিস্মৃত হই, তা'হলে ধ্বংস হয়ে যাবো।'

হযরত মুতার্‌রিফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে বিধায় প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী লোকেরা মুক্ত মনে স্বীয় সম্পদ উপভোগ করতে পারে না ; সুতরাং এমন নে'আমত (বেহেশ্‌তের চিরশান্তি) কামনা কর যা উপভোগ করতে মৃত্যুর বাধা সৃষ্টি না হয়।' হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত আম্বাসাহ্‌কে বলেছেন ঃ 'মৃত্যুকে অধিকতর স্মরণ কর ; কেননা যদি পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকো, তা'হলে সেটাকে হ্রাস করা উচিত, আর যদি অভাবী হয়ে থাকো, তা'হলে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন,—এ উভয়ই পয়দা হয় মৃত্যুর চিন্তা থেকে। হযরত আবু সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি উম্মে হারূণকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মৃত্যু কামনা কর? সে বললো,—যেক্ষেত্রে আমি সাধারণ কোন মানুষের অবাধ্যতা করলে তার সম্মুখীন হতে লজ্জাবোধ করি, সেখানে আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অবাধ্য হয়ে কিভাবে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে সাহস করতে পারি?

হযরত আবূ মূসা তামীমী (রহঃ) বলেন ঃ প্রখ্যাত কবি ফারায্‌দাকের স্ত্রী'র জানাযায় বড় বড় মনীষী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও ছিলেন। তিনি ফারায্‌দাককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—'পরকালের জন্যে তুমি কি করেছো?' সে বলেছে,—দীর্ঘ ষাট বৎসর যাবৎ কালেমা তাইয়্যিবা 'লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। স্ত্রী'র দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলো, সেগুলো বস্তুতই প্রণিধানযোগ্য। পংক্তিগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ঃ 'আমি কবরের

পরবর্তী ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত, ওগো খোদা! যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তবে সেই ভীষণ ও মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার কোন উপায় নাই। হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে আমি ফারায্দাকের কি দশা হবে, যেদিন অগ্রে-পশ্চাতে ফেরেশতাগণ তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন সেই আদম সন্তানটি কতইনা দুর্ভাগা, যাকে বেড়ী পরিয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

অধ্যায় ঃ ২৯

আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি

বর্ণিত আছে,—আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম জওহর বা মূল পদার্থকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই পদার্থের প্রতি তিনি তাঁর অনন্ত কুদরত ও প্রতাপের দৃষ্টি করেন। ফলে তা' বিগলিত হয়ে যায় এবং ভয়ে কাঁপতে থাকে। এভাবে সমগ্র পদার্থ কম্পমান পানিতে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই পানির প্রতি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। তাতে সমগ্র পানির অর্ধেক পরিমাণ জমাট হয়ে যায়। এই জমাট অংশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর এই আরশও কাঁপতে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর লিখে দেন কালেমা তাইয়্যিবাহ্ ঃ

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَـمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

ফলে, আরশ সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট পানির অংশটি কম্পমান অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে, জগতের সমস্ত পানি অদ্যাবধি কম্পমান অবস্থায় রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُـهٗ عَلَى الْمَـاءِ

'এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।' (হূদ ঃ ৭)

এরপর সেই পানিতে প্রচণ্ড ঊর্মিসংঘাত ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়ে তা' থেকে বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তা' ক্রমান্বয়ে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে ঊর্ধ্বে শূন্যের দিকে আরোহণ করে। বস্তুতঃ তাতে ছিল ফেনার উপকরণ। এ দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা উপরিভাগে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং নিম্নভাগে পৃথিবী। প্রথমতঃ এ উভয় সৃষ্টি ছিল পরস্পর সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর ভিতর বায়ুর সঞ্চার করে আসমান ও যমীনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর

সৃষ্টি করলেন এবং সবগুলোকে পৃথক পৃথক অবস্থান দান করলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ

'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ।' (হা-মীম সিজ্‌দাহ ঃ ১১)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে ধুম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; বাষ্প থেকে নয়। এর কারণ হচ্ছে, ধুম্র সৃষ্টিগতভাবে শান্ত এবং এর এক অংশ অপর অংশকে উত্তোলিত করে রাখে। পক্ষান্তরে, বাষ্প সর্বদা বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত থাকে। বস্তুতঃ এ সবকিছু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের অনন্ত মহিমা ও অসীম প্রজ্ঞার অকাট্য দলীল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির প্রতি পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি করেন। ফলে, তা শান্ত হয়ে যায়।

পৃথিবী ও নিম্নতম আকাশের মাঝে দুরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ শত বছরের পথ। অনুরূপ, এক আকাশ থেকে অপর আকাশ পর্যন্ত দুরত্বও তাই। এমনিভাবে, প্রত্যেক আসমানের স্থূলতাও পাঁচ শত বছরের পথ।

কথিত আছে,—নিম্নতম আকাশ তথা পৃথিবীর আসমানের প্রকৃত রং হচ্ছে শুভ্র ; কিন্তু 'ক্বাফ' পর্বতের নীলিমায় (প্রতিবিম্বিত হয়ে) তা' দৃশ্যতঃ নীল বর্ণের দেখায়। এ আসমানের নাম হচ্ছে 'রক্বীয়া'। দ্বিতীয় আসমান হচ্ছে লৌহজাত বস্তুর। এটির নাম ফায়দূম বা মাউন। সর্বদা এ আসমান নূরের জ্যোতির ন্যায় চমকাচ্ছে। তৃতীয় আসমান তামা দ্বারা গঠিত। এর নাম মালাকূত বা হারিয়ূন। চতুর্থ আসমান হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র রূপার দ্বারা গঠিত, বিদ্যুতালোকের ন্যায় তা' এমনভাবে চমকাচ্ছে যেন দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবে। এ আসমানের নাম 'যাহেরাহ্'। পঞ্চম আসমানটি হচ্ছে লাল স্বর্ণের। এর নাম 'মুযাইয়্যানাহ্' বা 'মুসাহ্হারাহ্'। ষষ্ঠ আসমান জওহর তথা মহামূল্য পাথর দ্বারা গঠিত। নূরের জ্যোতিতে অতি উজ্জ্বল এ আসমান। নাম 'খালেসাহ্'। সপ্তম আকাশ হচ্ছে মহামূল্য ইয়াকূত তথা লাল বর্ণের প্রবাল পাথর দিয়ে তৈরী। এর নাম 'লাবিয়াহ্' অথবা 'দামিয়াহ্'। আর এ

আসমানেই রয়েছে বাইতুল–মা'মূর, যার কোণ–চতুষ্টয়ের একটি লাল ইয়াকূত রত্নের, দ্বিতীয়টি সবুজ পান্না রত্নের, তৃতীয়টি শুভ্র রূপার এবং চতুর্থটি লাল স্বর্ণের তৈরী। বর্ণিত আছে,—'বাইতুল–মা'মূর মহামুল্য আকীক পাথরে তৈরী। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা এর তওয়াফ করে। একবার তওয়াফ করে যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তাদের আর সুযোগ হয় না।' নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য প্রমাণিত যে, যমীন আসমানের তুলনায় অধিক ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখানেই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর যমীনের সকল স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, এ পৃথিবী যা সর্বোচ্চ স্তর। কারণ, এ থেকেই সমগ্র জগতবাসী উপকৃত হয়ে থাকে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আকাশমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে, যে আকাশের ছাদ আল্লাহ্‌র আরশের সাথে মিলিত। আর আরশের সংলগ্নতার কারণে এখানেই কুরসীর অবস্থান। অনুরূপ, এ আকাশেই প্রোথিত রয়েছে মানবের কল্যাণার্থে সকল নক্ষত্র ও গ্রহ–উপগ্রহ। তবে বড় বড় সাতটি গ্রহ প্রোথিত রয়েছে সপ্ত আকাশে। যথা ঃ সপ্তম আকাশে রয়েছে শনিগ্রহ, ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে বৃহস্পতি, এমনিভাবে পঞ্চম আকাশে মঙ্গলগ্রহ, চতুর্থ আকাশে সূর্য, তৃতীয় আকাশে শুক্র, দ্বিতীয় আকাশে বুধ এবং প্রথম আকাশে চন্দ্র।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি সপ্ত আকাশকে ধূম্রকুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন ; অথচ এগুলোর পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নাই। অনুরূপ, আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টিপাত করে একই পানি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতা ও রকমারী ফলমূল সৃষ্টি করেন ; কোনটা সাদা, কোনটা লালচে, কোনটা হলদেটে, আবার কোনটা মিষ্ট, কোনটা টক, কোনটা পানসে ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ

'আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই।' (রা'দ ঃ ৪)

এমনিভাবে অঞ্চল ভেদে মানুষের বর্ণ বৈষম্য ; কেউ শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। আবার কেউ উৎফুল্ল, কেউ

চিন্তাগ্রস্ত ; কেউ মু'মিন, কেউ কাফের, কেউ আলেম, কেউ জাহেল ; অথচ সকলেই একই আদমের সন্তান এবং তাঁরই বংশধর। বস্তুতঃ এ হচ্ছে মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি নৈপুণ্য।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

(নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।)

অধ্যায় ঃ ৩০

কুর্‌সী, আরশ, ফেরেশ্‌তা রুজি-রোজগার ও তাওয়াক্কুল

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

'তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।' (বাক্বারাহ্‌ ঃ ২৫৫)

আয়াতে উল্লেখিত 'কুরসী'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এতদ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনন্ত ইল্‌মকে বোঝানো হয়েছে।' আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'এ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার একক রাজত্ব ও মহাপরাক্রম-শীলতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।' কেউ কেউ 'কুরসী' বলতে সুনির্দিষ্ট একটি আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে এ সম্পর্কে যে তথ্য বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে,—তিনি বলেন ঃ 'কুরসী হচ্ছে মহামূল্য মোতি অর্থাৎ মুক্তার তৈরী ; এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যে কত অধিক তা একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকই জানেন।' এক বর্ণনায় প্রকাশ,—'কুরসীর সঙ্গে সাত আসমান ও সাত যমীনের তুলনা হচ্ছে, বিরাট ময়দানে ফেলে দেওয়া একটি আংটির মত।' ইব্‌নে মাজাহ্‌ শরীফে আছে,—'আকাশমণ্ডলীর অবস্থান হচ্ছে কুরসীর গর্ভে, আর কুরসীর অবস্থান হচ্ছে আরশের সম্মুখে।'

হযরত ইক্‌রিমাহ্‌ থেকে বর্ণিত,—'সূর্যের কিরণ কুরসীর নূরের সত্তর ভাগের এক ভাগ। আর আরশ নূরের সত্তর হাজার পরতের একাংশ।' বর্ণিত আছে,—'আরশ বহনকারী ও কুরসী বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে সত্তর হাজার অন্ধকারের পর্দা এবং সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে।' এগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ পাঁচ শত বছরের পথ। যদি এসব পর্দা না হতো, তা' হলে কুরসী বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ জ্বলে ছাই হয়ে যেতো। আর আরশ যেহেতু কুরসীর উপরে অবস্থিত জ্যোতিষ্মান পদার্থ, তাই সেটা স্বতন্ত্র

বস্তু। তবে হাসান বসরী (রহঃ) এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ মহামূল্য লাল বর্ণের ইয়াকুত তথা প্রবাল পাথরের তৈরী। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আরশ সাদা মোতির তৈরী। কেউ কেউ সবুজ জওহরের তৈরী বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ নূরের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও চমৎকার অভিমত হচ্ছে,—'এ ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য না করে বিরতি অবলম্বন করাই উচিত।'

জ্যোতির্বিদগণ আরশকে 'নবম আকাশ' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই আরশকেই তাঁরা কখনও 'ফালাকে আ'লা' (উচ্চতম আকাশ), কখনও 'ফালাকুল-আফ্লাক' (আকাশমণ্ডলীর আকাশ), আবার কখনও 'ফালাকে আত্লাস' (গ্রহ-নক্ষত্রশূন্য আকাশ) নাম দিয়ে থাকেন। কেননা, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের অভিমত অনুযায়ী সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র অষ্টম আকাশে প্রোথিত এবং এই অষ্টম আকাশকে তাঁরা 'ফালাকে বুরূজ' (গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়ত অনুসারীদের দৃষ্টিতে এ (অষ্টম) আকাশই হচ্ছে 'কুরসী' যা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ছাদের অবস্থানে রয়েছে, যার ঘেরাও সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বান্দার জ্ঞান-গবেষণা এ পর্যন্ত পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় ; এরপর কি তা উদঘাটন করার ক্ষমতা বান্দার নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

'এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কারও বন্দেগী নাই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।' (তওবা ঃ ১২৮)

উক্ত আয়াতে 'আরশ'-এর জন্য বিশেষণ রূপে 'আজীম' অর্থাৎ, 'মহান' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরশ সমগ্র জগতে আল্লাহ্র সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত উপরোক্ত তাওয়াক্কুল ও ভরসার সর্বতোভাবে

হক আদায় করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ জন্যেই পবিত্র আসমানী গ্রন্থ তাওরাত প্রভৃতিতে তাঁকে 'মুতাওয়াক্কেল' (আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসাকারী) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা তাওয়াক্কুল হচ্ছে মূলতঃ আল্লাহ্র একত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি। আর হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সমস্ত একত্ববাদী ও আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত আরেফীনের মহান সরদার।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কাজে-কর্মে চেষ্টা-তদবীর করা এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা মোটেও তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয় ; বরং এর জন্যে রীতিমত হুকুম করা হয়েছে। একদা জনৈক বেদুঈন লোক হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো,—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো, না বাঁধনমুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবো?' তিনি জওয়াবে বললেন ঃ 'সর্বাগ্রে উষ্ট্রীকে দড়ি দিয়ে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।'

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا۔

'তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে, তা' হলে পাখীদের তিনি যেভাবে রিযিক পৌছিয়ে দেন, তোমাদেরও তেমনি পৌছিয়ে দিতেন। পাখীরা সকালে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় পেটপুরে তৃপ্ত হয়ে ফিরে।' 'পাখীরা বের হয়' এ অংশটুকু দ্বারা হাদীস শরীফে উপায়াদি অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একদা বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শকীক বলখী (রহঃ)-এর সঙ্গে ইব্রাহীম আদ্হামের মক্কা মুকার্‌রামায় সাক্ষাৎ হয়। শকীক বলখীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'বুযুর্গীর এ উচ্চতম পর্যায়ে আপনি কিভাবে উন্নীত হলেন?' তিনি বললেন ঃ 'একদা আমি তরুলতা বিহীন বিজন এক প্রান্তরে একটি পাখী

পড়ে থাকতে দেখি। পাখীটির দু'টি ডানাই ভেঙ্গে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে পঙ্গু পাখীটির জীবিকার ব্যবস্থা কি? তা' অবলোকন করার জন্য একটু দূরে বসে সেদিকে লক্ষ্য করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, একটি সুস্থ–সক্ষম পাখী ঠোঁটে করে একটি ফড়িং এনে তাকে খাওয়াইয়ে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমি চিন্তা করলাম, যে মহান সত্ত্বা এই পঙ্গু পাখীটির জীবিকার জন্য আরেকটি পাখী নিয়োগ করে রেখেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে যেকোন অবস্থায় রিযিক দান করার ক্ষমতা রাখেন। অতঃপর আমি কাজ–কারবার পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত–বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে পড়ি।' এ কথা শুনে হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম বললেন,—'হে শক্বীক্ব! এর চাইতেও উচ্চতর মর্যাদা হলো, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

'দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন সর্বদা চেষ্টা করবে সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা হাসিল করতে ; এভাবে সে 'আবরার'–এর মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের মুখে উক্তরূপ বক্তব্য শুনে শক্বীক্ব (রহঃ) শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ 'হে আবূ ইসহাক্ব! (ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের উপনাম) আজ থেকে আপনি আমার উস্তায ও দীক্ষাদাতা।' বস্তুতঃ কাজে–কর্মে মানুষ যদিও উপায়–উপকরণ অবলম্বন করবে ; কিন্তু এগুলোর প্রতি সে মোটেও দৃষ্টি করবে না ; একমাত্র ভরসা ও নির্ভর করবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। যেমন ভিক্ষুক হাতে থলি নিয়ে যখন লোকদের নিকট যায়,তখন তার দৃষ্টি কখনও স্বীয় থলির প্রতি থাকে না, বরং সর্বক্ষণ সে দাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِىْ يَدَيْهِ۔

'যে ব্যক্তি জীবিকার ব্যাপারে অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চায়, সে যেন

নিজের (কাছে রক্ষিত) সম্পদের চাইতে আল্লাহ্‌র (কাছে রক্ষিত) সম্পদের প্রতি বেশী আশাবাদী ও ভরসাকারী হয়।'

বর্ণিত আছে,—হযরত হুযাইফা মারআসী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (রহঃ)-এর খাদেম ছিলেন। একদা লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'আপনি দীর্ঘকালব্যাপী হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের সংসর্গে ছিলেন। তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্যকর কি অলৌকিক বিষয় দেখেছেন, তা বলুন। হযরত হুযাইফা বললেন ঃ 'একবার আমরা উভয়ে মক্কা শরীফ অভিমুখে গমন করছিলাম। পথিমধ্যে আমরা উভয়ে অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়ে পড়লাম। কুফা শহরে পৌঁছে আমরা একটি মসজিদে বসলাম। তখন ক্ষুধার লক্ষণ আমার মধ্যে বড় ভীষণভাবে প্রকট হয়ে পড়েছিল। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার কারণে তুমি কি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছো?' আমি বললাম ঃ 'হাঁ'। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'কাগজ, কলম ও দোয়াত আন।' আমি আদেশ পালন করলে তিনি কাগজে লিখলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আয় আল্লাহ্! সর্বাবস্থায় একমাত্র তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য, সকলের লক্ষ্য তোমারই দিকে, আমরা সর্বদা তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকরে মগ্ন থাকি, কিন্তু বিবস্ত্র, নিরন্ন ও ধ্বংসন্মুখ অবস্থায় কালাতিপাতি করছি। তোমার প্রশংসা, শোকরগুযারী ও যিকর এই তিন কার্য আমার কর্তব্য বানিয়ে নিয়েছি ; এগুলোর জন্য আমি দায়ী। তুমি অপর তিন বস্তু অর্থাৎ, অন্ন, পানি ও বস্ত্র আমাকে সরবরাহ কর এবং এগুলোর জন্য তুমি জামিন থাক। আমি যদি তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রশংসা করি, তবে সেটা হবে আমার জন্য অগ্নিকুণ্ড। ফলে, দোযখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু থাকবে না।' এই কথাগুলো লিখে কাগজখণ্ডটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ 'এটি নিয়ে বের হয়ে যাও এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কিছুতে মন লাগিয়ো না। প্রথমেই যার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তার হস্তে এই কাগজখণ্ডটি প্রদান কর।' আমি কাগজখণ্ডটি নিয়ে বাইরে এসেই দেখলাম, এক ব্যক্তি উষ্ট্রারোহণে পথ অতিক্রম করছে। আমি তার হস্তে সেই কাগজখণ্ডটি দিলাম। কাগজখণ্ডটি পাঠ করে সে কাঁদতে লাগলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই চিঠির লিখক কোথায় আছেন?' আমি তাঁর ঠিকানা দিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি ছয় শত দীনারপূর্ণ একটি থলি আমার

হাতে দিলেন। আমি পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয় জানতে পারলাম, তিনি একজন খৃষ্টান। অতঃপর আমি হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হামের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ 'থলিতে হাত লাগিয়ো না, এই থলির মালিক শীঘ্রই এখানে আসছে।' ইতিমধ্যে সেই খৃষ্টান লোকটি এসে উপস্থিত হলো এবং হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হামের পদচুম্বন করে তাঁর হস্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করে হুকুম করলেন ঃ 'তোমরা আমার আরশ বহন কর।' কিন্তু তারা তা' বহন করতে অক্ষম হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বহনকারী ফেরেশ্‌তার সহযোগিতার জন্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত ফেরেশ্‌তাকুলের সমপরিমাণ আরও ফেরেশতা সৃষ্টি করে সমবেতভাবে সকলকে আরশ বহন করার হুকুম করলেন। কিন্তু এবারও তারা অপারগ হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন,—তোমরা সকলেই لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পড়ে নাও। এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার মহান আরশকে উত্তোলন করতে সক্ষম হলো ; কিন্তু তাদের পদভর যমীনের সপ্তম তবকের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেল। ফলে, সকলেই নিম্নদিকের আশংকাজনক অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরশকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং সর্বদা শঙ্কিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পাঠে নিমগ্ন রয়েছে। এ হলো মহামহিয়ান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাদের অবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে এই মহান কাজের তাওফীক দিচ্ছেন। বস্তুতঃ এটা তাঁর অনন্ত কুদরত ও অসীম ক্ষমতার সামান্যতম প্রকাশ মাত্র।

বর্ণিত আছে,—'যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতখানি (حَسْبِيَ اللّٰهُ ..... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কাজ সহজ করে দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা ও বালা-মুসীবত দূর করে তাকে সাহায্য করবেন।

অধ্যায় ঃ ৩১

দুনিয়ার অপকারিতা ও দুনিয়াত্যাগ

দুনিয়ার অপকারিতা ও অসারতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহুসংখ্যক আয়াত রয়েছে। কুরআন মজীদের বৃহত্তর অংশে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতার কথাই আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, বান্দাদিগকে দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট করা। বরং তা–ই ছিল সমস্ত নবী–রসূলের আগমনেরও উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের এতদসম্পর্কিত দলীলসমূহ সুস্পষ্ট। তাই, বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে এখানে আমরা কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করছি।

বর্ণিত আছে,—'রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মরা বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ধারণা কি এই যে,—এ বকরীর মালিকের দৃষ্টিতে এটি মূল্যহীন ছিলো? তাঁরা বললেন, মূল্যহীন ও অপদার্থ ভেবেই তো দূরে নিক্ষেপ করেছে। হুযুর বললেন, ঐ আল্লাহ্র কসম যার হাতে আমার প্রাণ, সমগ্র দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এ মৃত বকরীর চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি মশার ডানা বরাবরও হতো তা' হলে কোন কাফেরকে তিনি এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য বেহেশ্তখানা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْهَا۔

'দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু অভিশপ্ত ; কেবল ঐ হিস্যাটুকু ছাড়া যা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

হযরত আবূ-মূসা আশ্আরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى۔

'যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখেরাতকে ভালবাসবে, সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তোমরা চিরস্থায়ীকে ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য প্রদান কর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ۔

'দুনিয়ার মহব্বত ও লিপ্সা সমস্ত গুনাহের মূল।'

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম। তিনি কোন পানীয় চাইলেন। তাঁর সম্মুখে পানি ও মধু পেশ করা হলো। পান করার জন্য হাতে নিয়েই তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের কান্না থামলো। কিন্তু হযরত আবু-বকর (রাযিঃ)-এর কান্না থামলো না। তাঁর অশ্রুধারা যেন আরও প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিতরা ভাবলেন, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নাই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি চোখের পানি মুছলেন। লোকেরা আরজ করলেন, হে রাসূলে খোদার সত্য খলীফা! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম, তিনি কি যেন অপসারণ করছেন, অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি সরাচ্ছেন? তিনি বললেন, তা ছিল দুনিয়া। আমার সম্মুখে হাজির হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আমার কাছ থেকে সরে যাও। সরে গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বলতে লাগলো, আপনি যদিও আমা থেকে দূরে থাকছেন, আপনার পরবর্তীরা কিন্তু আমা হতে দূরে থাকবে না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ চিরনিবাস আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের দেখে বিস্ময় লাগে যে, (কিভাবে তারা) ধোকার আবাস দুনিয়ার জন্য মেহনত করে চলেছে। বর্ণিত আছে, একদা তিনি এক আবর্জনা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, দুনিয়ার পানে আস! এই বলে, আবর্জনার মধ্য হতে একটা পচা অংশ তুলে নিলেন যাতে পুরানো হাড্ডিসমূহ পড়েছিল। অতঃপর বললেন, এই হলো দুনিয়া। এতে ইশারা ছিল যে, দুনিয়ার যত রূপ-রঙে অচিরেই পচন ধরবে, তা ঐ পচা আবর্জনাখণ্ডের মত। এই সুন্দর শরীর অচিরেই কেবল হাড্ডি আর হাড্ডিতে পরিণত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

'দুনিয়া সবুজ (মনোহারা), মিষ্টি (ও লোভনীয়)। আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে এর মালিক বানিয়ে দেখতে চান যে, তোমরা কি আমল কর, কিরূপ জিন্দেগী বানাও।'

বনী ইসরাঈলদের যখন বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী করে দেওয়া হলো তখন তারা নারী, অলঙ্কার, পোশাক-আশাক ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির মধ্যে ডুবে গেলো। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা দুনিয়াকে নিজেদের 'রব্ব্' করো না ; অন্যথায় দুনিয়া তোমাদেরকে তার গোলামে পরিণত করবে। যা তোমার 'নিজস্ব সম্পদ' তা নিজের হিফাযতে রাখ, তা বরবাদ হবে না। কারণ, পার্থিব স্বার্থে সম্পদ জমাকারীদের উপর সমূহ বিপদের আশংকা। কিন্তু 'আল্লাহ্র সম্পদের' যারা অধিকারী তাদের কোন বিপদের আশংকা নাই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে আমার সাহায্যকারী বন্ধুগোষ্ঠী! তোমাদের স্বার্থে আমি দুনিয়াকে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করেছি। তাই, আমার পরে তোমরা যেন শ্রদ্ধা-ভক্তি শুরু না কর। কারণ, দুনিয়ার অন্যতম অপকারিতা হলো, আখেরাত বিসর্জন দেওয়া ব্যতীত 'দুনিয়া' মিলে না। তাই, দুনিয়ার প্রীতিমুক্ত থেকেই জীবন কাটিয়ে দাও। দুনিয়াকে আবাদ করো না। এও মনে রাখ যে, দুনিয়ার মোহই

সকল পাপের মূল। অনেক সময় কিছুক্ষণের মোহগ্রস্ততা দীর্ঘকালের দুঃখ ও বিপদ ডেকে আনে।

তিনি আরও বলেন, দুনিয়াকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা তার পিঠে সওয়ারও হয়ে গেছ। এখন রাজন্যবর্গ ও নারীদের যেন দুনিয়ার প্রশ্নে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া না করতে হয়। দুনিয়ার জন্য তাদের সাথে সংঘর্ষ করো না। কারণ, তোমরা যদি দুনিয়াকে তাদের হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদের সঙ্গে ভাগ না বসাতে চাও, তা' হলে তারাও তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাটি বাঁধাবে না। আর নারীদের থেকে আত্মরক্ষার পথ হলো, তোমরা রোযা রাখতে ও নামায পড়তে থাকবে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ فَطَالِبُ الْاٰخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ فِيْهَا رِزْقَهُ وَطَالِبُ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ الْاٰخِرَةُ حَتّٰى يَجِيْئَ الْمَوْتُ فَيَاْخُذَ بِعُنُقِهٖ

'দুনিয়া স্বয়ং প্রার্থী এবং প্রার্থিতও। যে আখেরাত অন্বেষণ করে, দুনিয়া তাকে খুঁজে বেড়ায়। ফলে, রিযিক পরিপূর্ণ হয়ে তার হাতে পৌঁছে যায়। আর যে দুনিয়াকে খুঁজে বেড়ায়, ওদিকে আখেরাত তাকে খুঁজে কাটায়। অবশেষে মৃত্যু এসে তার ঘাড় ধরে টান মারে।'

হযরত মূসা বিন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَاِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا۔

'আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার চাইতে ঘৃণ্য-জঘন্য আর কিছু সৃষ্টি করেন নাই। তাকে সৃষ্টি করবার সময় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।'

বর্ণিত আছে, হযরত সুলাইমান ইব্‌নে দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) তাঁর সেই 'তখতে সুলাইমানী'তে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাখীরা উপর হতে

ছায়া করে রেখেছিল। ডানে-বামে ছিল মানব ও জ্বিনের দল। সিংহাসনটি জনৈক আবেদের (বুযুর্গের) নিকট দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম, হে দাউদের পুত্র! আল্লাহ্ তোমাকে বিশাল রাজত্বের অধিপতি করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর কথাটা কানে পৌছতেই জবাব দিলেন, শোন,—একবার সুব্হানাল্লাহ্ সেই বস্তুর (দুনিয়ার) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে যার অধিপতি করা হয়েছে। কারণ, দাউদের ছেলে যে জিনিসের অধিকারী তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ; আল্লাহ্র তস্বীহ চিরদিন বাকী থাকবে, কোনদিন তার ধ্বংস নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

'প্রাচুর্যের মোহ ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্-ভোলা করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১) আদম-সন্তান কেবল বলে বেড়ায়, আমার মাল, আমার মাল। অথচ, তোমার মাল শুধু অতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করেছ অথবা সদ্কা করে আল্লাহ্র কাছে জমা করেছ।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَّا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهُ وَعَلَيْهَا يُعَادِىْ مَنْ لَّا عِلْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَنْ لَّا فِقْهَ لَهُ وَلَهَا يَسْعٰى مَنْ لَّا يَقِيْنَ لَهُ ـ

যার (দ্বিতীয়) কোন ঘর নাই, দুনিয়া তার ঘর। যার মাল বলতে কিছু নাই, দুনিয়া তার মাল। যার আকল-বুদ্ধি বলতে নাই, সে-ই দুনিয়ার জন্য জমা করে। যার বিদ্যা-জ্ঞান মোটেও নাই, সে-ই দুনিয়ার প্রশ্নে শত্রুতা করে। যার কোন বুঝ নাই সে-ই তার জন্য হিংসা করে। যার মধ্যে ইয়াকীন নাই সে-ই তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ وَالدُّنْيَا اَكْبَرُ هَمِّهٖ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْئٍ الخ

'দুনিয়াই সবচে বড় ফিকির'—এই অবস্থায় যার সকাল হয়— তার (ভালাইর) কোন যিম্মাদারী আল্লাহ্‌র উপর থাকে না। আল্লাহ্ পাক চারটি জিনিসকে তার অন্তরের আবশ্যিক অনুসঙ্গ করে দেন ঃ এমন পেরেশানী যা থেকে কখনও নিষ্কৃতি মিলে না, এমন ব্যস্ততা যদ্দরুণ কখনও ফুরসৎ মিলে না, এমন অভাব-অনটন যা তাকে সচ্ছলতার মুখ দেখতে দেয় না, এমন আশা যা কোনদিন পুরা হয় না।'

হযরত আবু-হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ হে আবু-হুরায়রাহ্! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে—সব দেখিয়ে দিবো? আমি বললাম, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি আমার হাত ধরে আমাকে মদীনার এক উপত্যকায় নিয়ে গেলেন—যেখানে আবর্জনার একটা স্তূপ পড়েছিল। তা ছিল মাথার খুপরি, পচা-গলিজ, পুরনো-জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ও কঙ্কালের স্তূপ। বললেন, হে আবু-হুরায়রাহ্! এই খুপরিগুলোও তোমাদের মত কত লালসা, কত রকমের আশা পোষণ করতো। আজ দেখ, তা হাড্ডিসার হয়ে পড়ে আছে। তাদের চামড়াগুলো খাক হয়ে গেছে। এই যে ময়লার ডিপো দেখছো, এ হলো তোমাদের উদরের খাদ্যসমূহ, যা তোমরা বিভিন্ন জায়গা হতে উপার্জন করেছিলে এবং উদরে ভরেছিলে। কিন্তু পেট সেগুলো বাইরে ঢেলে দিয়েছে। মানুষ আজ তাদের দেখে ঘৃণা করছে। আর এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হচ্ছে তোমাদের পোশাক-আশাক যা তোমাদের দেহের শোভা ছিল। আজ তা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে কঙ্কালগুলো, এ সেই কঙ্কাল যার উপর ভর করে শহর-বন্দর চষে বেড়াচ্ছিলে। দুনিয়ার পরিণতির জন্য কারো যদি কাঁদতে ইচ্ছা হয়, তবে এ করুণ দশা দেখে সত্যি কাঁদা উচিত।—বর্ণনাকারী বলেন, হুযূরের এ কথা শ্রবণে আমাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

দাঊদ ইব্‌নে হেলাল (রহঃ) বলেন, ইব্‌রাহীমী সহীফাসমূহে লেখা ছিল ঃ হে দুনিয়া! দেখ, নেক মানবদের চোখে তুমি কত মূল্যহীন, অথচ

তুমি তাদের শোভা-সৌন্দর্য ছিলে। কিন্তু, আমি তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে তোমা থেকে দূরে রেখেছি। ঘৃণ্য ও ধ্বংসশীল বস্তুনিচয়ের মধ্যে তোমাকেই আমি সর্বাধিক নিকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছি। আমার ফয়সালা এই যে, তুমি কারো জন্য চিরস্থায়ী হবে না এবং কেউ তোমার চিরসাথী হবে না ; চাই দুনিয়াদার লোকেরা যত কার্পণ্য-কঞ্জুসীই করুক না কেন। আর যাদের হৃদয় সত্য, খাঁটিত্ব, সত্যের উপর মজবুতি ও অবিচলতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টির দৌলতে পরিপূর্ণ, সেই নেক্-মানবদের প্রতি আমার সুসংবাদ। তাদের জন্য আমার অন্যতম পুরস্কার এই যে, কবর হতে উত্থানকালে তাদের সম্মুখে থাকবে নূর ও জ্যোতি এবং ফেরেশ্‌তাগণ চতুর্দিক হতে তাদের বেষ্টন করে রাখবে। এভাবে তাদেরকে আমার 'রহ্‌মত' পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে—অন্তরে যে রহ্‌মতের তারা আশা পোষণ করছিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল। আল্লাহ্ পাক তার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌কে বলবে ঃ হে মহান প্রতিপালক! আপনার ওলীদিগের মধ্যে আমার কিছু অংশ বিতরণের জন্য আজ আমায় অনুমতি দিন। আল্লাহ্ বলবেন, ওরে নিকৃষ্ট, তাদেরকে তোর মত নিকৃষ্টের কিছু অংশ দিতে দুনিয়াতেই আমি রাজী ছিলাম না। আজ (ওদের পরম ইয্‌যত ও পুরস্কার দিবসে) কিভাবে তাতে আমি সম্মত হতে পারি?

বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন, তখন তার পেটের ভিতর মল নিঃসারণের জন্য মোড় দিয়ে উঠে। এ ত্রুটি বেহেশ্‌তের বৃক্ষরাজির মধ্যে অন্য কোনটিতে ছিল না। বস্তুতঃ এজন্যই নিষেধ করা হয়েছিল। যাক, হযরত আদম (আঃ) তখন বেহেশ্‌তের মধ্যে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক জনৈক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, আদমকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে চায় কি? তিনি জবাব দিলেন, কষ্টদায়ক গলীয বাইরে নিক্ষেপ করতে চাই। আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাকে বললেন, জিজ্ঞাসা কর, কোথায় ফেলতে চায়, ফরাশের উপর না পালংকের উপর? নাকি নহরের মাঝে না বৃক্ষের ছায়ায়? এ কাজের উপযুক্ত কোন স্থান আছে বেহেশ্‌তের

মাঝে? নাই। এজন্যই তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন এমন বহু লোককেও হাজির করা হবে যাদের আমল হবে তেহামার পাহাড় সম ; কিন্তু তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তারা কি নামাযী? তিনি বললেন, হাঁ, তারা নামাযও পড়বে রোযাও রাখবে। কিন্তু রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হবে এবং দুনিয়া লাভের সুযোগ পেলে লাফিয়ে ছুটবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খুৎবায় বলেছিলেন :

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِىَ لَا يَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهٖ لِنَفْسِهٖ وَمِنْ دُنْيَاهُ لِاٰخِرَتِهٖ وَمِنْ حَيَاتِهٖ لِمَوْتِهٖ وَمِنْ شَبَابِهٖ لِهَرَمِهٖ فَاِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْاٰخِرَةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ

মু'মিন দু' প্রকার ভয়ের মাঝখানে জীবন কাটায় : এক. অতীত জীবনের ভয়। কারণ, সে জানে না, অতীতের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ্ পাক কি ফয়সালা করেন। দুই. অবশিষ্ট জীবনের ভয়। কারণ, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্র কি ফয়সালা তা জানা নাই। এজন্যই বান্দার উচিত এ দীর্ঘ পথের সম্বল যোগাড় করা, দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, বেঁচে থাকতে মৃত্যুর সামান সঞ্চয় করা, যৌবনেই বার্ধক্যের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করা। কারণ, দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পরে ক্লান্তি-শ্রান্তির কোন কাজ আর নাই এবং দুনিয়ার পরে বেহেশ্ত

বা দোযখ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঘর-বাড়ী নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আগুন আর পানি যেমন এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না, তদ্রূপ মু'মিনের দিলে দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বতও সমান শিকড় গাড়তে পারে না।

বর্ণিত আছে, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হযরত নূহ্‌ (আঃ)-কে বলেছিলেন, নবীকুলের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘজীবি হে নবী! দুনিয়াকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, যেমন অনেকগুলো দরজাবিশিষ্ট একটা ঘর—যার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম।

কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল, থাকার একটা ঘর বানিয়ে নিন না। তিনি জবাব দিলেন, আমার পূর্ববর্তীরা যে ঘর বানিয়ে রেখে গেছে, আমার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে আগমন করলেন। বললেন, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের অন্ধত্ব দূর হয়ে তোমরা চক্ষুষ্মান হয়ে যাও? মনে রেখো, যে যে-পরিমাণ দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আল্লাহ্‌ পাক সে-অনুযায়ী তার দিলকে অন্ধ করে দেন। আর যে দুনিয়া-বিমুখ হয় এবং আশাকে স্বল্প ও সংযত রাখে, আল্লাহ্‌ পাক তাকে শিক্ষা করা ছাড়াই ইলম্‌ দান করেন, কারো বাতলানো ছাড়াই হিদায়তের সরল পথ-প্রাপ্ত করেন। মনে রেখো, তোমাদের পর এমন কিছু লোকের জন্ম হবে যাদের রাজত্ব হবে হত্যা ও অত্যাচারের রাজত্ব। গর্ব ও কার্পণ্যই হবে তাদের বড় সম্পদ ; মনের কু-পরামর্শাদির অনুসরণই হবে তাদের 'ভালবাসা'। মনে রেখো, কেউ যদি সেই যমানা পাও তবে ধনবান হওয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিয়েই ছবর করবে। অসৎদের সাথে মহব্বতের ক্ষমতা থাকলেও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকেই মেনে নিও, পরাক্রমের ক্ষমতা সত্ত্বেও দুর্বল থাকাই মেনে নিও। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই যদি হয় এ সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য, তা' হলে আল্লাহ্‌ পাক তাকে পঞ্চাশ সিদ্দীকিনের বরাবর ছওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতসহ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত

হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তখন কোন আশ্রয় খুঁজছিলেন। দূর হতে একটা তাঁবু দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একজন মেয়ে মানুষ। তাই সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর পাহাড়ের একটা গুহা লক্ষ্য করে সেখানে চলে যান। গিয়ে দেখেন, গুহার মধ্যে এক সিংহ। তিনি তার পিঠে হাত রেখে দো'আ করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! সবার জন্যই আপনি কোন আশ্রয়স্থল রেখেছেন। কিন্তু আমার কোন আশ্রয়ঘাঁটি নাই। আল্লাহ্ পাক তখন ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! আমার রহমতই তোমার আশ্রয়ঘাঁটি। কিয়ামতের দিন আমার হাতে সৃষ্ট একশত হূরের সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দেবো। চার হাজার বছর নাগাদ তোমার ওলীমার খানা খাওয়াবো—যার এক একটি দিন হবে দুনিয়ার বয়সের সমান। আমি ঘোষণাকারীদের হুকুম করবো, তারা ঘোষণা করবে ঃ কোথায় দুনিয়াত্যাগী বান্দারা? হে দুনিয়াত্যাগী যাহেদগণ! ঈসা ইব্নে মরিয়মের শাদী-মোবারকে অংশগ্রহণ করুন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়াদারদের বরবাদির জন্য আক্ষেপ! কিভাবে তাদের মৃত্যু হবে? ধোকার দুনিয়া, শোভা-সৌন্দর্য ও যাবতীয় মালিকানা ত্যাগ করে রওনা হতে হবে। ধোকাগ্রস্তদের প্রতি আক্ষেপ! কি হালত হবে যখন তারা তাদের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি (আযাব) দেখবে আর যা (দুনিয়া) ছিল তাদের পরম বাঞ্ছিত তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, প্রতিশ্রুত সেই দিনটি আসবেই। —দুনিয়াই যার একমাত্র ধান্দা আর আমল বলতে শুধু গুনাহ্ আর গুনাহ্—হায়, কি ধ্বংসাত্মক পরিণাম হবে তাদের। পাপের প্রায়শ্চিত্তে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছিলেন ঃ 'হে মূসা! যালিমদের ঘরের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? তা তোমার ঘর কিছুতেই নয়। এই ঘরের খেয়াল তুমি দিল থেকে বের করে দাও, দূর করে ফেল। যালিমদের ঘর জঘন্য ঘর। হাঁ যে-ব্যক্তি সেখানে নেক আমল করে তার জন্য তা' কল্যাণময় ঘর বটে। হে মূসা! আমি যালিমদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছি। আমি মযলূমের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবো।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ-

উবাইদাহ্ ইবনুল-জাররাহ্ (রাযিঃ)-কে বাহ্রাইনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বহু মালামাল সহ বাহ্রাইন থেকে ফিরে আসেন। আনসারগণ এ খবর শুনলেন এবং হুযূরের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর তাদের দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি তাদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবু-উবাইদাহ্ কিছু নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, ঠিক আছে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্ যা কিছু দান করেন তার আশা রাখ। কিন্তু, আল্লাহ্র কসম, দারিদ্র্যকে আমি তোমাদের জন্য আশংকাজনক মনে করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, না-জানি তোমাদেরকে দুনিয়ার বিপুল ভাণ্ডারের অধিকারী করে দেওয়া হয়, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বেলায় তা' ঘটেছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়া-কামাইর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যাও, যেভাবে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল। পরিণামে দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।

হযরত আবূ-সাঈদ খুদ্রী (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে-জিনিসটিকে তোমাদের জন্য সর্বাধিক ভীতিপ্রদ মনে করি, তা-হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার খুলে দেওয়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, পৃথিবীর বরকত-ভাণ্ডার মানে? তিনি বললেন, দুনিয়ার ধন-সম্পদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজেদের অন্তরসমূহকে দুনিয়ার ভাবনায় মশগুল রেখো না। দুনিয়া উপার্জন দূরের কথা, দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকেও তিনি নিষেধ করেছেন।

হযরত আম্মার বিন সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এক বস্তির উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বস্তিবাসীরা ঘরের আঙ্গিনায় ও রাস্তার মধ্যে লাশ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আমার হাওয়ারী দল! আল্লাহ্র গযব এদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। তা' না-হয়ে যদি অন্য কিছু হতো তা'হলে অবশ্যই তারা দাফনকৃত থাকতো। তারা বললেন, হে রূহুল্লাহ্! এদের কি খবর তা' জানতে আমাদের আগ্রহ। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট এ মর্মে দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক ওহী

করলেন যে, রাত্রি এলে ওদের আওয়ায দিও, ওরা তোমাকে জবাব দিবে। রাত্রিবেলা তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে বস্তিবাসীরা! জবাব এলো, লাব্বাইক ইয়া রূহুল্লাহ্। তিনি বললেন, বল দেখি, তোমাদের কি ঘটনা? তাদের একজন বললো, আমরা নিরাপদে রাত যাপন করছিলাম। সকাল হলেই আমরা এ লাঞ্ছনার শিকার হলাম। তিনি বললেন, এর কারণ কি? বললো, দুনিয়ার ভালবাসা আর না–ফরমানদের অনুকরণ–অনুসরণ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুনিয়াকে কিরূপ ভালবাসতে? জবাব এলো ঃ যেভাবে শিশু তার মা–কে ভালবাসে। মা কাছে আসলে সে আনন্দিত হয় আর চলে গেলে সে বিষন্ন হয়ে যায় এবং কান্না আরম্ভ করে—আমাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা, তোমার সঙ্গীদের কি অবস্থা? তারা যে কোন জবাব দিচ্ছে না? সে বললো, কারণ, তারা নিষ্ঠুর–নির্দয়–কঠিনপ্রাণ ফেরেশ্‌তাদের হাতে 'আগুনের লাগাম' পরানো অবস্থায় রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তা' হলে তুমি কিভাবে জবাব দিচ্ছো? সে বললো, কারণ, আমি তাদের মাঝে বাস করতাম বটে, তবে আমি তাদের অনুসারী ছিলাম না। কিন্তু, যখন তাদের উপর আযাব আসলো তা' আমাকেও গ্রাস করলো। আমি এখন জাহান্নামের তীরে পড়ে আছি, জানিনা আমার মুক্তি হবে, নাকি মস্তক নিম্নমুখী করে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীদিগকে বললেন ঃ মোটা লবন দিয়ে রুটি খাওয়া, মোটা কাপড় পরিধান করা এবং আঁস্তাকুড়ের নিদ্রাও অনেক বড় কিছু—যদি তাতে অন্তরের শান্তি ও দোজাহানের কল্যাণ থাকে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উষ্ট্রী 'আয্‌বা' (এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে,) কেউ তার আগে যেতে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈনের উষ্ট্রী আয্‌বা–র আগে চলে গেলে সাহাবীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্ পাকের বিধান যে, যে–কোন বস্তুর উত্থানের পর আবার তিনি তার পতন ঘটান, (জোয়ারের পর ভাটাও সৃষ্টি করেন)।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ সাগরের তরঙ্গের উপর কি কেউ প্রাসাদ নির্মান করে? দুনিয়াটাও ঠিক অনুরূপ। তাই, এখানে 'সুখের নীড়' গড়তে

যেওনা। লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিল যে, আপনি আমাদিগকে এমন একটা ইল্‌ম শিখিয়ে দিন যার ফলে আল্লাহ্ পাক আমাদের মহব্বত করবেন। তিনি উত্তর দিলেন, দুনিয়াকে ঘৃণা কর তা' হলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন।

হযরত আবু-দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা কম হাসতে, বেশী বেশী কাঁদতে এবং দুনিয়া তোমাদের চোখে মূল্যহীন হয়ে যেত ; আখেরাতকে তোমরা সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতে। হযরত আবু-দারদা (রাযিঃ) উক্ত হাদীস শোনানোর পর নিজের পক্ষ থেকে বললেন, যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তা' হলে তোমরা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে, নিজেদের জীবনের জন্য অশ্রু ঝরাতে, যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তি তোমরা পাহারাদার বিহীন ফেলে রাখতে, অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সেসবের কোন খোঁজ-খবরই নিতে না। কিন্তু, ব্যাপার হলো, দুনিয়ার মোহ-মায়া তোমাদের মন থেকে আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা মুছে দিয়েছে। ফলে, দুনিয়া তোমাদের প্রভু আর তোমরা তার গোলামে পরিণত হয়েছ। তোমরা যেন আজ নির্বোধদের দলভুক্ত। চতুষ্পদ জন্তুরা যেমন পরিণাম চিন্তা করে কোন বিপদজ্জনক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে না—আজ তোমাদের অনেকের অবস্থা অবিকল সে-রকম। তোমরা একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা, কল্যাণকামিতা নাই। আসলে তোমাদের অন্তর বড় জঘন্য, সেই জঘন্য মন-মানসিকতাই তোমাদিগকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তোমরা সবাই যদি সৎ ও নেক হয়ে যেতে তা' হলে অবশ্যই তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে উঠতো। তোমাদের হলো কি, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে যেমনটা উদ্দীপিত হও, অন্যদেরও তাতে সহায়তা কর কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে সেই উৎসাহ অনুরাগের আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হয় না। তোমরা তোমাদের প্রিয়জনদের নসীহত কর না। এটা তোমাদের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়াতে লাভ-ক্ষতিকে যেরূপ বিশ্বাস কর, আখেরাতের লাভ-ক্ষতি, শান্তি-অশান্তিকে যদি সে-রকম বিশ্বাস করতে, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমরা আখেরাতের কাজের প্রাধান্য দিতে—সবকিছুর উর্ধ্বে জানতে। কারণ, আখেরাতের চেতনা

জীবনের সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করে। যদি এই প্রশ্ন তোল যে নগদের প্রতি আকর্ষণ স্বভাবতই প্রবল থাকে ; তা' হলে বলবো, তোমরা দুনিয়ার বহু নগদ স্বার্থকে কোন বিলম্বিত স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিচ্ছো, পরন্তু সেজন্য কঠিন পরিশ্রমও করে চলেছো। অথচ, এত প্রচেষ্টা সত্বেও তা তোমাদের হাতে আসার নিশ্চয়তা থাকে না। এ-তো জ্বলন্ত সত্য। তাই বড়ই নিকৃষ্ট সমাজ তোমরা, আজও তোমরা তোমাদের ঈমানকে বলিষ্ঠ ও যৌবন-প্রাপ্ত করতে পার নাই। আর যদি তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীন সম্পর্কেই সন্দেহের শিকার হয়ে গিয়ে থাক তা' হলে আস, তোমাদের সেই নূর ও আলোকোজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দিই যা তোমরা আন্তরিকভাবে মানতে বাধ্য হবে। তোমরা এতটা নির্বোধ নও যে, তোমাদের নির্দোষ কিংবা দায়িত্বমুক্ত বলা যেতে পারে। দুনিয়ার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তো তোমরা পাকা বুদ্ধির পরিচয় পেশ কর। সেক্ষেত্রে তো কোন অসাবধানতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় না। কি আশ্চর্য! দুনিয়ার সামান্য অংশ লাভেও তোমরা উল্লাসে ফেটে পড় আর সামান্য ক্ষতির জন্য দুঃখিত হও এবং তা তোমাদের চোখে মুখে, কথা-বার্তায়ও ফুটে উঠে। নিজেদেরকে বড় বিপদগ্রস্ত বলে চিৎকার শুরু করে দাও। অথচ তোমাদের অধিকাংশরাই দ্বীনের প্রায় সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু কই, তাদের চেহারায় বা হাল-অবস্থায় কোন বিষন্নভাব দেখা যায় না। আমার মনে হয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন।

তোমাদের অবস্থা হলো, তোমরা পরস্পর হাসি-মুখে মিলিত হও, কারো সাথে এমন আচার-আচরণ থেকে বিরত থাক যা তার কাছে অপছন্দীয়। যাতে সে তোমার সাথে কোন অবাঞ্ছিত আচরণ না করে সেজন্যই তুমি অনুরূপ কর, অথচ, হিংসা-বিদ্বেষে ভিতরটা ভর্তি হয়ে আছে। তোমাদের কামনা-বাসনার বহর অনেক দীর্ঘ। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছ। মন চায়, আল্লাহ্ পাক আমাকে তোমাদের থেকে মুক্ত করেন এবং যাদের দীদারের জন্য আমি পাগলপারা, তাদের কাছে যেন আমাকে পৌছিয়ে দেন। যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন তবে তোমাদের মাঝে কিছুতেই তাঁরা টিকতে পারতেন না। আমার যা বলার ছিল আমি তা' বলে গেলাম ; সদিচ্ছা থাকলে এটুকুই

যথেষ্ট। তোমরা যদি সেই দৌলত খোঁজ কর যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তবে খুব সহজেই তা' লাভ করতে পার। আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা দ্বীনকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দুনিয়ার সামান্য অংশের উপর সন্তুষ্ট থাক, যেভাবে দুনিয়াদারেরা তাদের দুনিয়াদারীকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখে দ্বীনের সামান্য অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ দুনিয়ার রাজা–বাদশা, আমীর–উমরারা সামান্য কিছু দ্বীনদারী নিয়েই তুষ্ট, অথচ জাগতিক সুখ–সম্ভোগের বেলায় তো তাদের অল্পের উপর তুষ্ট থাকতে দেখলাম না। অতএব, হে খোদাপ্রেমিক! যেভাবে ওরা দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, তুমিও তদ্রূপ ওদের দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যভরে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে দ্বীনকে আঁকড়ে ধর।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হে দুনিয়ার ভিক্ষুক! তুমি নেক হতে চেষ্টা কর। আর নেক হতে হলে তুমি দুনিয়া ত্যাগ কর।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে তোমাদের কাছে 'দুনিয়া' আসবে এবং তা তোমাদের ঈমানকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলবে যেভাবে আগুন শুকনো কাষ্ঠকে খেয়ে সাবাড় করে।

আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)–কে ওহীযোগে বলেছিলেন, হে মূসা! দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে পড়ো না। কারণ, এর চাইতে জঘন্য পাপ আর নাই। একবার হযরত মুসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে জনৈক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখলেন। আবার ফিরার সময়ও অনুরূপ ক্রন্দনরত দেখতে পেলেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তোমার বান্দা তোমার ভয়ে কাঁদছে। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ হে ইব্‌নে ইমরান! তার চোখের পানির সঙ্গে তার মগজও যদি গলে গলে প্রবাহিত হয় এবং মুনাজাতে হাত তুলে রাখতে রাখতে হস্তদ্বয় যদি সম্পূর্ণ অকেজোও হয়ে যায় ; তবু তাকে ক্ষমা করবো না যতক্ষণ সে দুনিয়াকে মহব্বত করবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে–ব্যক্তি ছয়টি গুণের অধিকারী হবে, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির আর কোনও পথ তাঁকে খুঁজতে

হবে না ঃ অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে চিনলো এবং তার আনুগত্য করলো ; শয়তানকে চিনলো এবং তার অবাধ্যতা করলো ; সত্যকে চিনলো এবং তার অনুসরণ করলো ; বাতিলকে চিনলো এবং তা থেকে বিরত রইলো ; দুনিয়াকে চিনলো এবং তাকে দূরে নিক্ষেপ করলো ; আখেরাতকে চিনলো এবং আখেরাত অন্বেষণে মশগুল হলো।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ পাক রহমত বর্ষণ করুন ঐ সকল লোকদের প্রতি, যাদের হাতে দুনিয়া অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দুনিয়ার আমানত বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে তা সোপর্দ করে দিয়ে নিজের বোঝা হালকা করে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কেউ যদি তোমার সাথে দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে তা' হলে তুমিও তার সাথে প্রতিযোগিতা কর। আর যদি দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামে তবে দুনিয়ার বোঝাটা তার গর্দানে তুলে দাও।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস! দুনিয়া এক গভীর সাগর, অসংখ্য মানুষ তাতে ডুবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, এ অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য তুমি তাক্‌ওয়ার নৌকা তৈরী কর, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান দ্বারা সেই নৌকা ভর্তি কর এবং সে নৌকার নোঙর হবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল। তবেই তুমি নাজাত পেতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তুমি নাজাত পেতে পারবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি যতই ভাবি, আমার ভাবনা কেবল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

'যমীনের উপরের বস্তুনিচয়কে আমি যমীনের জন্য 'সৌন্দর্য-শোভা' করেছি। এভাবে আমি মানুষদের পরীক্ষা করে দেখবো যে তাদের কারা কারা আমল ও জীবনকে সুন্দর করে। অনন্তর যমীনের উপরের সবকিছুকে অচিরেই আমি শূন্য ময়দানে পরিণত করবো।' (কাহ্‌ফ ঃ ৭, ৮)

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, আজ তুমি জগতের যে বস্তুর মালিক হচ্ছো, লক্ষ্য কর, তোমার পূর্বে অন্য কেউ এর মালিক ছিল, তোমার পরেও অন্য কেউ এর মালিক হবে। তোমার বলতে দুনিয়াতে শুধু রাতের এক বেলা খানা ও দিনের এক বেলা খানা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই, মাত্র এক গ্রাস খাবারের জন্য নিজেকে তুমি ধ্বংস করে ফেলো না। রোযাদারের খানা-পানির মত তুমি দুনিয়া ত্যাগের রোযা রাখ এবং আখেরাতে গিয়ে ইফতার করো। দুনিয়ার মূলধন হলো খাহেশাত, কামনা-বাসনা। এর লভ্যাংশ হলো জাহান্নাম।

জনৈক রাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যমানাকে আপনি কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, যমানা মানবদেহকে পুরানো করে দেয়, নতুন নতুন আশার জালে আবদ্ধ করে, মৃত্যুকে নিকটবর্তী করে ; কিন্তু মাকসূদকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রশ্ন করা হলো, তা' হলে যমানার লোকদের সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? তিনি বললেন, সাফল্য অর্জনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর ব্যর্থকামীরা কষ্টকর পরিশ্রমে লিপ্ত আছে। জনৈক বুযুর্গ এ কথাটাই বলেছেন এ ভাবে ঃ 'দুনিয়ার কিছু সুখ সুবিধার জন্য যাকে আজ তুমি পঞ্চমুখ দেখতে পাচ্ছ, অচিরেই দেখতে পাবে, সেই ব্যক্তিটাই দুনিয়াকে কিরূপ গাল-মন্দ করছে। দুনিয়া হাসিলে যে ব্যর্থ হয়েছে, সে শুধুই আক্ষেপ করতে থাকে। আর দুনিয়া যাকে ধরা দিয়েছে, অন্তহীন চিন্তা-ভাবনা তাকে গ্রাস করেছে।'

কোন জ্ঞানীজন বলেছেন, এক সময় দুনিয়া ছিল কিন্তু আমি ছিলাম না। আবার এক সময় দুনিয়াও যাবে, আমিও থাকবো না। তাই, দুনিয়াতে আমি মন লাগাবো না। কারণ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী, এর স্বচ্ছ বস্তুটাও ময়লাযুক্ত। দুনিয়াবাসীরা খোদ দুনিয়ার পক্ষ হতেই বহু আশংকাগ্রস্ত। হয়তঃ প্রাপ্ত নে'আমত হারানের কিংবা কোন অজানা বিপদে আক্রান্ত হবার কিংবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশংকা সর্বক্ষণ।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়ার একটা দোষ এই যে, সে কোন হকদারকেই তার আসল প্রাপ্য আদায় করে দেয় না। হয়ত প্রাপ্যের চাইতে কম দিবে অথবা ক্ষমতারও বেশী ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার তাবৎ ভোগ্য বস্তুনিচয় যেন

গযবগ্রস্ত। কারণ, তা কেবল অযোগ্যদেরই হস্তগত হয়। তোমরা কি বিষয়টা লক্ষ্য কর না?

সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে যে দুনিয়া হাসিলের চেষ্টা করে, যত পাবে ততই আরও দুনিয়া লাভের মোহগ্রস্ত হবে। অনুরূপ যে আখেরাতের মহব্বতে আখেরাত চায়, আখেরাতের পথে তার যতই অগ্রগতি সাধিত হবে ততই তার আগ্রহ ও চেষ্টার তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে। তাই, না এইটির কোন শেষ আছে, না সেইটির কোন শেষ আছে।

এক ব্যক্তি আবু হাযেম (রহঃ)–কে বলল, হুযূর! আমি তো দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত ; অথচ দুনিয়া আমার বাড়ী নয়। তিনি বললেন, 'দেখ, আল্লাহ্ পাক তোমাকে যা–কিছু দান করেছেন, তার হালালটুকুই তুমি গ্রহণ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তা' খরচ কর। তা' হলে দুনিয়ার মোহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' এভাবে জবাব দানের কারণ এই যে, এতটুকুর জন্যও যদি তাকে শাসাতেন তা' হলে তার উপর এতটা চাপ পড়তো যে, দুনিয়ার প্রতি চরম অতিষ্ঠতা পয়দা হয়ে দুনিয়া হতে বের হয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করতো।

ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, দুনিয়া শয়তানের দোকান। সে দোকান থেকে কিছু চুরি করো না। অন্যথা তার মালের সন্ধানে এসে তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়া যদি স্বর্ণেরও হতো যা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আখেরাত যদি মাটির ঢেলাও হতো যা চিরদিন থাকবে, তা'হলে ধ্বংসশীল স্বর্ণের পরিবর্তে চিরস্থায়ী মাটির ঢেলা গ্রহণই হতো আমার যথোচিত কর্তব্য। অথচ, আজ আমরা চিরস্থায়ী স্বর্ণের পরিবর্তে ধ্বংসশীল মাটির ঢেলাই তুলে নিচ্ছি। কি হবে আমাদের অবস্থা?

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক। কারণ, আমার কাছে এইমর্মে একটি রেওয়ায়াত পৌছেছে যে, কেউ যদি দুনিয়াকে বড় জানে, তা' হলে কাল কিয়ামতের মাঠে তাকে হাযির করা হবে এবং বলা হবে ঃ আল্লাহ্ যাকে ঘৃণা করতেন এই লোকটা তাকে বড় বলে জানতো।

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষই মেহমান, আর তার মালও ধারকৃত। মেহমানকে বিদায় হতে হবে। ধারকৃত মালও মালিকের হাতেই ফেরত যাবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُوْنَ اِلَّا وَدِيْعَةٌ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ

'মাল ও আত্মীয়–স্বজন সবই আমানত। আর আমানত অতি অবশ্যই ফেরত দিতে হয়।'

হযরত রাবে'আ (রহঃ) তাঁর কতিপয় শাগরেদকে দেখতে পেলেন, তারা দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন। তিনি বললেন, হে, তোমরা চুপ কর, দুনিয়ার আলোচনা বন্ধ কর। দুনিয়ার প্রতি কোন গুরুত্ববোধ যদি তোমাদের অন্তরে না থাকতো, তা' হলে দুনিয়া সম্পর্কে এত বেশী আলোচনাও করতে না। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা বেশী বেশী মুখে আসে।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ 'আমরা নিজেদের দ্বীনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তদ্দ্বারা দুনিয়ার দেহে তালি দিচ্ছি। এতে আমাদের দ্বীনও ধ্বংস হচ্ছে, তালিযুক্ত দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে। তাই, বড় ভাগ্যবান সেই বান্দা, যে তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় দুনিয়াকে কোরবান করেছে।'

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে ঃ 'আমি দেখেছি, দুনিয়া অন্বেষণকারী যত দীর্ঘজীবনই লাভ করুক এবং যত আরাম ও সুখের প্রাচুর্যই গড়ে তুলুক না কেন, তার অবস্থা ঠিক ঐ ব্যক্তিরই মত যে কোন মযবুত ইমারত নির্মাণ করেছে। যখনই সে তার প্রাসাদে আরোহণ করলো, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলো। আরও কেউ বলেছেন ঃ 'ধর, দুনিয়া যদি আপনাতেই তোমার কাছে ধরা দেয়, একদিন কি তা তোমাকে ছেড়ে যাবে না? ওরে, দুনিয়া হলো ছায়ার মত। কিছুক্ষণ তোমাকে ছায়াদান করে হঠাৎ ঘোষণা করবে যে, আমি চললাম।'

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আখেরাতের স্বার্থে তুমি দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও। তা' হলে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিতেই তুমি লাভবান হবে। কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাতকে বিক্রি করো না। তা'হলে দুনিয়া-আখেরাতে দু'টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে তিন ভাগ করেছেন, একভাগ মু'মিনের জন্য, একভাগ মুনাফিকের জন্য, একভাগ কাফেরের জন্য। তাই, মু'মিন নিজের সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত, মুনাফিক বিলাসের মোহগ্রস্ত, আর কাফেরগোষ্ঠী ভোগে মত্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া মুর্দা লাশ। তাই, যে দুনিয়ার কোন অংশ চায়, সে যেন নিজেকে কুকুরদের সমাজভুক্ত থাকার জন্য প্রস্তুত রাখে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'হে দুনিয়ার সাথে বিবাহের প্রস্তাবকারী! এ প্রস্তাব হতে ফিরে আসাতেই তোমার মঙ্গল। যাকে তুমি আপন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও, সে যে বড় গাদ্দার। বিবাহের অনতি পরেই তোমার জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসবে।'

হযরত আবু-দার্‌দা (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া যে আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট তার অন্যতম কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র যত না-ফরমানী এ দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ্‌র কাছে কিছু পেতে হলে দুনিয়াকে বর্জন করতেই হবে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ 'কোন বুদ্ধিমান যদি দুনিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে, তা'হলে স্পষ্টতঃই বুঝতে পারবে যে, দুনিয়া তার পক্ষে বন্ধুর লেবাসে শত্রু বৈ কিছু নয়।'

আরও বলা হয়েছে ঃ 'রাতের প্রথমাংশে সুখনিদ্রায় মগ্ন হে ব্যক্তি! বিপদ কখনও ভোররাতেও কিন্তু অবতীর্ণ হয়।' দিন-রাতের গমনাগমন ঐশ্বর্যশালী বহু জাতি-গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।' 'সময়ের পরিবর্তনধারা কত রাজা-বাদশাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা কখনও উন্নতি-অবনতির বড় হোতা, ভাঙ্গা-গড়ার অগ্রজ নেতা ছিল।' 'ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গনকারী হে মানুষ, যে দুনিয়ায় তুমি আজ সকালে কোথাও আছ তো সন্ধ্যাবেলা অন্য কোথাও।' 'কেন তুমি দুনিয়ার সাথে আলিঙ্গন করা বর্জন কর না। তবে তো তুমি জান্নাতুল-ফেরদাউসে আজনম কুমারী হূরদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার সৌভাগ্য লাভ করতে। 'তুমি যদি জান্নাতুল-খুল্‌দের

চির-অধিবাসী হবার আশা পোষণ কর তাহলে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হওয়া তোমার উচিত হবে না।'

হযরত আবূ-উমামা বাহেলী (রহঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন, ইবলীসের লশকরেরা তার নিকট আগমন করে আরজ করলো, হুযূর, একজন নবী এসেছেন, নতুন এক উম্মতের আবির্ভাব হয়েছে। ইবলীস বলল, তারা দুনিয়াকে মহব্বত করে? লশকরেরা বলল, জ্বী হাঁ। ইবলীস বলল, তারা যদি দুনিয়াকে মহব্বত করে তবে মূর্তি পূজা না করলেও আমার কোন পরোয়া নাই। আমি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তৎপরতা চালাবো ঃ না-হক মাল উপার্জন ও ভক্ষণ করা, না-হক পথে খরচ করা, হক ও ন্যায়সঙ্গত পথে খরচ না করা। এ তিনটি বিষয়ই সকল অপকর্মের উৎস।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযিঃ)-কে বলল, হে আমীরুল-মু'মিনীন! আমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, এমন ঘর সম্পর্কে আমি কি বলবো? যার সুস্থ ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যারা সেখানে নিশ্চিন্ত থাকে তাদের লজ্জিত হতে হয়, যারা অভাবগ্রস্ত থাকে তাদের পেরেশান হতে হয়, আর যারা ধনী ও স্বনির্ভর তারা বহু সমস্যায় জর্জরিত। দুনিয়ার হালালেরও হিসাব হবে, হারামের জন্য আযাব হবে, সন্দেহযুক্ত মালের জন্যও শাসানো হবে। আর একবার তাঁকে দুনিয়ার পরিচয় দিতে বলা হলে তিনি বললেন, সংক্ষেপে বলবো না বিস্তারিতভাবে? উত্তর এলো, সংক্ষেপেই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন, এর হালালেরও হিসাব হবে এবং হারামের জন্য আযাব হবে।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন, এই যাদুকারিণী দুনিয়া হতে সাবধান থাক, সে আলেমদের অন্তরেও তার যাদুর প্রভাব বিস্তার করে।

আবূ-সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, 'অন্তরে যদি আখেরাত থাকে তবে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে লড়তে আসে। আর অন্তরে যদি দুনিয়া থাকে তবে আখেরাত তার মোকাবেলায় আসে না। কারণ, 'আখেরাত' ভদ্র আর দুনিয়া হচ্ছে কমীন ও অভদ্র।' কি সাংঘাতিক কথা? ছাইয়ার ইবনুল-হাকাম (রহঃ) আরও সাফ করে বলেছেন ঃ দুনিয়া আখেরাত উভয়ই অন্তরমাঝে

একত্রিত হয়। অতঃপর একটি বিজয়ী হলে আর একটি তার অনুগত দাসে পরিণত হয়।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেছেন, 'তুমি যে পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তায় পড়বে, সেই পরিমাণ আখেরাতের চিন্তা তোমার দিল হতে বের হয়ে যাবে। আসলে এটি হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কথারই ভিন্ন অভিব্যক্তি। তিনি বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত হলো জোড়া-সতীন। যে পরিমাণ একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হবে, সেই পরিমাণ আর একজন থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন লোকদের দেখেছি যাদের চোখে এই দুনিয়া দু'পায়ে দলিত মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল। তারা চিন্তাও করতেন না যে, দুনিয়া নামক সূর্যটা উদয় হলো না অস্ত গেলো। এদিকে এলো না সেদিকে গেলো।

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে বললো, আল্লাহ্ পাক এক ব্যক্তিকে সম্পদশালী করেছেন। সে ঐ সম্পদ হতে দান-খয়রাত করে, আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়। এ অবস্থায় এ সম্পদ দিয়ে সুখের জীবন-যাপন কি তার জন্য উচিত হবে? তিনি বললেন, না। সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয় তবুও জীবন রক্ষার পরিমাণই সে খরচ করবে। বাকী সব তার 'অভাবের দিনের' কিয়ামতের জন্য জমা করবে।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে যদি অত্যন্ত সজ্জিত-সুশোভিত করেও আমার কাছে পেশ করা হয় এবং তা পুরাপুরি হালালও হয়, এমনকি আখেরাতে এর কোন হিসাবও না নেওয়া হয় তবুও আমি তাকে তদ্রূপ ঘৃণা করবো যেরূপ তোমরা কোন মুর্দা জানোয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘৃণায় নাক চেপে ধর এবং কাপড় বাঁচিয়ে দ্রুত সরে যাও।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) যখন শাম দেশে গমন করলেন, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্‌নুল জার্‌রাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে এগিয়ে নিতে এলেন। তিনি একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন যার লাগাম ছিল একটি রশি। অতঃপর তাঁদের মধ্যে সালাম-কালাম ও কুশল বিনিময় শেষে তিনি হযরত আবূ উবাইদার গৃহে তশরীফ নিলেন। ঘরের ভিতর একটি তলোয়ার, একখানা ঢাল ও একটি হাওদা ছাড়া আর কোন সামানই তিনি পেলেন না। বললেন, হে আবূ উবাইদাহ্! কিছু সামানও তো তৈরী করে নিতে

পারতে ; ভাল হতো না? আবু উবাইদাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, সেই নিদ্রালয় (কবর) পর্যন্ত এ' দিয়েই আমি পৌঁছতে পারবো।

হযরত সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, তোমার দেহের খোরাক দুনিয়া থেকে গ্রহণ কর, আর অন্তরের খোরাক আখেরাত হতে গ্রহণ কর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহ্র উপর আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহ্ব (রহঃ) বলেন, আমি কোন কিতাবে পড়েছি যে, দুনিয়া জ্ঞানীদের জন্য গণীমত, জাহেলদের জন্য গাফলতের সামান, দুনিয়া হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা দুনিয়াকে চিনতে পারে না। সেদিন বুঝবে এবং আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু তা আর হবে না।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! যেদিন তুমি দুনিয়াতে এসেছ সেদিন থেকেই দুনিয়াকে পিছনে ফেলতে শুরু করেছ এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। তাই, যে ঘরের দিকে তুমি অগ্রসর হচ্ছ সে ঘর তোমার নিকটবর্তী। আর দুনিয়ার ঘর সেই তুলনায় অবশ্যই দূরবর্তী। (কথাটা মনে রেখো, ধ্যানে রেখো)।

সাঈদ ইব্নে মাসউদ (রহঃ) বলেন, যখন দেখতে পাও যে, কোন বান্দার দুনিয়া বেড়ে যাচ্ছে ও আখেরাত কমে যাচ্ছে আর সে এতে সন্তুষ্ট—বুঝবে যে, সে ধোকায় পড়েছে, অজ্ঞাতসারে আপন চেহারাকেই সে খেলার বস্তু বানিয়েছে।

হযরত আমর ইবনুল-আছ্ (রাযিঃ) একবার মিম্বরে বসে বলেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসকে বর্জন করে চলেছেন সে জিনিসের প্রতি তোমাদের মত এত মদমত্ত হতে আর কাউকে দেখিনি। তাঁর উপর তিনটি দিনও কখনও এভাবে অতিবাহিত হয়নি যখন সুখের চাইতে কষ্টের মাত্রা বেশী ছিল না।

হযরত হাসান (রহঃ) একদা এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قف

'দুনিয়ার জিন্দেগী তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে।'

(লুকমান ঃ ৩৩ ঃ)

অতঃপর তিনি বললেন, যে-ব্যক্তি দুনিয়ার কথা বলে, তাকে বল যে, কে এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন? এবং কে সে সম্পর্কে অধিক জানেন? সাবধান, দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো না। দুনিয়ার ব্যস্ততার কোন সীমা নাই। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী ব্যস্ততার এক দরজা খুলবে, সে একটিই তাকে আরও দশটির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

মিসকীন ইব্‌নে আদম (রহঃ) বলেছেন, মানুষ এমন ঘর নিয়ে খুশী যার হালালেরও হিসাব দিতে হবে, হারামের জন্য আযাব ভুগতে হবে। হালালভাবে ব্যবহার করলে হিসাব, আর হারামভাবে ব্যবহার করলে আযাব। আদম সন্তান তার মালকে কম মনে করে, অথচ আমলকে কম বলে ভাবে না। তার দ্বীনের বিপর্যয় ঘটলে সে আনন্দ করে আর দুনিয়ার ক্ষতি হলে অস্থির হয়ে যায়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছেন ঃ 'সালামুন্ আলাইকা। যাদের মৃত্যুর ফয়সালা হয়েছে, মনে হয় আপনিই তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি এবং মনে হয় আপনি মরেও গেছেন।' জবাবে হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) লিখছেন ঃ 'সালামুন আলাইকা। মনে হয় দুনিয়াতে থেকেও আপনি দুনিয়াতে নাই। আপনি যেন সর্বদা আখেরাতেই বাস করছেন।'

ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে প্রবেশ করা (লিপ্ত হওয়া) সহজ, কিন্তু বের হওয়া কঠিন।

এক বুযুর্গ বলেন, সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য লাগে যে জাহান্নামকে জানে, বিশ্বাস করে, তারপরও কিভাবে হাসতে পারে? আশ্চর্য! যে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের হাজারো চড়াই-উৎরাই দেখতে পেয়েও দুনিয়াতে মন লাগাচ্ছে। আশ্চর্য! যে তকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিভাবে সে শান্ত ও স্তিমিত হয়ে যেতে পারে?

নাজ্‌রান নিবাসী দুই শ' বছর বয়সের এক ব্যক্তি হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট আগমন করলো। তিনি বললেন, দুনিয়াকে তুমি কেমন পেলে? সে বললো, কয়েক বছর দুঃখের, আর কয়েক বছর সুখের।

আজ সুখ তো কাল দুঃখ। এ রাতে সুখ তো সে রাতে শোক। একদিকে কোন সন্তান জন্ম হয়, আর একদিকে কারও মৃত্যু হয়। যদি সন্তান জন্ম না হতো তবে মানুষের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যেত। আর মৃত্যু যদি না হতো তবে পৃথিবী তার বাসীন্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যেত। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তোমার যা কিছু ইচ্ছা হয়, চাইতে পার। সে বললো, যে জীবন শেষ হয়ে গেল তা ফিরিয়ে দিবেন এবং মৃত্যু এলে তার প্রতিরোধ করবেন? তিনি বললেন, এর মালিক তো আমি নই। লোকটি বললো, তা'হলে আপনার কাছে আমার কোন দরকারও নাই।

দাঊদ ত্বাঈ (রহঃ) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আশা পুরা হয়েছে দেখে তুমি আনন্দে আত্মহারা, অথচ এ আশা পূরণের জন্য পুরা জিন্দেগী শেষ করেছ। আর আজ কাল ক'রে আমলের ক্ষেত্রে নিজেকে ফাঁকি দিয়েছ, মনে হয় যেন আমল করে তাতে তোমার না হয়ে বরং অন্য কারুর লাভ হতো।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার দরখাস্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দীর্ঘ হিসাব গ্রহণেরই আবেদন করে।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার যেকোন বস্তু তোমাকে আনন্দিত করে, আল্লাহ্ পাক সেই সাথে এমন কোন কিছু অবশ্যই যুক্ত রেখেছেন যা তোমাকে ব্যথিত করবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আদম সন্তানের যখন রূহ্ বের হয় তখন তার মনে তিনটি আক্ষেপ থাকে ঃ যা কিছু জমা করলাম, প্রাণভরে তা ভোগ করতে পারলাম না ; আমার যা আশা ছিল তা তো পূর্ণ হলো না ; আজ যে পথে যাত্রা করেছি সে পথের উপযুক্ত সম্বলও আমি যোগাড় করি নাই।

আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মোহজাল হতে একমাত্র সে ব্যক্তিই পরিত্রাণ পেতে পারে যার অন্তরে এমন দৌলত আছে যা তাকে আখেরাতের কাজে মশগুল রাখে।

মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা যেন দুনিয়াকে ভালবাসার সমঝোতা করে নিয়েছি। সেজন্যই আমরা একে অন্যকে সৎকাজের দিকে

ডাকি না, অন্যায় থেকে বারণ করি না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ কিন্তু আমাদের এভাবে ছেড়ে দিবেন না। হায়, নাজানি আল্লাহ্ আমাদের উপর কোন্ আযাব নাযিল করে বসেন!

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার সামান্য অংশও আখেরাতের বিপুল নে'আমত হতে বঞ্চিত করে দেয়।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, দুনিয়াকে তোমরা তুচ্ছ বিশ্বাসে তুচ্ছ করে রাখ। আল্লাহ্র শপথ, দুনিয়াকে যে তুচ্ছ জানে, দুনিয়া তার পক্ষেই অধিক মুবারক ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দার জন্য ভালোর ইচ্ছা করেন, খুশী মনে তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ দান করেন। অতঃপর বিরত থাকেন। যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন আবারও দান করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চোখে তুচ্ছ গণ্য হয়, আল্লাহ্ পাক তার হাতে দুনিয়ার বিপুল পরিমাণ ছেড়ে দেন।

মুহাম্মদ ইব্নে মুন্কাদির (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সারা বছর রোযা রাখে, সারা রাত্র বিনিদ্র ইবাদত করে, সমস্ত মাল সদ্কা করে দেয়, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে এবং সকল হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে ; কিন্তু কাল কিয়ামতে যদি তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, আল্লাহ্ পাক যে জিনিসকে তুচ্ছ জেনেছেন, এই ব্যক্তি তাকে বড় জেনেছে এবং আল্লাহ্র নজরে যা বড় ছিল, এই ব্যক্তির চোখে তা তুচ্ছ ছিল, তা' হলে তার কি অবস্থা হবে? আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দুনিয়াকে বড় মনে করে না? তদুপরি কত যে পাপেরও আসামী।

আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার কাজও কষ্টকর, আখেরাতের কাজও কষ্টকর। কিন্তু আখেরাতের কাজে তুমি কোন সহযোগী পাবে না। আর দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে হাত বাড়ালেই দেখতে পাবে কোন না কোন বদ্কার তোমার আগেই তাতে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াটা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত মোশকের মত ; যেদিন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সে চিৎকার করছে ঃ হে রব্ব্, হে মাবুদ, আপনি আমায় কেন ঘৃণা করেন? আর আল্লাহ্ পাক জবাবে বলেন ঃ হে নালায়েক, চুপ কর।

আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মহব্বত ও পাপের উৎসাহ যার অন্তরকে ঘিরে রেখেছে, ভালাই তার কাছে কিভাবে পৌঁছতে পারে?

ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার কোন সামান্য ব্যাপারেও যার অন্তরে ফূর্তি অনুভব হয় তার হিকমত ও জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তিকে দু' পায়ে দলিত করে, শয়তান তার ছায়া দেখলেও ভয় পায়। যার ইল্‌ম তার কু-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে সে-ই সত্যিকার বিজয়ী।'

বিশ্‌রে হাফী (রহঃ)-কে সংবাদ বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি বললেন, হাঁ, দুনিয়া জমা করে অবশেষে আখেরাতে পাড়ি দিতে হয়েছে। জীবনটাকে বরবাদ করেছে। কেউ বললো, হুযুর, সেতো বহু ইবাদত ও বহু নেক কাজ করতো। তিনি বললেন, একদিকে দুনিয়া জমা করা, আর একদিকে ইবাদত করা—এতে কি ফল হবে?

জনৈক বুযুর্গ বলেন, দুনিয়া আমাদের সম্মুখে নিজেই নিজেকে ঘৃণারূপে পেশ করে, তবু আমরা তার প্রেমে পড়ি। যদি প্রিয় ও সুন্দররূপে পেশ করতো তা' হলে আমাদের কি অবস্থা যে হতো!

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দুনিয়া কার জন্য? তিনি বললেন, তার জন্য যে তাকে বর্জন করে। প্রশ্ন করা হলো, আখেরাত কার জন্য? বললেন, যে আখেরাত তালাশ করে।

আরেক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়া বিরান ঘর। তদপেক্ষা অধিক বিরান ঐ ব্যক্তির দিল্ যে দুনিয়াকে আবাদ করে। আর আখেরাত আবাদ ও সুন্দর ঘর। তদপেক্ষা বেশী আবাদ ও সুন্দর ঐ ব্যক্তির দিল্ যে আখেরাত তালাশ করে।

জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ছিলেন সেই খোদা-প্রেমিকদের শ্রেণীভুক্ত যাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হয়ে কথা বলেন। তিনি তাঁর এক দ্বীনি ভাইকে উপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন, হে আমার ভাই! দুনিয়া পদস্খলনের স্থান, অপমানের জায়গা, এর সকল প্রাসাদ ও আবাদী একদিন ধ্বংস হবে, এর বাসিন্দারা একদিন কবরে যাবে, এখানকার যেকোন ঐক্যের ভাঙ্গন অনিবার্য, এর অর্থ-বিত্ত

সব হারিয়ে একদিন কাঙ্গাল হতেই হবে, এর পরিমাণ অধিক হওয়াতেই বিপদ ও অশান্তি, এখানে অভাব-অনটনের মধ্যেই রয়েছে শান্তি। অতএব, কালবিলম্ব না করে আল্লাহ্‌র দিকে ছুট, আল্লাহ্‌র দেওয়া হিস্যার উপর খুশী থাক। ক্ষণস্থায়ী ঠিকানার পেরেশানীতে পড়ে চিরস্থায়ী বাড়ীর কথা ভুলে যেও না। কারণ, এ জীবন একটা ছায়া যা কিছুক্ষণ পর বিলীন হবেই ; এ জীবন একটা দেওয়াল যা ভেঙ্গে পড়বেই। তাই, আমল বেশী কর, আশা কম কর।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে স্বপ্নের এক দিরহাম বেশী প্রিয়, না জাগ্রত অবস্থার এক দীনার? সে বললো, জাগ্রত অবস্থার এক দীনার। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, দুনিয়ার যে বস্তুকে ভালবাসছ, তা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ভালবাসছ। আর আখেরাতের যা-কিছু তুমি উপেক্ষা করছ তা যেন জাগ্রত অবস্থায় উপেক্ষা করছ।

ইসমাঈল বিন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আমাদের খোদা-প্রেমিক মনীষীগণ দুনিয়াকে 'শূকর' বলে আখ্যায়িত করে বলতেন, হে শূকর, আমাদের কাছ হতে দূরে সর। তারা যদি আরও কোন নিকৃষ্ট নাম পেতেন তবে সেই নামে তাকে অভিহিত করতেন।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রতি তোমরা এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, অবশেষে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের পূজা করবে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয আর-রাযী(রহঃ) বলেন, জ্ঞানী তিন প্রকার ঃ এক, যে দুনিয়াকে বর্জন করে দুনিয়া তাকে বর্জন করার আগে ; দুই, যে কবর তৈরী করে রাখে কবরে প্রবেশের আগে (অর্থাৎ যে নিজেকে মৃত মনে করে কবরবাসীর মত জীবন-যাপন করে।) এবং তিন, যে তার সৃষ্টিকর্তাকে খুশী করে দেয় তার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার আগে। তিনি আরও বলেন, দুনিয়া তার নিকৃষ্টতা ও অপকারিতার চরমে পৌঁছেছে। তাই, দুনিয়ার প্রতি কামনা-বাসনাও তোমাকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে গাফেল করে দিবে। আর দুনিয়াতে যদি লিপ্ত হয়ে পড়, বল—তখন কি ভয়াবহ অবস্থা হবে।

বকর বিন আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাহায্যে দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায়, সে যেন শুক্‌না খড়কুটা দ্বারা আগুন নিভাতে

চেষ্টা করছে।

হযরত বুন্দার (রহঃ) বলেন, দুনিয়াদারদেরকে যখন দুনিয়া ত্যাগের আলোচনা করতে দেখ, বুঝবে যে, ওরা শয়তানের বিদ্রূপাত্মক কাণ্ডে মেতেছে। তিনি বলেন, যে দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, দুনিয়ার লেলিহান শিখা তাকে পুড়ে শেষ করবে—অর্থাৎ লোভ-লালসা তাকে ধ্বংস করবে। এমনকি, সে ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। আর যে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হবে, আখেরাতের আগুন তাকে সেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সোনার মত করে দিবে যদ্দারা সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়। আর যে আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হবে, তাওহীদের আগুন তাকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিবে। ফলে, সে এমন হীরা-জওহারে পরিণত হবে যার দাম অসীম, কল্পনাতীত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া বলতে মাত্র ছয়টি বস্তু ঃ খাদ্য, পানীয়, পোশাক, সওয়ারী, বিবাহ ও সুগন্ধ। সর্বোত্তম খাদ্য মধু, অথচ সেই মধু হলো মাছির খোরাক এবং মাছির ঝুটা। সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু পানি। সেই পানিতে সৎ-অসৎ সকলের সমান অধিকার। সবচেয়ে উত্তম পোশাক রেশম। তা' হলো পোকাদের লালার তৈরী। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারী ঘোড়া। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ হত্যা করা হয়। বিবাহের প্রধান বিষয় স্ত্রী, প্রস্রাবের দরজার ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের ভাণ্ড লাভই যার সার কথা। মেয়েরা নিজেদের যত উৎকৃষ্টভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুক না কেন, তাদের থেকে নিকৃষ্ট বস্তুই হয় উদ্দেশ্য। আর সবচেয়ে উত্তম খোশবু মেশক। সেই মেশকের হাকীকত হচ্ছে রক্ত।

অধ্যায় ঃ ৩২
দুনিয়ার অপকারিতা
(পূর্ব প্রসঙ্গ)

এক বুযুর্গ বলেন, হে লোক সকল! ধীর চিত্তে আমল করতে থাক, আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, আশার জালে পড়ে এবং মৃত্যুকে ভুলে ধোকা খেওনা। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে শক্ত গাদ্দার, মস্তবড় ধোকাবাজ। সে নানা রঙে সেজে তোমাদের ধোকা দেয়, হাজারো আশা–লালসার দ্বারা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। তোমাদেরকে তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পরমা সুন্দরী দুল্হানের ন্যায় নিজেকে সাজিয়েছে। এমনি তার সাজা–কাজা যে, সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ, সকল হৃদয়ে তার মযবুত আসন, লক্ষ মন তার জান–কোরবান আশেক। হায়, দুনিয়া তার অসংখ্য প্রেমিককে কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে, কতনা আশাবাদীকে নিরাশ করেছে, কতনা ভক্ত বিশ্বাসীকে অপদস্থ করেছে। তাই বলি, হাকীকতের চোখ দিয়ে তাকে চিনতে চেষ্টা কর। দুনিয়া এমন ঘর যেখানে ঘটনাই বেশী। দুনিয়ার স্রষ্টাই তাকে খারাপ ও ক্ষতিকারক বলেছেন। এখানে এমন কোন নতুন নাই যা পুরানো হবে না, এমন কোন রাজত্ব নাই যা ধ্বংস হবে না, এমন কোন সম্মানিত নাই যে অপমানিত হয় না। এখানের যেকোন প্রাচুর্যই লয়প্রাপ্ত হবে, প্রিয়দের মৃত্যু হবে, মাল–দৌলত সবকিছু হারাতে হবে। ভায়েরা, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা গাফলত থেকে জেগে উঠ, সেই দিনের আগেই ঘুম ভাঙো যেদিন কেউ বলবে, অমুক অসুস্থ, অমুক জীবনের শেষ অবস্থায় পতিত, তখন কি আর কোন ওষুধ মিলবে? সত্যই কোন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যাবে? কি হবে হাজার ডাক্তার ডেকে—যখন সেই রোগ হতে সেরে উঠারই কোন পথ থাকবে না। হঠাৎ কেউ খবর দিবে, অমুক তার মালের শেষ হিসাব সেরেছে, এই ওছীয়ত করেছে। হঠাৎ শোনা যাবে, আহা, তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কত আপনজন পাশে বসে আছে, কিন্তু হায়, কথা বলার শক্তি নাই, কাউকেই আর চিনতে

পারছে না। (হে বন্ধু!) যখন তোমার এ অবস্থা আসবে, তোমার কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে, বুকের ভিতর হতে কোঁকানি ও গোঙানির শব্দ উঠতে থাকবে, মউত হাযির হবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে, জিহ্বা স্থিরতা হারাবে, ভাই-বেরাদররা কাঁদতে শুরু করবে। কেউ বলবে, এই দেখ, এ' হলো তোমার অমুক সন্তান, এ' হলো তোমার অমুক ভাই। কিন্তু, তোমার জিহ্বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি কথা বলতে পারছ না, তোমার জিহ্বার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই জিহ্বা কাজ করছে না। এখন বিলকুল মরণ-মুহূর্ত, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে রূহ্ বের করা হচ্ছে, রূহ্ বের করে তা আসমানের দিকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এখন তোমার আত্মীয়-স্বজনের ভিড় লেগে গেছে, কাফনের কাপড়ও এসে গেছে, তোমাকে গোসল দিচ্ছে, কাফন পরাচ্ছে, এখন আর কেউ তোমার পরিচর্যা করতে আসবে না, আর কেউ হিংসা বা শত্রুতা করবে না, ওরা আজ নিরস্ত্র হয়ে গেছে। তোমার পরিবারবর্গ ধন-সম্পদ বন্টন করে নিচ্ছে। এই কবর ঘরে এখন তুমিই আছ আর তোমার আমল।

এক বুযুর্গ জনৈক বাদশাহ্কে বলেছিলেন, যে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও আসবাবের বেশী অধিকারী, দুনিয়াকে অধিক ঘৃণা করা ও খারাপ মনে করা তার পক্ষে অধিক কর্তব্য। কারণ, তার সম্পদের উপর কোন বিপদ এসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের উপর কোন মুসীবত এসে তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারে, রাজত্বের উপর কোন বিপদ নেমে এসে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। অথবা তার দেহের উপর কোন বালা নাযিল হয়ে তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। অথবা যে বস্তুটি তার বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করতেও তার বেদনা বোধ হয় সেই বস্তুর ব্যাপারেও কোন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তাই দুনিয়া সাংঘাতিক ঘৃণার বস্তু। দুনিয়া কিছু দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়। সে কারো কাছে এসে তাকে উল্লসিত করে, আবার অন্যদেরকে তার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসায়। দুনিয়া কারো জন্য কাঁদে, আবার অন্যদেরকে তার জন্য কাঁদতে বাধ্য করে। আজ সে দানের হাত প্রসারিত করে, কাল সেই হাত বাড়িয়েই সব ছিনিয়ে নেয়। আজ যার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলো, কাল তাকেই মাটির তলে চাপা দেয়। তাই, দুনিয়ার আসা-যাওয়া, দান করা,

কেড়ে নেওয়া সব বরাবর, সবই ধ্বংসশীল। আজ যা এলো, কাল তা গেলো। আসা আর যাওয়া এবং দেওয়া আর কাড়ার পালা বরাবর চলতে থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)–কে পত্র লিখেছিলেন ঃ দুনিয়ার ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ ঘরে চিরদিন থাকা যাবে না। হযরত আদম (আঃ)–কে যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল তা শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। অতএব, হে আমীরুল–মুমিনীন! দুনিয়াকে ভয় করুন, দূরে থাকুন। যে দুনিয়াকে বর্জন করে, দুনিয়া তার জন্য কল্যাণকর তোশা। যে দুনিয়ার ধনী, সেই প্রকৃত অভাবী। দুনিয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে কত যে বনী আদম হত্যার শিকার হচ্ছে। যে দুনিয়াকে ইয্যত দিবে, দুনিয়া তাকে অপমান করবে। যে দুনিয়া জমা করবে, দুনিয়া তাকে অভাবে ফেলবে। দুনিয়া হচ্ছে সর্বনাশা বিষ, যারা তার পরিচয় জানে না তারাই তাকে ভক্ষণ করে তার হাতে অপমৃত্যু বরণ করে। অতএব, দুনিয়াতে এভাবে থাক যেভাবে কেউ তার জখমে ঔষধ ব্যবহার করে, আসন্ন দীর্ঘ বিপদের ভয়ে সাবধানে চলে এবং রোগ বেড়ে যাবার ভয়ে তিতা ঔষধও বাধ্য হয়ে সেবন করে। গাদ্দার, ধোকাবাজ এ দুনিয়া হতে দূরে থাক, সে ধোকা দিয়ে মানুষের জীবনের অকল্যাণ ডেকে আনার জন্যই নানা রঙে সাজে এবং শত রকম আশা দেয়। চাতুর্য্যের সাথে আজকে না হলে কালকের ওয়াদা করে। সে ঐ রূপসী দুল্হানের মত, যার রূপ ও অপরূপ সাজ সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, মনোলোভা সৌন্দর্যের দ্বারা পাগল করে তোলে। দুনিয়া নামের রূপসী তার সব স্বামীর সঙ্গেই শত্রুতার আবরণ করে, না দ্বিতীয় স্বামীকে সে অতীত স্বামীর মত সম্মান করে, না প্রথম স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, না কোন ওলী আল্লাহ্র উপদেশ গ্রহণ করে কেউ তার পাণি গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। কোন কোন প্রেমিক সেই রূপসীর স্বাদ আস্বাদন করে ধোকাগ্রস্ত হয়, তখন সীমালংঘন করতে থাকে এবং পরকাল ভুলে যায়। বিবেক–বুদ্ধিকে দুনিয়ার হাতে বন্ধক দিয়ে পরিণামে পদে পদে শুধুই আছাড় খেতে থাকে। ফলে, তাকে সাংঘাতিক ভাবে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়। তখন শুধু আক্ষেপ আর আক্ষেপ করা ব্যতীত কোনই উপায় থাকে না। হঠাৎ করে মৃত্যুর যন্ত্রণাপদ বিভীষিকা

তাকে গ্রাস করে ফেলে, আর জীবনের ব্যর্থতার শত আক্ষেপ তাকে দগ্ধীভূত করে। এই রূপসী নববধূর এমন প্রেমিকও আছে, যারা তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়েছে, তবু তাকে লাভ করার কষ্টকর চেষ্টা থেকে নিজেকে অবসর দেয়নি। ফলে, অপ্রস্তুত অবস্থায় খালি হাতে তাকে পরকালের পথে রওয়ানা হয়ে যেতে হয়। অতএব, হে আমীরুল-মুমিনীন, এ দুনিয়া থেকে দূরে থাকুন, যত বেশী সম্ভব গোপন ও সাবধান থাকুন। যখনই কেউ দুনিয়ার কিছু পেয়ে উৎফুল্ল হয়, আর একদিকে সে তাকে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এখানের ক্ষতিকারীরা ষড়যন্ত্রবাজ, হিতাকাংখীরাও গাদ্দার ও ক্ষতিসাধক। এখানের শান্তি ও প্রাচুর্য সমস্যা-জর্জরিত। এখানের সবকিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। এ জন্যই এর সুখও হাজার দুঃখ ভরা। যা গেল তা আর ফিরে আসে না। ভবিষ্যতে কি আসবে বা আসবে না তাও অজানা। তাই, ভবিষতের আশাও তোমার বৃথা। সকল আকাংখাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, সব আশাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখানের স্বচ্ছও ময়লাযুক্ত, আনন্দও বেদনাযুক্ত। জীবন সর্বদাই আশংকাপূর্ণ। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করলে সুখের উপকরণকেও বিপজ্জনক এবং বিপদকে আরও ভয়ানক দেখতে পাবে। আল্লাহ্ পাক যদি এতদসংক্রান্ত কোন খবরও না দিতেন এবং কোন দৃষ্টান্তও উপস্থাপন না করতেন তবুও দুনিয়ার স্বরূপ দেখেই ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গা উচিত ছিল, গাফেলের হুশ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যখন সতর্ককারী এবং উপদেশদাতা এসেছেন তারপরও ঘুমিয়ে থাকার কোনও অবকাশ আছে? আল্লাহ্‌র নিকট এ দুনিয়ার এতটুকু মূল্য নাই। যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে কখনও তার দিকে চোখ তুলে দেখেন নাই। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সমূহ ভাণ্ডার তার চাবিসহ আপনার নবীর সম্মুখে পেশ করেছিলেন, তা গ্রহণ করলে তাতে আল্লাহ্‌র অনন্ত ভাণ্ডারে মশার এক ডানা পরিমাণও কমতো না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভেবেছেন, দুনিয়াকে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ করা যাবে না, তাঁর স্রষ্টার নযরে যা ঘৃণ্য, তাকে ভালবাসা যাবে না, তাঁর মালিক যে বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন সে বস্তুকে তুলে নেওয়া উচিত হবে না। এ জন্যই তিনি পরীক্ষার মানসে সালেহীনকে (সৎকর্মশীলদেরকে) দুনিয়া দান করেন নাই, আর শত্রুদের জন্য তা ঢেলে দিয়েছেন, ওদের

ধোকাগ্রস্ত করার জন্য। তাই তো ঐ ধোকাগ্রস্তরা দুনিয়ার শক্তি ও প্রাচুর্যের ফলে নিজেদেরকে অন্যদের উপর মর্যাদাবান মনে করে। ওরা ভুলে যায় যে, সেরা মর্যাদাবান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি আচরণ করেছেন, যিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছিলেন।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'যদি ধন আসতে দেখ তা' হলে বুঝবে, এটা আমার কোন পাপের নগদ সাজা। আর যদি দারিদ্র্য আসতে দেখ, তা' হলে বলবে, মার্হাবা! এ-যে নেক্ মানবদের বৈশিষ্ট্য।'

যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে হযরত ঈসা কালিমাতুল্লাহ্র অনুসরণ করতে পার। তিনি বলতেন ঃ 'ক্ষুধা আমার তরকারী, খোদার ভয় আমার বৈশিষ্ট্য, পশম আমার পোশাক, চন্দ্র আমার প্রদীপ, পদযুগল আমার সওয়ারী আর যমীন যা কিছু খাদ্য ও ফল-মূল উৎপাদন করে তা-ই আমার খোরাক। আমি শূন্য হাতে রাত্রি যাপন করবো, নিঃস্ব অবস্থায় আমার সকাল হবে, অথচ, পৃথিবীর বুকে আমার চেয়ে ধনী আর কেউ নাই।'

ওয়াহ্ব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলাইহিমাস্সালাম)-কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন, ফেরআউনের জাগতিক প্রতাপ ও প্রভাব যেন তোমাদের ভীত না করে। ওর ভাগ্য তো আমার হাতে। সে আমার হুকুম ছাড়া কথাও বলতে পারে না, দেখতেও পায় না, শ্বাসও গ্রহণ করতে পারে না। তার ভোগ-বিলাসের উপকরণাদিও যেন তোমাদের বিস্মিত না করে। কারণ, তা' হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগীর সুখের সামান এবং তা অহংকারীদের সৌন্দর্যের উপকরণ। তোমরা যদি চাও তা' হলে আমি তোমাদেরকে এমনভাবে দুনিয়ার সুখ-সৌন্দর্যের সামানাদির অধিকারী করে যা দেখলে ফেরআউন তোমাদের শক্তির সামনে নিজেকেও শক্তিহীন মনে করবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এ থেকে ফিরে থাকতে বলি, দুনিয়াকে তোমাদের থেকে দূরে রাখতে চাই। আমি আমার ওলীদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করি। আমি তাদেরকে জাগতিক সুখের উপকরণাদি হতে দূরে সরিয়ে রাখি, যেভাবে কোন মেহেরবান রাখাল তার বক্রীপালকে বিপজ্জনক

চারণভূমিসমূহ থেকে সরিয়ে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়াতে কোন আশ্রয়স্থল বানাতে দিই না, যেভাবে কোন মমতাময় রাখাল তাদের মেষপালকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় নিতে দেয় না। আমার ওলীদেরকে যে এভাবে দুনিয়া হতে দুরে সরিয়ে রাখি তা এজন্য নয় যে, তারা আমার কাছে মর্যাদাহীন, বরং এজন্য যে, যাতে তারা তাদের জন্য রক্ষিত আমার নে'আমতসমূহের পরিপূর্ণ অধিকারী হতে পারে। আমার ওলীগণ আমার জন্য নিজেদেরকে মিস্কীনি, ভয়, বিনয় ও তাকওয়ার দ্বারা সজ্জিত করে। এসব গুণাবলী তাদের অন্তরে উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এ-ই তাদের পোশাক যা তারা পরিধান করে, এ-ই তাদের সৌন্দর্যের চাদর এবং নাজাত-সাফল্যের উছীলা। এ-ই তাদের আশা-ভরসা, এতেই তাদের মান-মর্যাদা এবং এই গুণাবলীর দ্বারাই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের সাথে দেখা হলে তাদের সম্মুখে আন্তরিকভাবে নত হয়ে যাও, আদব ও বিনয়ের সাথে কথা বল এবং তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আচার-আচরণেও শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস রাখ, যে আমার কোন ওলীকে ভয় প্রদর্শন করলো, বস্তুতঃ সে আমার সাথে যুদ্ধের জন্য মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্বাস কর, অবশ্যই তোমরা মরবে, মৃত্যুর পর আবার তোমাদের জীবিত করা হবে, তোমাদের আমলসমূহের হিসাব হবে এবং সে আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব, দুনিয়ার জীবন তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে। এই দুনিয়া সম্পূর্ণ বিপদঘেরা, ধ্বংসশীল বলে পরিচিত, গাদ্দার নামে অভিহিত। দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে কেবলই পালাবদল হতে থাকে, এখন কারো হাতে, তখন কারো হাতে। দুনিয়ার কোন অবস্থাই স্থায়ী থাকে না। দুনিয়াতে যারা অবতরণ করে তাদের কেউই তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় না। এখানে কোনকিছুর স্থিতি নাই, এই সুখ, এই মুসীবত। প্রাচুর্যও ক্ষণস্থায়ী। এখানের জীবনটাই কলুষতাপূর্ণ। দুনিয়াবাসীদের প্রত্যেকে আপন আপন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে, কেউ একদিকে, কেউ আর একদিকে। কিন্তু সকলের মৃত্যু নির্ধারিত। ভাগ্যও নির্ধারিত। হে আল্লাহ্র বান্দারা! যে দুনিয়ায় তোমরা বাস করছ, তোমাদের পূর্বে এখানে ঐ সকল

লোকেরা বাস করেছে যারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী বয়স পেয়েছিল, তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তারা দুনিয়াকে তোমাদের চাইতে বেশী আবাদ করেছে। কিন্তু তাদের আওয়াজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের প্রতাপ নিভে গেছে, মহাকালের গর্ভে তারা হারিয়ে গেছে। তাদের দেহসমূহ পচে গেছে, তাদের বাড়ীঘর, প্রাসাদমালা, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদের সকল কীর্তি ও নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সু-উচ্চ প্রাসাদমালা, খাট-পালঙ্ক ও দামী দামী শাল ও বিছানার বদলে পাথর আর মাটির পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। আজ তারা কবরদেশে বন্দী। তাদের আবাসস্থল দূরে নয়। কিন্তু তারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল জনপদে অপরিচিত হয়ে গেছে। মহল্লাবাসীরাও তাদের কোন খবর রাখে না। তারা চিন্তা করে না যে, এখানে আর একটা জনপদ আছে। ঘরবাড়ী নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তারা এদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার করে না। আর তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকবেই বা কিরূপে? কারণ, পাথর, মাটি আর কীটপাল যে তাদের খেয়ে শেষ করেছে। আনন্দময় জীবনের অবসানের পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের শোকাহত করে তারা মাটির নীচে গভীর নিদ্রামগ্ন। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। হায় আফসোস্! পবিত্র কুরআন এ' কথাই তো বলেছে ঃ 'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তারা বর্‌যখে পড়ে থাকবে।' মনে মনে ধ্যান কর যে, তোমরাও যেন তাদের মত বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, কবরের বিজন ঘরে পৌঁছেছ, সেই নিদ্রালয়ে শুয়ে আছ। হায়! তখন কি অবস্থা হবে, যখন তোমরা আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাবে, কবর হতে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, অন্তরের গোপন বিষয়াদিও প্রকাশ হয়ে যাবে, তোমার কর্মের রিপোর্টের জন্য প্রতাপশালী বাদশার সম্মুখে খাড়া করা হবে? যখন পাপাচারের ভয়ে কাঁপতে থাকবে, পর্দাসমূহ সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তামাম দোষ প্রকাশ হয়ে যাবে? যখন সবাইকে তার কর্মফল ভোগে বাধ্য করা হবে? যেমন খোদ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

'আল্লাহ্ পাক পাপীদেরকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন এবং নেক্কারদিগকে নেক্ কাজের প্রতিদান দিবেন।' (নাজ্ম ঃ ৩১)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

'এবং আমলনামা খুলে দেওয়া হবে। তুমি দেখবে, তখন পাপীরা সে আমলনামার অবস্থা দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।' (কাহ্ফ ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে তাঁর কিতাব মুতাবিক আমলের তৌফিক দিন, তাঁর ওলীদের অনুসরণের তওফীক দিন, যাতে তাঁর করুণায় আমরা বেহেশ্তবাসী হতে পারি। আল্লাহ্ বড়ই প্রশংসিত ও পরম সম্মানিত।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন ঃ দিনগুলো হচ্ছে তীর আর মানুষ হচ্ছে লক্ষ্য বস্তু। যমানা প্রতিদিন তোমাকে তীর মেরে চলেছে, দিন–রাতের পরিবর্তন দ্বারা তোমাকে ক্ষত–বিক্ষত করে পচিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তোমার সমস্ত শরীর চুরমার করে ফেলবে। তাই, দিন–রাতের আগমন–প্রত্যাগমন যখন অব্যাহত, তাহলে কি করে তুমি নিরাপদ থাকতে পার? এই দিন–রাত যে তোমার কি সর্বনাশ করেছে তা যদি তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে, এক–একটা দিন তোমার কাছে ভারী মনে হবে, এক–একটি মুহূর্তকে তুমি বোঝা বলে ভাববে। অবশ্য, আল্লাহ্ পাকের শক্তি সকল চেষ্টা–তদবীরের চেয়ে বড়। এজন্যই মানুষ দুনিয়ার সমূহ অনিষ্ট হতে নিরাপদ থেকে দুনিয়াকে ভোগ করতে পারছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে হাকীমের তিতা দাওয়া। দুনিয়ার সীমাহীন অপকারিতার বর্ণনা দেওয়ার মত ক্ষমতা কারো নাই। উপদেশদাতাগণ যতটুকু বলতে সক্ষম হন, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। হে আল্লাহ্। আমাদের সরল পথে চালাও।

এক বুযুর্গ দুনিয়ার জিন্দেগীর স্থায়ীত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, দুনিয়ার জিন্দেগী এর চেয়ে বেশী নয়। কারণ, জীবনের যে অংশ চলে গেছে, তা তুমি কিছুতেই আর ফিরে পাবে না। আর এই মুহূর্তের পরবর্তী মুহূর্ত সম্পর্কে তোমার কিছুই

জানা নাই যে, কি হবে। কালের প্রতিটি রাত মৃত্যুর সংবাদ দেয়, এক-একটি মুহূর্ত যমানাকে ধ্বংস করতে থাকে। যমানার তাণ্ডবলীলা মানুষের জীবনকে বরবাদ করতে থাকে। যমানা মানুষের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে, জনপদসমূহ ধ্বংস করে, রাজত্বের উত্থান-পতন ঘটায়। আশা তো অনেক বড়, কিন্তু জীবন যে খুবই ছোট। আর জীবনের সবকিছুই যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

একদা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন যে, হে লোক সকল, তোমরা এমন একটা কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছ যা স্বীকার করে নিলে তোমাদের আহমক বলা হবে, আর যদি তা অস্বীকার ও প্রত্যাখান কর, তবে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করবে। তোমাদের চিরদিন এখানে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এ জগত ছেড়ে তোমাদের আর এক জগতে যেতে হবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা এমন এক জগতে আছ, যেখানে কিছু খাওয়াও বিপদ, পান করলেও অপমান। এখানে এমন কোন ভোগ্য বস্তু নাই যা কষ্ট-তকলীফমুক্ত ও আনন্দদায়ক। সুখের কোন উপকরণ হাতে আসে, আর একদিকে অন্যটা হাতছাড়া হয়ে যায়। যদিও তা তোমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, কিন্তু, তোমাদের করারও কিছু নাই। তাই, যেখানে যেতে হবে, যেখানে চিরদিন থাকতে হবে, সেখানের জন্যে আমল কর, উপার্জন কর্। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

একবার হযরত আলী (রাযিঃ) খুৎবার ভিতর বলছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিই যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুনিয়াকে বর্জন কর, যে-দুনিয়া তোমাদেরকে বর্জন করবে ; যদিও তোমরা তাকে ছাড়তে চাও না। দুনিয়া তোমাদের দেহকে অকেজো ও পুরাতন করে দিচ্ছে, অথচ তোমরা কেবলই তাকে নতুন সাজে সাজাচ্ছো। তোমাদের অবস্থা সেই কাফেলার মত যারা সফরের উদ্দেশে কোন পথ বেয়ে চলছে, এখনও পথেই রয়ে গেছে। কিন্তু, তাদের ধারণা যে, তারা পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। অথচ, তাদের কেউ হয়ত গন্তব্যে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু কেউ কেউ এখনও পথেই রয়ে গেছে। অথচ, তার জীবনের আর একটিমাত্র দিন বাকী আছে। অসংখ্য মানুষ আছে যারা পাগলপারা হয়ে

দুনিয়াকে খুঁজতে খুঁজতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। অতএব, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের দরুন পেরেশান হয়ো না। দুনিয়ার ধন-সম্পদের জন্যও আনন্দিত হয়ো না। কারণ, দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দুনিয়াদারকে দেখে আমি বিস্মিত হই যে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মৃত্যু থেকে গাফেল হয়ে আছে কিন্তু, মৃত্যু তার থেকে মোটেও গাফেল নয়।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন (রহঃ) বলেন, উলামা, আওলিয়া ও আরেফগণ যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে ঘৃণা করেন এবং আপন ওলীদের জন্য তা পছন্দ করেন না, কারণ, তা ভীষণ অবজ্ঞার বস্তু— এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন, তাঁর সাহাবীগণকেও দুনিয়ার ফেতনা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁরা প্রয়োজন বশতঃ কিছু খেয়েছেন, আর আখেরাতের জন্য প্রচুর পরিমাণে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতটুকু না হলে চলে না, ততটুকু গ্রহণ করেছেন, আবার যতটুকু হলে তা খোদা থেকে গাফেল করে দিবে, তা বর্জন করেছেন। মোটামুটিভাবে শরম-সম্ভ্রম রক্ষা হয়—পোশাকের ব্যাপারে এতটুকুই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়—এতটুকুই ছিল তাঁদের খাদ্য। দুনিয়াকে তাঁরা এই দৃষ্টিতে দেখতেন যে, দুনিয়া অবশ্যই ধ্বংসশীল। আর আখেরাতকে দেখতেন এই নজরে যে, আখেরাতই চিরস্থায়ী! তাই, দুনিয়াতে মুসাফিরের মত কাটিয়েছেন আর আখেরাতের সম্বল জোগাড় করেছেন। তাঁরা দুনিয়াকে বরবাদ এবং আখেরাতকে আবাদ করেছেন। হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাঁরা আখেরাত অবলোকন করতেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল, খুব শীঘ্রই আখেরাতের পথে পাড়ি দিতে হবে এবং স্বচক্ষে তা দেখতে হবে, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হবে। অল্পদিনের কষ্টের বিনিময়ে তাঁরা অনন্তকালের সুখের সামান নিয়ে গেছেন। এবং তা ছিল তাঁদের মাওলা-প্রদত্ত তওফীকের ফসল। আল্লাহ্ যা পছন্দ করেছেন, তাঁরা তাই পছন্দ করেছেন। আর আল্লাহ্ যে জিনিসকে ঘৃণা করেছেন, তাঁরা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৩৩

ক্বানাআত বা 'অল্পে তুষ্টি'র কল্যাণ ও ফযীলত

মনে রেখো, আল্লাহ্ যাকে গরীব করেন তার উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা, অন্যের কাছ থেকে কোন আশা না করা, অন্যের ধন-সম্পদের দিকে নযর না করা এবং কোনক্রমেই মাল হাসিলের লালসায় না পড়া। এসব গুণের অধিকারী হওয়া তখনই সম্ভব হবে যদি খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-ঘরের ব্যাপারে প্রয়োজন পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং তাতেও নিম্ন শ্রেণীর, কম দামের, কম মানেরটা গ্রহণ করতে পারে। এবং শুধু একদিনের অথবা অতিরিক্ত এক মাসের যা প্রয়োজন, শুধু ততটুকুরই চিন্তা-ফিকির করবে ; এক মাসের বেশীর চিন্তা আদৌ করবে না। যদি সে প্রাচুর্য লাভের আগ্রহী হয় কিংবা লম্বা-লম্বা আশা পোষণ করে তাহলে ক্বানাআতের (অল্পে তুষ্ট থাকার) ইয্যত থেকে বঞ্চিত হবে এবং লোভ-লালসার কলংক তাকে অপদস্থ করবে। এবং এই লোভ-লালসার জঘন্য চরিত্র ও মানবতাবিরোধী জঘন্যতম কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিবে। তদুপরি, লোভ-লালসা ও অল্পে তুষ্টির অভাব তো মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবেই বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ ـ

'কোন মানুষ যদি দুই-দুইটা উপত্যকা বোঝাই স্বর্ণেরও মালিক হয়,

তবু সে আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা খুঁজে বেড়াবে। (কবরের) মাটি ব্যতীত আর কিছুতেই এ আদম জাতের পেট ভরবে না। বস্তুতঃ যে তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন।'

আবু ওয়াকেদ লাইছী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কোন ওহী নাযিল হতো, সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আমরা তার কাছে আসতাম, তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন। সেই সূত্রে একদিন আমি তাঁর কাছে আগমন করি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক বলছেন ঃ আমি মাল দিয়েছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত আদায় করার জন্য। আদম জাত যদি স্বর্ণের একটা উপত্যকার মালিক হয়ে যায় তবে আর একটা উপত্যকা কামনা করবে। দ্বিতীয়টাও যদি পেয়ে গেল তবে তৃতীয় আর একটা চাইবে। মাটি ব্যতীত আর কিছুই এ আদম জাতের পেট ভরাতে পারবে না। বস্তুতঃ যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে নযর করেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন যে, সূরায়ে তওবার মত একটি সূরা নাযিল হয়েছিল, পরে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ; তা থেকে শুধু এ অংশটুকু মনে আছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ الخ

আল্লাহ্ পাক এমন সব লোকদের দ্বারাও দ্বীন ইসলামের শক্তি যোগান যাদের ইসলামে কোন অংশ নাই। আদম সন্তান যদি দু'টি উপত্যকা পরিমাণ মালের অধিকারী হয় তাহলে সে তৃতীয় একটা উপত্যকার খোঁজে লেগে যাবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত আর কোন বস্তুই ভরতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে রোখ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই লোলুপের কোনদিন পেট ভরে না ঃ যে ইল্মের প্রতি লালায়িত এবং যে মালের প্রতি লালায়িত। তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مَعَهُ اثْنَتَانِ

اَلْحِرْصُ وَحُبُّ الْمَالِ (اوكما قال)

'মানুষ বুড়ো হয়, কিন্তু দু'টি বস্তু তার মধ্যে জোয়ান হতে থাকে : লোভ ও মালের মোহ।' যেহেতু এগুলো মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপথগামীকারক চরিত্র, এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্পে তুষ্ট থাকার প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

طُوبَى لِمَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ -

'ঐ সকল লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা ইসলামের হিদায়াতে ধন্য হয়েছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক-প্রাপ্ত হয়েছে ও তা নিয়ে খুশী রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন :

مَا مِنْ اَحَدٍ فَقِيرٍ وَلَا غَنِيٍّ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهُ اُوتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا -

'ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন আরজু প্রকাশ করবে, আহা, কত ভাল ছিল, যদি আমি দুনিয়াতে জীবন-ধারণ পরিমাণ রুযিই শুধু পেতাম।'

তিনি আরও বলেছেন :

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ -

'ধন বেশী হলে ধনী হয় না। বরং আত্মার ধনীই প্রকৃত ধনী।' তিনি অধিক লোভ-লালসা থেকে বারণ করেছেন। বলেছেন :

اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ اَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِّنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِيَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ -

'হে মানুষ, (মাল ইত্যাদি লাভের) চেষ্টাকে সংক্ষিপ্ত কর। কারণ, প্রতিটি বান্দা তা–ই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে। এবং কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাগে লিখিত দুনিয়াটুকু নাক মলতে মলতে তার কাছে এসে হাযির না হয়।'

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, (হে খোদা,) আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় ধনী? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ আমি যতটুকু দিয়েছি ততটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সর্বাধিক ইনসাফগার? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ যে নিজের (আত্মা ও জীবনের) প্রতি ইনসাফ করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, রূহুল–কুদ্‌স্ (জিব্‌রাঈল আঃ) ওহীযোগে আমার অন্তরে একথা ঢেলেছিলেন যে, কোন প্রাণীই তার জন্য বরাদ্দ রিযিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আগে মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুন্দর ও সীমিত পরিশ্রম কর।

হযরত আবূ হুরাইয়াহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْجُوْعُ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ وَعَلَى الدُّنْيَا الدَّمَارَ ـ

'হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমার যখন খুব বেশী ক্ষুধা লাগে তখন একটা রুটি আর এক পেয়ালা পানি খেয়ে নিও। আর দুনিয়ার উপর ঘৃণা বর্ষণ কর।' হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَكُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ

لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَنَهَى عَنِ الطَّمَعِ -

তুমি পরহেযগার (পাপাচার মুক্ত) হও, তাহলে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদত গুযার ; প্রাপ্ত হিস্সার উপর তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি হবে সর্বাধিক শোকর-গুযার, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করবে, তবেই তুমি হবে প্রকৃত মু'মিন। এবং তিনি লোভ-লালসা বর্জন করতে বলেছেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে আরজু করল ঃ আমাকে উপদেশ দিন এবং সংক্ষেপ করুন। হুযুর বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, চিরবিদায়গ্রহণকারীর মত নামায পড়বে। এমন কথা বলবে না যে জন্য আগামীকাল ওযর ও ত্রুটি স্বীকার করতে হবে। অন্যের সম্পদের আশা থেকে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবে।

আওফ ইব্নে মালেক আশজাঈ (রাযিঃ) বলেন, আমরা সাত-আট জন সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম। তিনি বলে উঠলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি ইতিপূর্বেই আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করি নাই? এতদসত্বেও তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? এতে আমরা বাইআতের উদ্দেশে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের একজন বললেন, আমরা তো আগেই বাইআত হয়েছিলাম, এখন এ বাইআত কিসের উপর? তিনি বললেন, এখন এ বাইআত গ্রহণ কর যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না ; পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে ; (দ্বীনি আমীরের কথা) শুনবে এবং মানবে। এরপর আস্তে করে একটা কথা বললেন যে, তোমরা লোকের কাছে কোন কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর ঐ বাইআতকারীদের কারো কারো এমন অবস্থাই হলো যে, (সওয়ারীর পিঠে আরোহণ অবস্থায়) হাতের লাঠিটা পড়ে গেলেও কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, লালসাই দারিদ্র্য এবং লালসামুক্ত থাকাই

প্রাচুর্য। যে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করবে না, সে তাদের মুখাপেক্ষী হবে না।

কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ধন বা প্রাচুর্যের অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন আশা কম করা এবং যতটুকু হলে তোমার চলে যায় ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা। এক বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ জীবন মানে কয়েকটি মুহূর্ত যা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর কতগুলো অবাঞ্চিত ঘটনার সমষ্টি যা বার বার হামলা করছে। তাই, জীবন-যাপনের উপকরণে অল্পে তুষ্টির নীতি গ্রহণ কর, তাহলে তুমি সুখে থাকবে। আর খায়েশ-খুশী বর্জন করে চল, তুমি স্বাধীন জীবন লাভ করবে। কারণ, সোনা-চান্দি, মুক্তা-মানিক বহু মানুষের ধ্বংস ও অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) শুক্‌না রুটি পানিতে ভিজিয়ে নিতেন আর বলতেন, এতটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট থাকবে, তাকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ততটুকু অংশ তোমাদের জন্য মঙ্গলকর যতটুকুতে তোমরা আক্রান্ত হও নাই। আর যদি তাতে লিপ্ত হয়ে গিয়ে থাক তাহলে তা থেকে যতটুকু তোমার হাতের বাইরে চলে গেল ততটুকুই তোমার কল্যাণের।

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশ্‌তা ডেকে বলে, হে আদম সন্তান, সেই 'অল্প' যা তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, ঐ 'বেশী থেকে উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য বানিয়ে দেয়।

সামীত ইব্‌নে আজলান (রহঃ) বলেন, হে ইব্‌নে আদম, তোমার পেট হলো বর্গ মাপের এক বিঘত, এ ক্ষুদ্র একটা পেট কিরূপে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে?

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনার কি কি সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ দেহ ও জীবনের সৌন্দর্য ও বিমলতা, অন্তরের সততা-সরলতা এবং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হতে, তবুও তা থেকে তোমার খোরাক পরিমাণই তোমার ভাগে জুটতো। তাই, আমি যখন তোমাকে খোরাক পরিমাণ দান

করলাম, আর বৃহদাংশের হিসাব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম, এতে তোমার প্রতি মস্তবড় অনুগ্রহই তো করলাম।

ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের কারো যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সহজভাবেই যেন তা অন্বেষণ করে। লোকের কাছে গিয়ে 'জনাব, জনাব, আপনি, আপনিই' করে করে নিজের হাড্ডি মাংস যেন পানি না করে দেয়। কারণ, তার কিসমতে বরাদ্দকৃত রিযিক তার কাছে পৌঁছবেই।

উমাইয়া বংশীয় জনৈক বাদশাহ হযরত আবূ হাযেম (রহঃ)-কে কসম দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন তাঁর যা যা প্রয়োজন তা অতি অবশ্যই বাদশাহকে অবহিত করেন। উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ আমার সকল প্রয়োজনের কথা আমি আমার মাওলার কাছে ব্যক্ত করেছি। সে-মতে, তিনি যা-কিছু আমাকে দান করেছেন, আমি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। আর যা যা দেননি, তাঁর না-দেওয়ার উপরই আমি খুশী রয়েছি।

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ জ্ঞানীর জন্য কোন বস্তুটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক? আর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কোন জিনিসটা সর্বাধিক সাহায্যকারী? তিনি বললেন, সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তু সেই নেক আমল যা সে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর দুশ্চিন্তা দূর করার সর্বাধিক সাহায্যকারী হলো, তকদীর বা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের প্রতি আন্তরিক সন্তুষ্টি।

আর একজন জ্ঞানী বলেছেন, আমি দেখেছি, সর্বাধিক চিন্তা-পেরেশানীগ্রস্ত থাকে হিংসুক ; সর্বাধিক সুখী জীবনের অধিকারী 'যা আছে তার উপর' তুষ্টপ্রাণ মানুষ, সর্বাধিক কষ্ট সহ্য করতে হয় লালসাপূর্ণ ব্যক্তিকে। আরও দেখেছি, যারা দুনিয়াকে বর্জন করে, তারা সহজ জীবন অর্জন করে, যে আলেম শরীয়তের সীমা লংঘন করে, তাকে সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হতে হয়। কোন বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেই যুবকের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যিনি রিযিক বন্টনকারী, তিনি তার হিস্‌সা তাকে অবশ্যই দিবেন। এ বিশ্বাসের ফলে তার ইয্‌যত নিরাপদ ও নির্দাগ থাকে, তার মুখখানাও তাজা ও অমলিন থাকে। যার জীবনের আঙ্গিনা 'অল্পে-তুষ্টির' গুণে অলংকৃত হয়, জীবনে কোনদিন তাকে হোঁচট খেতে বা পেরেশান হতে হয় না।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের বলবো যে, আল্লাহ্ পাকের মালের কতটুকু আমি হালাল মনে করি? তা হলো, আমার শীত ও গরমের দুই জোড়া কাপড় এবং যতটুকু আমার হজ্জ ও উমরাহ্ পালনকালে আমার কোমর সোজা রাখবে। এরপর, আমার খোরাক ঠিক ততটুকুই যা কুরাইশের একজন সাধারণ মানুষের খোরাক। আমি তাদের চাইতে উঁচু না এবং নীচুও না। আল্লাহ্র কসম, আমি বুঝতে পারি না যে, এইটুকুও আমার জন্য হালাল হবে কি-না? অর্থাৎ তিনি সংশয় বোধ করছিলেন যে, 'প্রয়োজন-পরিমাণ' বলতে যা বুঝায় এবং যতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব—উল্লেখিত পরিমাণটা তদপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো কিনা।

এক বেদুঈন তার ভাইকে লালসার প্রশ্নে ধমকাতে গিয়ে বলেছিল ঃ আমার ভাই, তুমি তো খোঁজা-খুঁজির মধ্যে ডুবে আছ, কিন্তু, তোমাকেও যে খোঁজা হচ্ছে? তোমাকে খুঁজছেন এমন একজন, যার নাগালের বাইরে যাবার কোন পথ তুমি পাবে না। আর তুমি খুঁজছ এমন এক জিনিস (রিযিক) যা তোমাকে 'প্রয়োজন-পরিমাণ' দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, সব গোপন তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে? তুমি যেন এখন আর আগের জায়গায় নাই? আমার ভাই, মনে হয়, কোন লোভতুরকে তুমি বঞ্চিত হতে এবং কোন দুনিয়াত্যাগী মুসলমানকে রিযিক পেতে দেখ নাই।

কোন বুযুর্গ এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তোমাকে দেখছি, যতই তোমার প্রাচুর্য বাড়ছে, ততই তোমার লালসাও বেড়ে চলেছে। তবে কি তোমার লালসার কোন শেষ প্রান্ত আছে(?) যেখানে পৌছলে তুমি বলবে, 'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট, এবার আমি সন্তুষ্ট।'

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, কথিত আছে যে, এক লোক একটা ময়না পাখী শিকার করেছিল। পাখীটি বললো, তুমি আমাকে দিয়ে কি করতে চাও? সে বললো, আমি তোমাকে জবেহ্ করে খাবো। পাখী বললো, আমাকে দিয়ে না তোমার গোশতের সখ মিটবে, না তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে। বরং আমি তোমাকে তিনটি কথা শিক্ষা দিবো, আমাকে ভক্ষণের চেয়ে যা তোমার জন্য অধিক উপকারী হবে। প্রথমটি বলবো তোমার হাতে থাকা অবস্থায়, দ্বিতীয়টি বলবো যখন আমি বৃক্ষের উপর থাকবো, আর তৃতীয়টি

বলবো পাহাড়ের উপর অবস্থানের পর। শিকারী বললো, আচ্ছা, তবে প্রথমটি বল। ময়না বললো, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেজন্য কখনো আফসোস করবে না। অতঃপর বৃক্ষের ডালে গিয়ে বসার পর বললো, এবার দ্বিতীয়টি শোনাও। পাখী বললো, যা হতে পারে না তা হতে পারবে বিশ্বাস করবে না। অতঃপর উড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর বসে বলতে লাগল, ওরে হতভাগ্য, যদি আমাকে যবেহ্ করতে তাহলে আমার পেটের ভিতর দু'টি মোতি পেয়ে যেতে, যার প্রতিটি মোতি কুড়ি মিছকাল ওজনের। শিকারী একথা শুনে ঠোঁট কামড়াতে ও আফসোস করতে লাগল। এবং বললো, আচ্ছা, তৃতীয় উপদেশটিও বলে ফেল। ময়না বললো, প্রথম দু'টি যখন ভুলে গিয়েছ, তবে তৃতীয়টি বলে আর কি ফায়দা। আমি কি বলিনি যে, যা হাতের বাইরে চলে গেছে তার জন্য আক্ষেপ করবে না। এবং যা হতে পারে না তা হওয়ার বিশ্বাস করবে না। আমার গোশত, রক্ত, পালক সব মিলিয়েও তো কুড়ি মিছকাল হবে না। তাহলে, আমার পেটে চল্লিশ মিছকাল ওজনের দুই-দুইটি মুক্তার কথা তুমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারলে? এই বলে ময়না উড়ে চলে গেল। এ হচ্ছে মানুষের সীমাহীন লালসার একটা উদাহরণ। লালসা মানুষকে অন্ধ-নির্বোধ করে দেয়, ফলে, সত্যকে বুঝার ক্ষমতা থাকে না। যদ্দরুন, অসম্ভবকেও সে সম্ভব বলে ধারণা করে।

হযরত ইব্‌নে ছিমাক (রহঃ) বলেন, আশা হচ্ছে তোমার অন্তরে (লক্ষ্য-বস্তুকে বেঁধে রাখার) একটা রশি এবং তোমার পায়ের বেড়ী। তাই আশাকে তোমার অন্তর হতে বের করে দাও, তাহলে তোমার পদযুগলও বেড়ীমুক্ত হয়ে যাবে। আবু মুহাম্মদ ইয়াযীদী (রহঃ) বলেন, একদা আমি বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের দরবারে প্রবেশ করে দেখি, তিনি চান্দির পাতায় সোনার অক্ষরের একটা লেখা পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল-মুমিনীন, আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন, এটি কি কোন কাজের জিনিস? তিনি বললেন, হাঁ, বনি-উমাইয়াদের এক রত্নাগার হতে দুই ছন্দবিশিষ্ট এ লেখাটি আমি সংগ্রহ করেছি। ছন্দ দু'টি আমার কাছে ভাল লেগেছে। এর শেষে তৃতীয় একটি ছন্দ আমি যোগ করেছি। অতঃপর তিনি তা পড়ে শোনালেন ঃ

এক, তোমার প্রয়োজনের সময় এক দরজা যদি বন্ধ দেখতে পাও,

তাহলে ঐ দরজা বাদ দিয়ে আর এক দরজা খোঁজ কর, সেই দরজা তুমি খোলা দেখতে পাবে।

দুই, কারণ, পেটের থলেটা কোন রকম ভরতে পারলেই তো হলো। অতটুকু তুমি পেয়ে যাবে। আর অবাঞ্ছিত পরিণাম হতে বাঁচার জন্য অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকাই তোমার রক্ষাকবচ।

তিন, তুমি নিজেই তোমার ইয্যত বরবাদ করো না। এবং গুনাহের পিঠে সওয়ার হয়ো না, তাহলে আযাবও তোমার পিঠে সওয়ার হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিঃ) হযরত কা'ব (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মেহনত করে ইল্ম অর্জন ও হৃদয়স্থ করার পর আলেমদের অন্তর হতে ইল্মকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, লোভ-লালসা এবং দুনিয়াবী স্বার্থ-সুবিধার পেছনে ছুটা। এক ব্যক্তি হযরত ফুযাইল (রাযিঃ)-কে বললেন, হযরত কা'ব (রাযিঃ)-র কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। এর অর্থ হলো, মানুষ তার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতটা ডুবে যায়, যদ্দরুন তার দ্বীনই বরবাদ হয়ে যায়। সে চায় যে, তার কোন চাওয়াই যেন না-পাওয়া না থাকে। তাই, তার এক-একটা উদ্দেশ্যের জন্য এক-এক পথ অবলম্বন করে, শতজনের কাছে ধন্না দেয়। যার দ্বারা উদ্দেশ্য পুরা হয়ে গেল সে তার নাকে রশি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে থাকে। তখন, এমনও যদি হয় যে, তোমার হাজতসমূহ তার কাছ থেকে আর পুরা হচ্ছে না, তবুও তোমাকে নতজানু হয়েই থাকতে হয়। যার সাথে তোমার দুনিয়ার কারণে ভালবাসা থাকবে, তাকে দেখলে সালাম করবে, সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যায় যাবে। কিন্তু, তোমার এ সালাম বা পরিচর্যা তুমি আল্লাহ্র জন্য করবে না। তাই, তার সাথে যদি জাগতিক স্বার্থের সম্পর্ক না পয়দা হতো, তবে তা-ই ছিল তোমার জন্য মঙ্গলকর।

অধ্যায় ঃ ৩৪

আল্লাহ্র দরবারে গরীবের মর্যাদা ও গরীবির ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا وَاسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا۔

'গরীবেরা হলো এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম মানুষ। এবং বেহেশ্তে প্রবেশে দুর্বলেরা হবে সবচেয়ে দ্রুতগামী।' তিনি আরও বলেন, আমার দু'টি পেশা আছে, যে তাকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে তাকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করলো। তা হলো ঃ দারিদ্র্য এবং জিহাদ।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট অবতরণ করে বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে, আপনি কি চান যে, এ পাহাড়সমূহকে আমি সোনা বানিয়ে দিই, আপনি যখন যেখানে যাবেন, এ পাহাড়সমূহও আপনার সাথে সাথে যাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। অতঃপর বললেন, 'হে জিব্রাঈল, দুনিয়া ঠিকানাহীনের ঠিকানা, সম্পদহীনের সম্পদ। বিবেকশূন্যরাই দুনিয়ার জন্য জমা করতে থাকে।' অতঃপর জিব্রাঈল বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আল্লাহ্ আপনাকে ঈমানের দৃঢ় কথার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।'

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) কোন এক সফরে পথের মধ্যে এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তিনি তাকে জাগালেন। বললেন যে, হে ঘুমন্ত, উঠ, আল্লাহ্র যিকির কর। সে বললো, এতে আপনার কি উদ্দেশ্য? আমি তো দুনিয়াকে বর্জন করে এসেছি।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, বন্ধু, তাহলে তুমি ঘুমাও।

হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, এক ব্যক্তি মাটির উপর ঘুমিয়ে আছে। তার বালিশ হলো একখানা কাঁচা ইট। চেহারা ও দাড়িতে মাটি লেগে আছে। পরনে আছে একখানা লুঙ্গি। হযরত মূসা (আঃ) বলে উঠলেন, হে খোদা, তোমার এ বান্দার জীবনটা বুঝি এভাবে বরবাদ হবে। আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মূসা, তুমি কি জাননা যে, আমি আমার যে বান্দার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই, সমগ্র দুনিয়াকে আমি তার থেকে আলাদা করে দিই।

হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট কয়েকজন মেহমান আগমন করেন। তাদের মেহমানদারী করার মত কোন কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খায়বরের এক ইয়াহুদীর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজবের চাঁদ উঠা পর্যন্তের জন্য কিছু আটা ধার কিংবা বিক্রি হিসাবে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনুরোধ করেছেন। হযরত আবূ রাফে' বলেন, আমি সে ইয়াহুদীর কাছে গেলাম। সে বললো, কিছু বন্ধক রাখ, নতুবা দেওয়া যাবে না। আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি আসমানবাসীদের নিকট আমাতদার এবং এ যমীনবাসীদের মধ্যেও আমানতদার। ধার কিংবা বিক্রি—যেভাবেই সে দিতো, অবশ্যই আমি তা পরিশোধ করে দিতাম। যাও, আমার এ বর্মটি নিয়ে যাও। অতঃপর আমি তা ঐ ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখি। —এই সাহাবী যখন সেখান থেকে বের হয়ে এলেন ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۵

'আমি যে ওদের অনেককে জাগতিক সুখের উপকরণাদি দিয়েছি, আপনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।' (আম্বিয়া ঃ ১৩১) এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য, দুনিয়া ত্যাগের প্রশ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান

করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের জন্য অশ্বের গালে চন্দ্রিম চিহ্ন অপেক্ষা অধিক শোভনীয়। তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِىْ جِسْمِهٖ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا

'তোমাদের মধ্যে যার এভাবে সকাল হলো যে, সেদিনের খোরাক তার মওজুদ, সমগ্র দুনিয়াই যেন তার কাছে জমা আছে।'

হযরত কা'বুল আহ্‌বার (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)–কে বলেছিলেন, হে মূসা, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে এগুতে দেখ তাহলে বলবে ঃ মার্‌হাবা, হে ছালেহীনের আচ্ছাদন।

হযরত আতা–খোরাসানী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী এক নবী (আঃ) নদীর উপকূল দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে মাছ শিকার করতে দেখলেন। সে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে জাল ফেললো, কিন্তু, আদৌ কোন মাছ তাতে উঠলো না। তারপর আর এক মাছ শিকারীকে দেখতে পেলেন, সে 'বিস্‌মিশ্ শাইত্বান' (শয়তানের নামে) বলে জাল ফেললো। এতে এত বেশী মাছ পড়লো যে, তাকে ঝুঁকে ঝুঁকে জাল টানতে হচ্ছিল। নবী (আঃ) বললেন, হে পরোয়ারদেগার, আমি বিশ্বাস করি যে, উভয় ঘটনার চাবিই তোমার হাতে। কিন্তু, এর রহস্য কি? তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাগণকে হুকুম করলেন ঃ আমার প্রিয় বান্দাকে উভয়ের স্থান দেখিয়ে দাও। অতঃপর নবী (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র দরবারে প্রথম জনের মর্যাদার আসন ও দ্বিতীয় জনের অপমানকর অবস্থান দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, হে মা'বুদ, আমি খুশী হয়ে গেলাম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের ভিতর দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব মানুষ। আর জাহান্নামের মাঝে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই ধনী লোক ও মেয়ে মানুষ। অন্য এক বর্ণনায় শুধু মেয়েদের কথা উল্লেখিত

হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম যে, এর কারণ কি? উত্তরে বলা হলো, দুই লাল জিনিস তাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে ঃ সোনা এবং যাফরান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের ইহকালীন তোহ্ফা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবীগণের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন সুলাইমান আলাইহিস্-সালাম। কারণ, তাঁর উপর রাজত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। আর আমার সাহাবীদের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন—আবদুর রহমান ইব্নে আওফ (রাযিঃ)। কারণ, তিনি মালদার ছিলেন। এক বর্ণনায় বলেছেন, আমি তাকে দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে বেহেশ্তে যাচ্ছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন। আহ্লে বাইত কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়াতে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। আর যখন অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন তখন তাকে খাসভাবে বাছাই করেন। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, খাসভাবে বাছাই করার কি অর্থ? তিনি বললেন, মানে, আল্লাহ্ পাক তার আওলাদ-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। আর এক বর্ণনায় আছে, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে অগ্রসরমান দেখ, তাহলে বল, মার্‌হাবা! এ-যে আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের ভূষণ ও বৈশিষ্ট্য? আর যদি প্রাচুর্য আসতে দেখ, তা'হলে বুঝবে, এ হচ্ছে আমার কোন পাপের নগদ সাজা।

হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, আপনার প্রিয় বান্দা কারা? আপনার জন্য তাদেরকে আমি ভালবাসবো। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ প্রতিটি গরীব বান্দা। হযরত ঈসা (আঃ) বলতেন, আমি মিস্কীনিকে ভালবাসি এবং জাগতিক সুখের প্রাচুর্যকে ঘৃণা করি। কেউ তাঁকে 'হে মিস্কীন' বলে সম্বোধন করলে তাতে যে-কোন সম্বোধন অপেক্ষা তিনি অধিক খুশী হতেন।

আরবের কাফের সর্দারগণ ও ধনিক শ্রেণী নবীয়ে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাবে রেখেছিল যে, আপনি একদিন আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন, সেদিন ওসব গরীবেরা আসবে না। আর এক দিন গরীবদের জন্য নির্ধারিত করুন, সেদিন আমরা আসবো না। এসব গরীব

বলতে তারা হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত সুহাইব, হযরত আবূ যর, হযরত খাব্বাব ইবনুল–আরত্, হযরত আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম ও আস্‌হাবে সুফ্‌ফার সহায়–সম্বলহীন সাহাবীদেরকে বুঝাচ্ছিল। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, তারা এ অভিযোগ তুলেছিল যে, এদের শরীর ও পোশাকের দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়। কারণ, তাঁরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও পশমের পোশাক পরিধান করতেন। যখন তাঁরা ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন তখন তাঁদের পোশাকাদি হতে একটা দুর্গন্ধ বের হতো যা ঐ ধনীদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। ঐ প্রস্তাবকারীদের মধ্যে ছিল ঃ আক্‌রা ইব্‌নে হাবেছ, উইয়াইনাহ্ বিন হিছ্‌ন্ ফাযারী, আব্বাস বিন মেরদাস সুলামী ও অন্যান্য। প্রিয়নবী (দ্বীনের স্বার্থে) তাদের প্রস্তাব মতে উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক মজলিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۔

'আপনি নিজেকে কঠোরভাবে তাদের সাহচর্যেই নিয়োজিত রাখুন যারা সকাল–সন্ধ্যা (সব সময়) তাদের পালনকর্তা মা'বুদের সন্তুষ্টির তালাশে তাঁর যিক্‌র ও ইবাদতে মশগুল থাকে। তাদের (অর্থাৎ এ সকল গরীবদের) থেকে আপনি দৃষ্টি ফিরাবেন না। আপনি কি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য চান? (নাকি আখেরাতের সৌন্দর্য চান?) (কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

'আপনি ওদের বলে দিন যে, ওদের রব্ব–এর পক্ষ হতে 'সত্যের' আগমন ঘটেছে। অতএব, যার ইচ্ছা, ঈমান গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা কুফরী

করবে।

অনুরূপ, কুরাইশের একজন অভিজাত কাফের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে-মাকতুম (রাযিঃ) তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰىٓ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝

'তাঁর (হুযুরের) নিকট দৃষ্টিশক্তিহীন বান্দার আগমনে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো এবং তিনি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলেন না। (হে রাসূল,) আপনি কি জানেন? হয়ত সে সংশোধিত হতো অথবা নসীহত গ্রহণ করতো। ফলে, নসীহত তার জন্য উপকারী হতো।'

(আবাসা ঃ ১–৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দরিদ্রদের সঙ্গে তোমরা অধিক পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে তোল তাদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের পথ করে নাও। কারণ, তারা এক বিশেষ দৌলতের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাদের দৌলত কি? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দেখ, কে তোমাদের এক টুকরা রুটি খেতে দিয়েছিল কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়েছিল অথবা একখানা বস্ত্র দিয়েছিল। তার হাত ধরে তাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করলাম। তখন আমার সম্মুখে কারো পদসঞ্চালনের আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, সে হচ্ছে বেলাল (রাযিঃ)। তারপর বেহেশ্তের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, সেখানে রয়েছে আমার উম্মতের দরিদ্র-গরীবেরা। আর সর্বনিম্ন স্তরে দেখলাম, ধনী ও নারীদেরকে। তাও অল্প সংখ্যক। আমি বললাম, হে মা'বুদ, একি? ওরা ওখানে কেন? আল্লাহ্

পাক বললেন, নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সোনা এবং রেশম। আর ধনী লোকেরা তো লম্বা হিসাবের মধ্যে ব্যস্ত ছিল। যাক, আমি আমার সাহাবীদিগকে খুঁজছিলাম। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফকে দেখলাম না। কিছুক্ষণ পর সে কাঁদতে কাঁদতে আগমন করলো। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে আসতে তোমার বিলম্বের কারণ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আপনার নিকট পৌঁছতে আমাকে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ভাবছিলাম যে, আপনাকে দেখার ভাগ্য বুঝি আমার হবে না। হুযূর বললেন, সে-কি ব্যাপার? কেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ, আমার কাছে আমার ধন-দৌলতের হিসাব নেওয়া হচ্ছিল। প্রিয় বন্ধু, চিন্তা কর, ইনি সেই আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ্ (রাযিঃ) যিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন মস্তবড় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। এবং তিনি 'আশারা-মুবাশ্‌শারা'র একজন, যাঁদেরকে বিশেষভাবে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি সেই ধনীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মাল মালদারের জন্য ক্ষতিকর ; কিন্তু যারা মালকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধনের দরুন এতটুকু হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গরীবের কাছে গমন করেন। দেখলেন যে, সম্পদ বলতে তার কিছুই নাই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ এই গরীবের নূর যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাদের বলবো যে, বেহেশ্‌তীদের বাদশাহ্ কারা হবে? সাহাবীগণ বললেন, জ্বী-হাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ ঐসব দুর্বল, ধুলি-মলিন, অগুছালো-কেশ, ফাটা-পুরানো কাপড় পরিধানকারী, যাদেরকে অন্যরা হেয়, দুর্বল, অধর্তব্য বলে গণ্য করে ; কিন্তু, আল্লাহ্র উপর জোর দাবী জানিয়ে কোন বিষয়ে কসম করে বসলে তিনি তাদের কসম পুরা করে দেন।

হযরত ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুবই মহব্বত ও ইয্‌যতের নযরে দেখতেন। একদা তিনি বললেন, ইমরান, আমার কাছে তুমি বিশেষ ইয্‌যত

ও মর্যাদার অধিকারী, (তুমি আমার খাস মানুষ)। তাই, অসুস্থ ফাতেমা বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্‌র পরিচর্যায় যেতে ইচ্ছা কর কি? আমি বললাম, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোন। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম। হযরত ফাতেমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি দরজা খটখটালেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে প্রশ্ন করলেন ঃ ভিতরে আসতে পারি? হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বললেন, জ্বী-হাঁ, আসুন। হুযুর বললেন, আমি এবং আমার সাথী উভয়েই? তিনি বললেন, আপনার সাথে কে? হুযূর বললেন ঃ ইমরান। হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার দেহে শুধু একখানা চাদরই আছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন যে, এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা বললেন, শরীরটা তো (কোন রকম) ঢেকে নিয়েছি, কিন্তু মাথা ঢাকবার তো কোন উপায় দেখছি না। এতদশ্রবণে হুযূর তাঁর সঙ্গের একখানা বস্ত্র ফাতেমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি মাথায় বেঁধে নাও। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার স্নেহের দুলারী, আজ সকালে কেমন থেকেছ? ফাতেমা বললেন, ওয়াল্লাহ্‌, সকালে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। সেইসাথে খাবারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুধার যন্ত্রণা ব্যথাকে যেন দ্বিগুণ করে তুলেছে। অনাহার আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে। ফাতেমার এ কথায় হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, দুলারী আমার, চিন্তা করো না, অস্থির হয়ো না। ওয়াল্লাহ্‌, আমিও আজ তিন দিন যাবত কিছুই মুখে দেই নাই। অথচ, অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে চাইতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে খাওয়াতেন। কিন্তু, আমি দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য দিয়েছি। অতঃপর তিনি ঈষৎ জোরে ফাতেমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, সুসংবাদ নাও, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি বেহেশ্‌তী বেগমদের সর্দার। হযরত ফাতেমা বললেন, তাহলে, ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান? হুযূর বললেন, আছিয়া হবেন তাঁর সময়কার বিশ্ব-নারীদের সর্দার এবং মরিয়মও হবেন

তাঁর সময়কার বিশ্ব-নারীদের সর্দার। আর তুমি হবে তোমার সময়কার সমগ্র নারীজগতের সর্দার। তোমরা এমন ঘরে বাস করবে যা হবে খোশবুদার ঘাসের, যেখানে থাকবে না কোন দুঃখ-কষ্ট ও কোনও শোরগোল। অতঃপর বললেন, ফাতেমা, চাচাতো ভাই আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। শোন, আমি তোমাকে এমন স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়েছি যিনি দুনিয়াতেও সর্দার, আখেরাতেও সর্দার।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ ফকীর-গরীবদিগকে ঘৃণা করবে, উচুঁ-উচুঁ ইমারত তৈরী করবে, টাকা-কড়ি উপার্জনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পথ অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে চারটি বিপদে নিক্ষেপ করবেন ঃ কালের দুর্ভিক্ষ, রাজার জুলুম, সরকারী কর্মচারীদের খিয়ানত, শত্রুদের দাপট।

হযরত আবূ দার্‌দা (রাযিঃ) বলেন, দুই টাকার মালিক—এক টাকার মালিক অপেক্ষা অধিক সংকট ও শক্ত হিসাবের সম্মুখীন হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) সাঈদ ইব্‌নে আমের (রাযিঃ)-র জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষন্ন হয়ে ঘরে ফিরলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? তিনি বললেন, বরং আরও মারাত্মক কিছু ঘটেছে। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, তোমার পুরাতন দোপাট্টাখানা দাও তো। তা নিয়ে তিনি খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন এবং তা দিয়ে থলে বানিয়ে ঐ দীনারগুলো বিলিয়ে দিলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাঁদতেছিলেন। সকাল পর্যন্তই এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। তারপর বলতে লাগলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ يَدْخُلُ فِىْ غِمَارِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهٖ فَيُسْتَخْرَجُ

‘আমার উম্মতের দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। এজন্য কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করবে, কিন্তু তার হাত ধরে তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।’

জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার একজন ফকীর হযরত সুফইয়ান সওরী (রহঃ)-র মজলিসে আগমন করেছিল। তিনি বললেন, তুমি সবার আগে এসে বস। ধনী হলে তোমাকে এত নিকটবর্তী করতাম না। তাঁর ধনী বন্ধু ও শাগরেদগণ আকাংখা করে বলতেন যে, হায়, আমরা যদি গরীব হতাম। এর, কারণ, হযরত সওরী (রহঃ) গরীবদেরকে অত্যধিক ভালবাসতেন, সম্মান করতেন, কাছে ডাকতেন। আর ধনীদের থেকে এড়িয়ে চলতেন। হযরত মুয়াম্মাল (রহঃ) বলেন, ধনীদেরকে হযরত সওরী (রহঃ)-এর মজলিসে যতটা ছোট ও নীচু থাকতে দেখেছি, এমনটা দ্বিতীয় কোথাও দেখি নাই। অনুরূপ, গরীবদেরকে তাঁর মজলিসে যে রকম মর্যাদা ও সম্মান পেতে দেখেছি, তেমনটি দ্বিতীয় কোথাও নযরে পড়েনি।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, মানুষ কত যে নির্বোধ! কারণ, সে দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, জাহান্নামকে যদি এতটুকুও ভয় করতো তাহলে, দারিদ্র্য ও জাহান্নাম উভয় থেকেই সে নাজাত পেয়ে যেত। তদ্রূপ, যতটা সে ধনী হওয়ার আকাংখা করে, বেহেশ্‌তের জন্য ততটুকুও যদি আকাংখা পোষণ করতো তাহলে উভয়টাই সে পেয়ে যেত। অনুরূপ, যতটা সে প্রকাশ্যে মাখ্‌লুককে ভয় করে, আল্লাহ্‌কে অপ্রকাশ্যে অতটুকু ভয়ও যদি করতো তাহলে সে ইহ-পরকালের তামাম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যেত।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন; যে ব্যক্তি কাউকে ধনের জন্য সম্মান এবং দারিদ্র্যের জন্য অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ খবরদার, কারো পরনে ছেঁড়া-পুরানা কাপড় দেখে তাকে ঘৃণা করবে না। কারণ, তোমার খোদা ও তার খোদা একই খোদা।

হযরত মু'আয ইব্‌নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, গরীবদেরকে মহব্বত করা নবী-রসূলগণের আখলাক, তাদের উঠা-বসার অগ্রাধিকার দান করা আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের বৈশিষ্ট্য, আর তাদের উঠা-বসা থেকে দূরে থাকা বা ঘৃণা করা মুনাফিকদের আলামত।

পূর্ববর্তী কোন আসমানী কিতাবের বরাতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক কোন এক নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন ঃ তুমি এই বিষয়ে ভয় কর যে, আমি যদি তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ হই এবং সেজন্য তুমি আমার

করুণার নজর থেকে বঞ্চিত হও, তাহলে দুনিয়াকে আমি তোমার জন্য বৃষ্টির মত ঢেলে দেব।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইব্‌নে আমের (রহঃ) প্রমুখ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-র জন্য যে হাদিয়া পাঠাতেন তিনি তা থেকে প্রত্যেক দিন এক হাজার দেরহাম বিলিয়ে দিতেন। অথচ, তাঁর দোপাট্টা তালিযুক্ত ছিল। একদা রোযাদার আয়েশা (রাযিঃ)-কে তাঁর বাঁদী বললেন, যদি একটিমাত্র দেরহামের গোশত খরিদ করতেন, তা দিয়ে ইফতার করতে পারতেন। তিনি বললেন, তুমি স্মরণ করিয়ে দিলেই তো পারতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওছীয়ত করে বলেছিলেন, তুমি যদি আমার সাথে মিলতে চাও তাহলে অবশ্যই গরীবের জীবন-যাপন করবে, ধনীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে এবং দোপাট্টায় তালি লাগানোর আগে তা খুলে রাখবে না।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদহাম (রহঃ)-এর জন্য দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পেশ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। লোকটি জোর অনুরোধ জানাতে থাকলে তিনি বললেন, তুমি কি চাও যে, দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে আমি গরীবদের রেজিষ্টার থেকে আমার নাম মুছে ফেলি? আমি কক্ষনো তা করব না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طُوبٰى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ بِهِ.

'বড়ই খোশ্-নসীব সেই ব্যক্তি যে ইসলামের হেদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং প্রয়োজন-পরিমাণ উপজীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলো।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে গরীবেরা, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তোমরা দারিদ্র্যের জন্য আল্লাহ্-প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করবে, অন্যথায় নয়।' এই হাদীসের দ্বারা সন্দেহ জাগতে পারে ধনের প্রতি লালায়িত গরীব দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু, ব্যাপকার্থবোধক হাদীসসমূহের প্রতি গভীরভাবে নজর করলে বুঝা যায় যে, এ ধরণের গরীবগণও দারিদ্র্যের জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে। পরে এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে। অতএব, উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহ্‌র

প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক যে তাকে সম্পদ দান করেন নাই, আল্লাহ্র এ ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু, এমনও বহু গরীব আছে যারা সম্পদের আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পদহীন করার দরুণ তাদের মনে কোন অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি নাই। (ফলে, তাদের সওয়াবও বাতিল হবে না।)

হযরত উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِيْنِ وَالْفُقَرَاءِ لِصَبْرِهِمْ هُمْ جُلَسَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'প্রত্যেক বস্তুর একটা চাবি থাকে। বেহেশ্তের চাবি হলো গরীব-মিসকীনদের মহব্বত করা, এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র জন্য ছবর অবলম্বন করছে। ক্বিয়ামতের দিন গরীব-মিসকীনরা হবে আল্লাহ্ পাকের অধিকতর নিকটবর্তী।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ঐ গরীব যে আল্লাহ্র দেওয়া রিযিকে তুষ্ট এবং আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا۔

'আয় আল্লাহ্, মুহাম্মদের পরিবারবর্গকে জীবনধারণ পরিমাণ রিযিক দান কর।'

তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِيٍّ وَّلَا فَقِيْرٍ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ كَانَ اُوْتِيَ قُوْتًا فِي الدُّنْيَا

'ক্বিয়ামতের দিন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই আক্ষেপ করবে যে, দুনিয়াতে

যদি তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিকই দেওয়া হতো।'

আল্লাহ্ পাক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, আমাকে তালাশ কর ভাঙ্গা-হৃদয় লোকদের কাছে। তিনি বললেন, ভাঙ্গা-হৃদয় কারা? আল্লাহ্ পাক বললেন, সত্যপন্থী গরীবেরা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্রের চাইতে উত্তম কেউ নাই যদি সে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তিনি আরও বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বাছাইকৃত-মনোনীত বান্দাগণ কোথায়? ফেরেশ্তাগণ বলবেন, হে খোদা, তারা কারা? আল্লাহ্ পাক বলবেন যে, এরা ঐ সকল দরিদ্র মুসলমান, যারা আমার দেওয়া হিস্সার উপর তুষ্ট ছিল, আমার নির্ধারিত তকদীরের উপর খুশী ছিল। তাদেরকে বেহেশ্তে দাখিল করে দাও। অতঃপর তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করে খেতে থাকবে এবং পান করতে থাকবে, অথচ তখনও লোকেরা হিসাবে ব্যস্ত থাকবে।

অল্পে তুষ্টি বা আল্লাহ্র হিস্সার উপর খুশী থাকা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। অল্পে-তুষ্টির বিপরীতে রয়েছে লোভ-লালসা। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ লালসাই দারিদ্র্য, আর লালসামুক্ত থাকাতেই প্রাচুর্য। কারণ, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ না করে বরং নিজের যা আছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে, কোন মানুষের কাছে তাকে তোয়ায-নোয়ায করতে বা ধন্না দিতে হবে না।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যহ আরশের নীচ থেকে একজন ফেরেশ্তা আওয়ায দিয়ে বলে, হে আদম সন্তান, যে 'অল্প' তোমার প্রয়োজন মিটাতে যথেষ্ট তা ঐ 'বেশী' অপেক্ষা উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী করে দেয়।

হযরত আবু দার্দা (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিই ক্রটিপূর্ণ। কারণ, সে দুনিয়ার প্রাচুর্য দেখলে ফূর্তিতে নেচে উঠে। অথচ, দিবা-রাতের অশ্রান্ত চাকা যে তার মূল্যবান জীবনকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেজন্য তার কোন ভাবনা নাই, বেদনা নাই। হায় মানুষ, কি সর্বনাশ করছ! সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে ব্যস্ত থাকছ অথচ, জীবন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ধন বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন,

আশা কম করা এবং প্রয়োজন–পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

কথিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদ্‌হাম (রহঃ) খোরাসানের স্বচ্ছন্দ ও আয়েশী জীবন–যাপনকারী এক বাদশাহ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর বালাখানার উপর থেকে লক্ষ্য করে দেখেন, একটি লোক তাঁর মহলের একপ্রান্তে তার হাতের একটি রুটি খাচ্ছে, খাওয়ার পর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি তাঁর কোন গোলামকে বললেন, লোকটি জেগে উঠলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙলে গোলাম তাকে ইব্‌রাহীমের কাছে নিয়ে গেলো। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে রুটি খাচ্ছিলে, তা কি ক্ষুধার্ত অবস্থায়? সে বললো, জ্বী–হাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন, তবে কি তুমি ঐ একটি রুটিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলে? সে বললো, জ্বী–হাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে ঘুমালে, আরামেই ঘুমালে? সে বললো, জ্বী–হাঁ। ইব্‌রাহীম তখন আপন মনে ভাবতে লাগলেন, কি হবে আমার এই দুনিয়া, এই ঐশ্বর্যভাণ্ডার দিয়ে? কারণ, জীবন ধারণের জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট দেখছি।

হযরত আমর ইব্‌নে আবদুল কায়স (রহঃ) লবন দিয়ে তরকারী খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, আল্লাহ্‌র বান্দা, দুনিয়ার জীবনে এ কিঞ্চিতের উপরই আপনি সন্তুষ্ট? তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো যে নিকৃষ্ট বস্তুর উপর সন্তুষ্টচিত্ত? সে বললো, জ্বী, বলুন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলে 'দুনিয়া' নিয়ে সন্তুষ্ট।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থলে থেকে একখানা শুকনা রুটি বের করে পানিতে ভিজিয়ে লবন দিয়ে খেয়ে নিতেন। আর বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাকে কারুরই মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ পাক যাদের কসম খেয়ে বলার পরও তারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে নাই, তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। অতঃপর তিনি এই আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٥ فَوَرَبِّ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

'আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু। আসমান ও যমীনের রব্ব্-এর কসম, এটি ধ্রুব সত্য।'

(যারিয়াত ঃ ২২, ২৩)

একদা হযরত আবূ যর (রাযিঃ) লোকদের নিয়ে মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁর বিবি এসে বলতে লাগলেন, আপনি এখানে মজলিস করছেন? অথচ, আপনার ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই নাই। তিনি বললেন, হে বিবি! আমাদের সম্মুখে এক দুর্গম ঘাঁটি বিদ্যমান। সেই ঘাঁটি হতে তারাই নাজাত পাবে যারা হাল্‌কা সহজ জীবন-যাপন করে। এতদশ্রবণে তাঁর বিবি সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে যান।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যে ক্ষুধা-পীড়িত ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ে, সে কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

জনৈক বুযুর্গ জিজ্ঞাসিত হলেন ঃ আপনার কি কি ধন-সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ কর্মজীবনের স্বচ্ছ ও সৎ কর্মশীলতা, হৃদয়ের ঈমানসিক্ত সরলতা এবং পরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাবতীর্ণ কোন কিতাবে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান, সমগ্র পৃথিবীও যদি তোমার হয় তবে তোমার ভাগ্যে জুটবে শুধু তোমার নির্ধারিত খোরাকটুকু। অতএব, আমি যখন তোমাকে শুধু তোমার ভোগ্য খোরাকটুকু দান করি, আর বাকীটুকুর হিসাব অন্যদের গর্দানে চাপিয়ে দিই, বস্তুতঃ এতে আমি তোমার বৃহত্তম উপকারই করি।'

কোন বুযুর্গ কানাআত বা 'অল্পে-তুষ্টি' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কাঁদতে হয় আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদ, আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি কর, মানুষের কাছে মিনতি করা বৃথা। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাক, মানুষের থেকে কিছুর আশা করো না। বিশ্বাস কর, নির্লোভ থাকাতেই তোমার ইয্যত। ঘনিষ্ঠ অ-ঘনিষ্ঠ কারুরই মুখাপেক্ষী হয়ো না। কারণ, পরের ধনে যে লোভ করে না সে-ই প্রকৃত ধনী।

আর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'এ সম্পদের স্তূপে তো ওয়ারিশদের জন্যই

স্তূপীকৃত। তোমার সম্পদ তো তা-ই যা তুমি আল্লাহ্র জন্য খরচ করেছ। আসলে, সেই হৃদয় বড়ই শান্তিপূর্ণ যার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, সকলের রিযিক বন্টনকারী আমাকেও অবশ্যই রিযিক দিবেন। এ বিশ্বাস তার ইয্যতকেও নির্দাগ-নিরাপদ রাখে, তার চেহারাকেও সজীব ও অমলিন রাখে। বস্তুতঃ 'ক্বানাআত' (খোদা-প্রদত্ত হিস্সাতে সন্তুষ্টি) যদি কারো জীবনের আঙিনায় অবতরণ করে, ক্বানাআতের শীতল ছায়া তাকে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয়।

অধ্যায় ঃ ৩৫

গায়রুল্লাহ্‌কে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ،

'তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকো না ; অন্যথায়, জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।' (হূদ ঃ ১১৩)

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, ركون বলতে কোন বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়া ও আকৃষ্ট হওয়াকে বুঝায়, চাই তা কম মাত্রায় হোক কিংবা অধিক মাত্রায় হোক। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো ঃ 'তোমরা যালিমদিগকে আপন বলে গ্রহণ করো না।' বস্তুতঃ উক্ত আয়াতের যাহেরী অর্থ হয় ঃ তোমরা কাফের মুশরেক ও ফাসেক মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো না। আল্লামা নিশাপুরী (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এর অর্থ, যুলুমবাজদের যুলুম-অত্যাচার ও তাদের নির্যাতনমূলক রীতি-নীতির সমর্থন, গুণ-কীর্তন বা প্রশংসা করা এবং তাদের যে কোন অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বা অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তাদের যুলুম ও অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উদ্দেশে কখনও কখনও তাদের কাছে যাতায়াত করা উক্ত আয়াতের নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে না। (ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) বলেন,) আমার ধারণায় এ যাতায়াতের বৈধতা কেবলমাত্র সামাজিক জীবনের নীতি-আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং রুখসত্ বা 'অবকাশ'-এর পর্যায়ভুক্ত। অন্যথায়, যালিমদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই হচ্ছে তাকওয়ার দাবী। কারণ, আল্লাহ্‌ই তার বান্দার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ٥

'আল্লাহ্ই কি যথেষ্ট নন তার বান্দার জন্য?' (যুমার ঃ ৩৬)

তাই, তাদের প্রতি আকৃষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ার মূল গোড়াই উৎপাটন করে ফেলা দরকার, বিশেষ করে আশংকা-সংকুল বর্তমান যমানায়। কারণ, আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সত্য-ন্যায়ের প্রতি আহ্বানই যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, তাদের কাছে যাতায়াত ধোকা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আয়াতের বক্তব্য অনুসারে যেকোন যুলুমে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে সামান্য সম্পর্ক বা যাতায়াতই যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার কারণ, তাহলে, চরম ধরণের যালিম, নিপীড়ক ও সীমালংঘনকারীদের সাথে যারা গভীর সম্পর্ক রাখে, অহরহ যাতায়াত করে, তাদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য জান কুরবান করে দেয়, এমনকি তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন-যাপন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা করে এবং তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক অনুসরণ করে তৃপ্তি অনুভব করে, তাদের উন্নত ও আকর্ষণীয় আহার-বিহার ও উপকরণাদি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়—তাদের পরিণতি কত বেশী লাঞ্ছনাকর ও ভয়াবহ হতে পারে? আসলে হাকীকতের দৃষ্টিতে তাকালে দেখবে, তাদের বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্র নিকট তা একটিমাত্র দানা বা মশার ক্ষুদ্র পালক বরাবরও নয়। বন্ধুগণ, তাহলে এও কি কোন কামনার যোগ্য বস্তু? ধিক্ এমন কামনাকারীর প্রতি, ধিক্ সেই কাম্য বস্তুর প্রতি। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ

'মানুষ তার অন্তরঙ্গ-বন্ধুর রীতি-আদর্শের অনুসারী, সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে। অতএব, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা দরকার যে, কাকে, কেমন মানুষকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।'

বর্ণিত আছে যে, সৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বহনকারীর মত। মেশক তোমাকে নাইবা দিল কিন্তু, তার সুঘ্রাণ তুমি অবশ্যই আঘ্রাণ করবে। আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ কর্মকারের জাঁতার মত ; তোমাকে না পোড়ালেও

তার ধোঁয়া অবশ্যই পৌঁছবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط

'যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা ঠিক মাকড়সার বুনা জালের মত।' (আন্কাবূত ঃ ৪১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ عَظَّمَ غَنِيًّا لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ.

'যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তার ধনের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, তার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।' তিনি আরও বলেন ঃ

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذٰلِكَ الْعَرْشُ

'কোন ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ পাক গোস্বান্বিত হন এবং এতে তার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে।'

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج

'(সেই দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রতিটি মানুষকে তার ইমাম সহকারে তলব করবো।' (ইসরা ঃ ৭১) অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে।

এখানে তফসীরকারগণ 'ইমাম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে ইমাম বলতে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেককে তার আমলনামা সহ ডাকবো। নিম্নবর্ণিত আয়াতটি এ অর্থকেই সমর্থন করে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ

'যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে........।'

(আল-হাক্কাহ ঃ ১৯)

ইব্‌নে যায়দ (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে ইমাম মানে, নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। অর্থাৎ লোকদিগকে 'হে তাওরাতওয়ালা, হে ইন্‌জীলওয়ালা, হে কুরআনওয়ালা ইত্যাদি বলে ডাকা হবে। হযরত মুজাহিদ ও হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 'প্রত্যেকের ইমাম' মানে তার নবী। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করবেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)–এর অনুসারীদের হাযির কর, মূসা (আঃ)–এর অনুসারীদের হাযির কর, ঈসা (আঃ)–এর অনুসারীদেরকে হাযির কর, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর অনুগামীদের হাযির কর ইত্যাদি। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন যে, ইমাম মানে নেতা বা অনুসৃত ব্যক্তি। অর্থাৎ যে–সময় লোকেরা যার আদেশ–নিষেধ মেনে চলতো তাদেরকে সেই নেতা সহকারে তলব করা হবে। সহীহ্ হাদীসে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)–এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন তখন প্রত্যেক গাদ্দারের (অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর) জন্য এক–একটি (অপমানকর) ঝাণ্ডা বুলন্দ করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের গাদ্দারীর নিশান।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ্(রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নেক বান্দাদের এক–একজনকে ডাকা হবে এবং ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। এবং তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে, চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে, মাথায় ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ মুক্তা নির্মিত মুকুট পরানো হবে। অতঃপর তার সাথীদের দিকে যেতে শুরু করবে। সাথীরা তাকে দূর হতে দেখেই বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহ্, তাকে আমাদের কাছে পৌছিয়ে দাও এবং তার উছীলায় আমাদেরকেও বরকতস্নাত কর। এতক্ষণে সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে এবং বলবে ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই অনুরূপ নে'আমত ও মর্যাদা।

আর কাফেরের চেহারাকে কালো–কুৎসিত করে দেওয়া হবে। হযরত আদম (আঃ)–এর মত তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে। তার মাথায়ও এক বিশেষ ধরনের মুকুট থাকবে। তার সাথীরা তাকে দেখে বলতে

শুরু করবে ঃ এই লোকটার অনিষ্ট হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আয় আল্লাহ্, একে আমাদের কাছে আসতে দিবেন না। তবুও সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তখন সাথীরা বলবে, আয় আল্লাহ্, একে লাঞ্ছিত করুন। সে তখন বলবে, আল্লাহ্‌র রোষানল তোমাদের প্রতি। শোন, তোমাদের প্রত্যেকেরই এই পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

'যখন এ যমীন প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবে এবং তামাম বোঝাসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করবে।' (যিলযাল ঃ ১, ২)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ ভূতলসহ সমগ্র যমীন থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং তার অভ্যন্তরস্থ মৃতদেহ ও তামাম রত্নরাজি বাইরে নিক্ষেপ করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা পাঠ করলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

'সেদিন এ যমীন সমস্ত খবর বলে দিবে।' (যিলযাল ঃ ৪)

অতঃপর বললেন, তোমরা জান, জমীন কি খবর বলবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। হুযূর বললেন, প্রত্যেক বান্দা-বান্দি যমীনের উপর যা কর্ম করেছে, যমীন সে-সবকিছুরই সাক্ষ্য প্রদান করবে। হুযূর বলেন ঃ তোমরা যমীন থেকে নিজেদের হিফাযত কর। কারণ, যমীন সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে। —ত্বাবরানী

অধ্যায় ঃ ৩৬

ইসরাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গায় ফুৎকার, ক্বিয়ামতের বিভীষিকা ও কবর হতে হাশরের মাঠে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى الْجَبْهَةَ وَ اَصْغٰى بِالْاُذُنِ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ ـ

'কিভাবে আমি আনন্দ-উল্লাস করবো, অথচ, ইস্‌রাফীল (আঃ) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে শির অবনত করে গভীর মনোযোগে কান পেতে অপেক্ষা করছেন—কখন শিঙ্গায় ফুঁকদানের হুকুম আসে।'

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, শিঙ্গাটা শিং-এর মত! হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শিঙ্গার গোলাকার মুখটি সাত আসমান-যমীনের পরিধি বরাবর। তিনি অপলক নেত্রে আরশের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন আদেশ করা হয়। প্রথম বার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দারা তাতে বেহুঁশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভীষণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীই মারা যাবে, মাত্র কয়েকজন ছাড়া। তারা হলেন, জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল ও মালাকুল-মউত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মালাকুল-মউতকে যথাক্রমে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রূহ্ কবযের হুকুম দিবেন ; অতঃপর মালাকুল-মউতও আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হবেন। এই ফুৎকারে সমগ্র বিশ্বপ্রাণীকুলের মৃত্যু ঘটার পর চল্লিশ বছর যাবত তারা আলমে-বর্‌যখে একরূপ অবস্থাতেই পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইস্‌রাফীলকে জীবিত করে দ্বিতীয়বার ফুঁকের হুকুম দিবেন। (প্রথম ফুঁককে বলা হয় 'নাফ্‌খায়ে ঊলা' এবং দ্বিতীয় ফুঁককে 'নাফ্‌খায়ে ছানিয়া') আল্লাহ্ পাক এ নাফ্‌খায়ে ছানিয়ার কথাই বলেছেন এই আয়াতে ঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ○

'অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা (জীবিত) হয়ে (আপন পদযুগলের উপর) দাঁড়িয়ে (পুনরুত্থানের বিস্ময়কর দৃশ্য) অবলোকন করতে থাকবে।' (যুমার ঃ ৬৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'শিঙ্গা ফুৎকারক ফেরেশ্তা পুনর্জীবিত হবার পর আবার শিঙ্গার কাছে এসে তা মুখে লাগাবেন। এবং এক পা আগে ও আর এক পা পিছনে স্থাপন করে দ্বিতীয় ফুৎকারের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকবেন।' বন্ধুগণ, শিঙ্গায় ফুকের কথা স্মরণ কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। চিন্তা কর, দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই যখন পুনর্জীবিত হবে তখন সেই ফুৎকারের বিভীষিকা দেখে তারা কিরূপ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, কিরূপ পেরেশান ও অসহায় বোধ করবে। তদুপরি, পরবর্তী ফয়সালার ভয়ে কিরূপ কম্পমান থাকবে যে, রহমত ও জান্নাতের ফয়সালা হয়, নাকি লা'নত ও গযবের। তুমিও সেদিন তাদের মত দিশাহীন ও অসহায় বোধ করবে। আর যদি তুমি দুনিয়াতে রাজা-বাদশা বা দাম্ভিক ঐশ্বর্যশালী হয়ে থাক তবে মনে রাখ, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশা ও ঐশ্বর্যশালীরা সেদিন সর্বাধিক বিপন্ন, বিষন্ন ও ঘৃণ্য সাব্যস্ত হবে। মানুষের পদস্রোত তাদের পিপীলিকার মত নিষ্পেষিত করবে।

সেইদিন জঙ্লী জানোয়াররা মাথা নীচু করে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে, প্রকৃতিগতভাবে মানবভীরু হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তারা মানুষের মাঝে এসে ভিড় করবে। এ তাদের কোন অপরাধের শাস্তি নয় বরং হাশর দিবসের ভীতি, প্রচণ্ড আওয়ায ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বিকটতায় ওরা মানুষের থেকে দূরে থাকার অনুভূতি বিস্মৃত করে দিবে। আল্লাহ্ পাক একথাই বলেছেন ঃ

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ○

'যখন জঙ্লী প্রাণীরা একত্রিত হবে।' (তাক্বীর ঃ ৫)

সেদিন সমস্ত শয়তান, বড় বড় না-ফরমান ও সীমালংঘনকারীরাও আল্লাহ্র সম্মুখে হাযিরার ভয়ে কাতর ও অবনত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ○

'আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি ঐ কাফেরদিগকে ও শয়তানদিগকে পুনরুত্থিত করবো এবং তাদেরকে উপুড় করা অবস্থায় জাহান্নামের পার্শ্বে এনে উপস্থিত করবো।' (মারইয়াম ঃ ৬৮)

হে মানুষ, চিন্তা কর, তখন তোমার কি পরিস্থিতি হবে, তোমার মন-মানসিকতার কি করুণ দশা হবে।' তারপর চিন্তা কর, পুনরুত্থানের পর কি অবস্থা দাঁড়াবে। সমস্ত মানুষদিগকে খৎনাহীনভাবে খালি পায়ে, উলঙ্গ দেহে হাশর-ময়দানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সে ময়দান তৃণ-লতাশূন্য সমতল ময়দান। এমন কোন টিলা থাকবে না যার আড়ালে লুকানো যাবে, এমন কোন নিম্নভূমিও থাকবে না যে, ফাঁকি দিয়ে তথায় পালিয়ে যাওয়া যায়। বরং তা হবে সম্পূর্ণ সমতল বিশাল ময়দান। দলে দলে সকলকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুব্হানাল্লাহ্! কত বড় শক্তিধর সেই খোদা যিনি সমগ্র পৃথিবীর আনাচ-কানাচ হতে হাজারো-লাখো রং-রূপ ও লাখো কিসিমের মাখলূককে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন। বাস্তবিকই, সেইদিন হৃদয়সমূহের প্রকম্পিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না, মস্তক ও দৃষ্টি অবনত করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকবে না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

'যেদিন যমীন ও আসমানসমূহকে ভিন্নতর যমীন ও আসমানে রূপান্তরিত করা হবে।' (ইব্রাহীম ঃ ৪৮)

এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে-আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ যমীনের ভিতর সংকোচন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হবে, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, উকাযী চামড়ার মত দীর্ঘায়িত করে চান্দির মত সাদাভ যমীনে পরিবর্তিত করা হবে—যার উপর কোন রক্তপাত, কোন পাপাচার সংঘটিত হয় নাই। আর আসমানের চন্দ্র, সূর্য, তারকামণ্ডলীও ধ্বংসপ্রাপ্ত

হবে। হে মিসকীন, হে সম্বলহীন! চিন্তা কর, সে-দিনটি কিরূপ ভয়াবহ ও সঙ্গীন হবে। হায়, সমস্ত মাখলূক যখন ঐ যমীনের উপর একত্রিত হবে তখন তাদের উপর হতে আকাশের তারকাসমূহ নীচে পড়তে থাকবে, চাঁদ-সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে, সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। এমনি অবস্থায় আসমান তাদের মাথার উপর ঘুরতে শুরু করবে এবং এই কঠিন, শক্ত ও মোটা আসমান পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশ্তাগণ বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবেন। হায়, কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, কি ভীষণ ও বিকট আওয়ায হবে যখন এ কঠিনতম আসমান খান-খান হতে থাকবে, অতঃপর হলুদাভ রঙে প্রবাহিত হতে থাকবে। পাহাড়-পর্বত তুলার মত হয়ে উড়তে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ দেহে, উলঙ্গ পায়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গ-পালের মত দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি লজ্জার কথা! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হালতে একজন আর একজনের দিকে দেখবে। তিনি বললেনঃ নিজ নিজ পরিস্থিতির ফলে সেই অবকাশই কারো হবে না।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

'প্রতিটি মানুষ সেদিন এমন অবস্থার সম্মুখীন থাকবে যা তাকে অন্য সবকিছুর কথা বিস্মৃত করে দিবে।' (আবাসা ঃ ৩৭)

অতএব, হে মানুষ, সেই ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন সকলের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে যাবে, তবুও একজন আর একজনের দিকে তাকাবার উপায় হবে না। আর তা সম্ভবই বা কিভাবে? কারণ, কেউ সেখানে উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, কেউ মাথার উপর চলবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তিন অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে ঃ সওয়ার হয়ে, পায়ে হেঁটে এবং চেহারার দ্বারা হেঁটে। একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চেহারার দ্বারা হাঁটবে কিরূপে? তিনি বললেন, যে খোদা পায়ের দ্বারা হাঁটিয়েছিলেন, তিনি চেহারার সাহায্যে হাঁটাবারও ক্ষমতা রাখেন।

মানুষ যে বস্তুকে ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা উপলব্ধি করে না তাকে অস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। সাপ যে বিনা পায়ে পেটের উপর বিদ্যুৎগতিতে হাঁটে তা যদি সে স্বচক্ষে অবলোকন না করতো তবে বিনা পায়ে হাঁটতে পারাকেও অস্বীকার করতো। অতএব, দুনিয়ার উপর অনুমান করে কিয়ামাতের বিস্ময়কর ঘটনাবলী অস্বীকার করা হতে বিরত থাক। কারণ, দুনিয়াতেও অনেক বিস্ময়কর জিনিস আছে যা স্বচক্ষে দেখার আগে তুমি অস্বীকারই করতে।

অতএব, হে বান্দা, তুমি ধ্যান কর যে, কিয়ামতের ময়দানে তুমি উলঙ্গ, অপমানিত-অপদস্থ অবস্থায় দিশাহারা হয়ে অপেক্ষা করছ যে, তোমার সম্পর্কে বেহেশ্তের ফয়সালা হয়, নাকি জাহান্নামের। সেই পরিস্থিতিকে অতি কঠিন বলে বিশ্বাস কর ; কারণ, সত্যিই তা যারপর নাই কঠিন। তারপর চিন্তা কর যে, সাত আসমান, সাত যমীনের সমস্ত মাখলূকাত তথা ফেরেশ্তা, জ্বিন-ইনসান, শয়তান, বন্য পশু, হিংস্র জন্তু, পশু-পক্ষী সবাই সেখানে একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড ভিড় সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্য আগের মত নাই, বরং তা দুই ধনুক পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে তাদের মাথার উপর প্রচণ্ড তাপ ঢালছে। আল্লাহ্র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নাই। একমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণই সেই ছায়া লাভে ধন্য হচ্ছে। আর বাকী সকলে প্রখরতর সূর্য্যতাপে জ্বলে-পুড়ে শেষ হচ্ছে। সূর্য্যের তেজ যেন তাদের গলিয়ে ফেলছে। অগ্নিঝরা তাপে মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়েছে। পরন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন ধাক্কা-ধাক্কি ও পায়ে-পায়ে ঘর্ষণ লাগছে। তদুপরি, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্র সম্মুখে হিসাবের লজ্জা ও অপমানবোধ তো আছেই। হায় কি বিভীষিকা! একদিকে সূর্য্যের অগ্নিঝরা উত্তাপ, অসংখ্য প্রাণীর নিঃশ্বাসের উত্তাপ, আর একদিকে লজ্জা, ভীতি ও অপমানবোধের দরুন হৃদয়ের অগ্নিসম যন্ত্রণার উত্তাপ। প্রতিটি চুলের গোড়া হতে ঘাম প্রবাহিত হয়ে কিয়ামাতের মাঠ ছেয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র দরবারে যার যার স্তর হিসাবে সেই ঘাম কারো হাঁটুর সমান, কারো কোমর সমান, কারো কানের লতি পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলছে। কেউ কেউ তো ঘামের ভিতর একেবারেই যেন ডুবে যাচ্ছে।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেদিন মানুষ রাব্বুল-আলামীনের সম্মুখে হিসাবের

জন্য দণ্ডায়মান হবে, সেদিন অনেকেই নিজের ঘামে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ক্বিয়ামতে মানুষের শরীর থেকে অজস্র ঘাম ঝরতে থাকবে।সেই ঘাম যমীনের সত্তর গজ তলদেশ পর্যন্ত পৌছবে। —বুখারী, মুসলিম

আর এক হাদীসে আছে, মানুষ দণ্ডায়মান অবস্থায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং সীমাহীন কষ্টের দরুন ঘাম ঝরে ঝরে গলা পর্যন্ত পৌছবে।

হযরত উক্‌বা ইব্‌নে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে সূর্য্য যমীনের নিকটবর্তী হবে ; ফলে, মানুষ ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো অর্ধহাঁটু, কারো হাঁটু, কারো উরু, কারো কোমর, কারো মুখ পর্যন্ত পৌছবে। কারো মাথা পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে।

হে মিসকীন ! হে সহায়-সম্বলহীন। হাশর ময়দানের ঘামের দরুন পরিস্থিতি ও সীমাহীন কষ্টের কথা চিন্তা করে দেখ। ঐ অবস্থায় অনেকে বলতে শুরু করবে, হে খোদা, আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে হলেও এ কঠিন বিপদ ও প্রতীক্ষার কষ্ট হতে মুক্তি দাও। অথচ তখনও হিসাব-কিতাব শুরু হয় নাই, কোন শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। হে মানুষ, তুমিও তো তাদেরই একজন হবে। তোমার কি জানা আছে যে, কি পরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে? মনে রেখো, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশে হজ্জ, জিহাদ, রোযা, নামায, কোন মুসলমানের উপকারের জন্য যাতায়াত, কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও অন্যায়-অনাচার হতে বিরত রাখার কাজে যদি তোমার ঘাম না ঝরে থাকে তবে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে লজ্জা, শংকা ও ভীতি তোমার সেই ঘাম বের করে ছাড়বে। তখন সেই কষ্টের কোন সীমা থাকবে না। মানুষ যদি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও দম্ভ-অহংকারের শিকার না হয় তা'হলে খুব সহজেই উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্‌র বিধান ও বন্দেগী পালনের কষ্ট সময় ও পরিমাণের দিক থেকে ক্বিয়ামতের নিদারুণ কষ্ট ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়কাল ও পরিমাণের তুলনায় অনেক তুচ্ছ, অতীব সামান্য। কারণ, সেই কষ্ট অতি ভীষণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ।

অধ্যায় ঃ ৩৭

মাখলুকাতের বিচারের বয়ান

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'বলতে পার, নিঃস্ব-নিঃসম্বল কাকে বলে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের বিবেচনায় নিঃস্ব-নিঃসম্বল তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ বলতে কিছুই নাই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃসম্বল হলো সেই ব্যক্তি যে কাল কিয়ামতে নামায-রোযা, সদ্‌কা-যাকাত প্রভৃতি আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু সে কাউকে গাল-মন্দ করেছিল, কাউকে চারিত্রিক অপবাদ দিয়েছিল। অন্যায়-ভাবে কারো মাল ভক্ষণ করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল, কাউকে প্রহার করেছিল— ফলে, ঐ সকল মযলূমকে তার নেকীসমূহ বন্টন করে দেয়া হবে। তাদের ক্ষতিপূরণের আগেই যদি তার নেকীসমূহ খতম হয়ে যায় তবে তাদের গোনাহসমূহ তার গর্দানে চাপানো হবে এবং পরিণামে তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।'

অতএব, হে বন্ধু, চিন্তা কর, সেদিন তোমার কি দুর্দশা হবে। কারণ, তোমার কোনও নেক আমল কি রিয়া ও শয়তানের ফেরেবমুক্ত আছে? নাই। তাই, দীর্ঘদিনেও যদি দু'য়েকটি দোষমুক্ত নেকী করেও থাক, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরাই তো তা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমি যদি আজীবন লাগাতার নফল রোযা ও রাতভর ইবাদতে অভ্যস্ত থাক তবুও নিজেই নিজের হিসাব নিলে দেখতে পাবে যে, এমন কোন দিন যায় নাই যেদিন তোমার জিহ্বা মুসলমানদের এমনসব গীবত করে নাই যার ক্ষতিপূরণে জীবনের যাবতীয় নেক আমলই তামাম হয়ে যাবে। তাহলে, আরও যে সকল গুনাহসমূহ রয়েছে—যেমন, হারাম মাল, হারাম রুযি ভক্ষণ, সন্দেহযুক্ত কাজ বা বস্তু ব্যবহার, ইবাদতে ত্রুটি প্রভৃতির কি পরিণাম হবে! তুমি পরের হক হরণ ও যুলুমের প্রায়শ্চিত্ত হতে মুক্তি লাভের কি আশা

করতে পার? অথচ, সেদিন শিংবিহীন জানোয়ারের প্রতি শিংওয়ালা জানোয়ারের যুলুমেরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বকরীকে পরস্পর গুতোগুতি করতে দেখে বললেন, হে আবূ যর, বলতে পার, কি জন্য ওরা গুতোগুতি করছে? আমি বললাম, জ্বী-না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক কিন্তু জানেন এবং কিয়ামত দিবসে ওদের মাঝে তার ফয়সালা করবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

'পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণীসকল ও দু' ডানায় ভর করে উড্ডয়নকারী পাখীর দল তোমাদেরই মত।' (আন্‌আম ঃ ৩৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, কিয়ামত দিবসে তাবৎ প্রাণীকূল তথা চতুষ্পদ জন্তু, যমীনে বিচরণকারী অন্যান্য জীব-জানোয়ার ও পাখীর দল—সকলকেই একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার অনুষ্ঠান করবেন, শিংহীনের জন্য শিংদারের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও, তখন তারা মাটি হয়ে যাবে। তা দেখে কাফেররা বলতে শুরু করবে ঃ হায়, আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম।

হে মিসকীন! কি অবস্থা হবে, যখন তুমি দেখবে যে, বহু কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত নেকীসমূহ তোমার আমলনামায় নাই। তুমি বলবে, আমার নেকীগুলো কোথায় গেল? তখন বলা হবে ঃ তা তোমার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগকারীদের আমলনামায় দেওয়া হয়েছে। আরও দেখবে, তোমার আমলনামা এমনসব পাপাচারে পূর্ণ হয়ে আছে যেসকল পাপাচার হতে তুমি কঠিন সাধনা ও কষ্টের দ্বারা নিজেকে বিরত রেখেছিলে। তুমি বলবে, হে খোদা, এ সকল পাপাচারে তো আমি কখনও লিপ্ত হই নাই। তখন জবাব আসবে ঃ এ হচ্ছে ঐ সকল মানুষের পাপরাশি যাদের তুমি গীবত করেছিলে, ভর্ৎসনা

করেছিলে, যাদের অনিষ্টের চিন্তা করেছিলে, লেন-দেনে, প্রতিবেশীত্বে, কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলোচনায় যাদের প্রতি অন্যায় করেছিলে ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরবের যমীনে মূর্তিপূজার ব্যাপারে শয়তান সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু, সেই তুলনায় ছোট ধরনের পাপে লিপ্ত দেখেই আনন্দিত হবে, অথচ, এ পাপাচারই তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। অতএব, তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। কারণ, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহ পরিমাণ নেকী নিয়ে আসবে। সে ধারণা করবে যে, এই নেকীর উসীলাতেই সে নাজাত পেয়ে যাবে। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তি আমার উপর এই যুলুম করেছিল, হক নষ্ট করেছিল। তখন হুকুম হবে যে, তার নেকীসমূহ থেকে তা পূরণ করে নাও। এভাবে হতে হতে তার একটিমাত্র নেকীও অবশিষ্ট থাকবে না। তার অবস্থা এ রকম যে, কিছু মুসাফির কোন জঙ্গলে অবতরণ করলো। তাদের সঙ্গে জ্বালানি নাই। তাই, তারা জ্বালানি সংগ্রহ করে অতঃপর খুব করে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং নিজেদের ইচ্ছামত যা করার করলো। অনুরূপ, যুলুমের গুনাহ্ও নেকীসমূহকে বরবাদ করে দেয়।

যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

'হে নবী! অবশ্যই তোমার মৃত্যু হবে এবং অবশ্যই তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর তোমরা কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।' (যুমার ঃ ৩০, ৩১)

তখন হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে যা-কিছু সংঘটিত হয়েছে, অপরাধের ধারা স্বরূপ তা কি সেখানে উত্থাপিত হবে? তিনি বললেন, হাঁ, তা পুনরায় উত্থাপিত হবে, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও। হযরত যুবায়ের

বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হায়, কি সঙ্গীন সেই দিনটি যেদিন মযলুমের পক্ষ হতে তিলমাত্র সহানুভূতি থাকবে না, একটি থাপ্পড়ও ক্ষমা করা হবে না, এমনকি একটি অন্যায় বচনও মাফ করা হবে না—যতক্ষণ না যালিমের নিকট হতে মযলুমের জন্য যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ পাক বান্দাদিগকে ধূলিমলিন ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তিনি এক আওয়ায দিবেন যা দূর থেকেও তেমনি শোনা যাবে যেভাবে নিকট হতে শোনা যাবে। তিনি বলবেন ঃ আমি বাদশাহ্, আমি হিসাব গ্রহণকারী, প্রতিফলদাতা। কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কোন দোযখীর কোন হক রয়েছে, যতক্ষণ আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ না গ্রহণ করি। অনুরূপ, কোন জাহান্নামীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার উপর কোন জান্নাতীর হক রয়েছে যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। এমনকি, আমি একটা চপেটাঘাতেরও আজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আমরা আরজ করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিভাবে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, অথচ, আমরা থাকবো উলঙ্গ দেহ, ধূলি-মলিন, সহায়-সম্বলহীন? তিনি বললেন, তোমাদের নেকীসমূহের দ্বারা আর নেকী না থাকলে মযলূমের পাপরাশি যালিমের গর্দানে চাপিয়ে দেওয়ার দ্বারা। অতএব, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি যুলুম থেকে বাঁচ, কারো মাল হরণ, মানহানি, হৃদয়ে আঘাত করা, আচার-আচরণে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপারসমূহ তো খাস বিষয়, তা দ্রুততর মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যার উপর, মানুষের প্রতি যুলুম বা অন্যান্য পাওনা দাঁড়িয়ে গেছে এবং ঐ সব অন্যায় থেকে তওবা করতঃ বিরতও হয়েছে, কিন্তু, হকদারের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারে নাই, তার জন্য উচিত অধিক পরিমাণে নেকী হাসিল করতে থাকা, যাতে তা ঐ প্রতিফল দিবসে তার কাজে আসে। এবং অতি গোপনে একান্ত এখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে এমন কিছু নেক আমল করা উচিত যা একমাত্র সে ও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানতে না পারে।

হয়ত বা ঐ সকল আমল তাকে আল্লাহ্ পাকের এমন নিকটতর ও প্রিয়পাত্র করে দিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ঈমানদার বান্দাগণের জন্য তার বিশেষ অনুগ্রহবশতঃ তিনি তার প্রতি মেহেরবান হয়ে পাওনাদারদের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। যেমন, হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ রাখছিলেন। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন যাতে তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান যাক, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তিকে হাঁটুমুখী করে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। তাদের একজন বলবে, হে আমার রব্ব্, আমার এ ভাইয়ের কাছ থেকে আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ্ পাক বলবেন, হে ব্যক্তি, তোমার ভাইয়ের হক আদায় করে দাও। সে বলবে, আয় খোদা! আমার একটা নেকীও যে অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ পাক তখন দাবীদারকে বলবেন, ওর তো কোন নেকীই অবশিষ্ট থাকে নাই, বল, এখন কি করতে চাও? সে বলবে, হে প্রতিপালক, সে আমার পাপের বোঝা বহন করুক। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, সত্যি সে দিনটি কি কঠিন ছিল! মানুষ সেদিন এমন সঙ্গীন বিপদে পড়বে যার জন্য তার পাপের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে তুলে দিতে প্রয়াস পাবে। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঐ দাবীদারকে বলবেন, মাথা তুলো, বেহেশ্তের দিকে তাকাও। সে মাথা তুলে দেখবে। হে আল্লাহ্, এ-যে মূল্যবান চাঁদির সু-উচ্চ শহরসমূহ ও মুক্তাখচিত সোনার বালাখানাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এসকল নে'আমত কোন্ নবীর জন্য? কোন্ সিদ্দীকের জন্য? অথবা কোন্ শহীদের জন্য? আল্লাহ্ বলবেন, এ তার জন্য যে আমাকে এর মূল্য দিতে পারবে। সে বলবে, আয় আল্লাহ্! কার সাধ্য সে, এর মূল্য দিতে পারে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমিই তা পার। সে বলবে, তার মানে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যদি তোমার ভাইকে মাফ করে দাও। সে বলবে, হে মাওলা, এ ভাইকে আমি মাফ করে দিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তোমার ভাইয়ের হাত ধর এবং তাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও।—রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুরুস্ত রাখ, পারস্পরিক মনোমালিন্যের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে নাও। কারণ, আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেন।

বস্তুতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত নে'আমত পাওয়ার জন্য নিজেকে আল্লাহ্র আখলাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ অন্যান্য চরিত্রসমূহের অনুকরণ কর। এখন তুমি মনে মনে চিন্তা কর যে, তোমার আমলনামা যদি অন্যের হক থেকে মুক্ত থাকবে কিংবা থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তুমি নিশ্চিত কামিয়াবী লাভ করতে পার তাহলে তোমার কি আনন্দ হবে যখন তুমি কাজীর দরবার হতে মুক্তি লাভ করবে, যখন তোমার প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হবে, যখন তোমাকে শংকামুক্ত সৌভাগ্যের ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। তখন তোমার প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে যাবে। তুমি লোকদের মাঝে উল্লসিত মনে মাথা উঁচু করে হেলে-দুলে চলবে। তোমার উপর কারো কোন বোঝা থাকবে না। তোমার মুখমণ্ডলে সুখের আভা ফুটে উঠবে, তোমার ললাটে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির শীতলতা মুক্তার মত চমকাতে থাকবে। তাবৎ মানবসম্প্রদায় তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমার সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখে তারা ঈর্ষান্বিত হবে। তোমার সামনে ও পিছনে আল্লাহ্র ফেরেশ্তারা চলতে থাকবে। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে যে, ইনি অমুকের সন্তান অমুক, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। সে এমন সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে যার পর আর কখনও কোন দুঃখ-দুর্গতি আসবে না।

হে মানুষ, দুনিয়ার জীবনে রিয়া, দ্বীনে শিথিলতা, কৃত্রিমতা ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জা দ্বারা তুমি মানুষের মনে যতটুকু সম্মান লাভ করতে পারতে,—এই সম্মান ও মর্যাদাকে সেই তুলনায় অনেক বড় মনে কর না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে, এই সম্মান দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্মানের চাইতে অনেক বড়—আর মূলতঃ সেই মান-মর্যাদার সাথে দুনিয়ার মান মর্যাদার

তো কোন তুলনা করাই ভুল—তাহলে তুমি নির্মল হৃদয়, সাচ্চা নিয়ত ও সর্ব বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ত ও আস্থাপূর্ণ সু–সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সেই মর্তবা লাভের চেষ্টা কর। এতদ্ব্যতীত আর কোন পথেই তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

হে মানুষ, আল্লাহ্ পানাহ্! তোমার অবস্থা যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তোমার আমলনামায় যদি এমন কোন অপরাধ দেখা যায় যাকে তুমি তুচ্ছ ভেবেছিলে, অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই সঙ্গীন, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি রোষান্বিত হয়ে বলবেন ঃ হে নিকৃষ্ট বান্দা, তোমার উপর আমার লা'নত ; আমি তোমার কোন ইবাদতই কবুল করব না। এই ঘোষণা কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেহারা কালোবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে গোসান্বিত দেখে ফেরেশ্‌তাগণও তোমার উপর ক্ষেপে যাবে। এবং বলবে, তোমার উপর আমাদের লা'নত এবং সমগ্র মাখলুকের লা'নত। ঠিক ঐ মুহূর্তে 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা তোমার দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহ্‌কে গোস্বান্বিত দেখে তারাও গোস্বায় ফেটে পড়বে। তারা তোমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করবে। তাদের চেহারা এবং গঠনও হবে খুবই ভীতিপ্রদ। তারা তোমাকে উপুড় করে তোমার কপালের চুল ধরে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। লোকেরা তোমার কালো–কুশ্রী চেহারা ও তোমার এ অপমান ও লাঞ্ছনা দেখতে থাকবে। আর তুমি 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' বলে চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে ফেরেশ্‌তারা বলবে, আজ শুধু একটি ধ্বংস আহ্বান করো না বরং শত শত ধ্বংসের দো'আ কর। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, এই ব্যক্তিটি অমুকের সন্তান অমুক ; আল্লাহ্ পাক তার অপকীর্তিসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন, তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছেন ; তার কুকর্মসমূহের দরুন তার উপর লা'নত করেছেন। ফলে, তার কপাল এমন পোড়াই পুড়েছে যে, কোনদিন আর এই কপালে জোড়া লাগবে না ; ভাগ্যের এ বিড়ম্বনা থেকে তার কখনও মুক্তি নাই। হে মানুষ, বহুক্ষেত্রে এ ধরণের পরিণতি ভুগতে হবে এমনসব গুনাহের দরুন যা তুমি লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে করেছ অথবা মানুষের অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠার জন্য তা করেছ, অথবা লোক–লজ্জার ভয়ে তাতে লিপ্ত হয়েছ। ছি, তুমি কত বড় মূর্খ (?) যে, তুমি ক্ষণস্থায়ী

দুনিয়ার গুটিকয়েক মানুষের কাছে লজ্জার তোয়াক্কা করছ, অথচ ক্বিয়ামতের অপার ময়দানের বিশাল মানব কাফেলার সম্মুখে অপদস্থ হবার কথা ভাবছো না। সেখানে তো শুধু অপমানই হতে হবে না বরং আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হবে, ভীষণ যন্ত্রণাপদ আযাব হবে, 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা টেনে নিয়ে দোযখের মাঝে নিক্ষেপ করবে।

হে মানুষ, এ–ই হবে সেদিন তোমাদের অবস্থা। অথচ, তুমি ভয়হীন, বেপরোয়া।

অধ্যায় ঃ ৩৮

ধন-সম্পদের অপকারিতার বয়ান

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিরা যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র ইয়াদ বিস্মৃত না করে দেয়। যারা তা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (মুনাফিকূন ঃ ৯)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

'তোমাদের সম্পদ ও আওলাদ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা। এবং আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে বৃহৎ পুরস্কার।' (তাগাবুন ঃ ১৫)

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে গিয়ে পুরস্কার লাভের উপর সন্তান ও জাগতিক ধন-সম্পদের প্রাধান্য দিবে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

'যারা কেবল পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে

তাদের কৃতকর্মগুলো দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই ; এবং তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে দোযখ ছাড়া আর কিছুই নাই, আর তারা যা কিছু করেছিল, তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে। (হূদ ঃ ১৫, ১৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ○ أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنَىٰ

'সত্য সত্যই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।' (আলাক ঃ ৬, ৭)

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন ও খোদাবিস্মৃত করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১)

রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদ ও সম্মানের মোহ হৃদয়ে কপটতা উৎপন্ন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ أُرْسِلَا فِيْ زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِأَكْثَرَ إِفْسَادًا فِيْهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِيْ دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ۔

'দুটি হিংস্র বাঘকে কোন বকরীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে তা ঐ বকরী পালের জন্য অত বেশী ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্পদ ও সম্মানের মোহ যেকোন মুসলমানের দ্বীনের জন্য।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিদের ধ্বংস অবধারিত; তবে যারা সেই সম্পদ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট

কারা? তিনি বললেন, ধনী ব্যক্তিরা (যদি তারা সৎপথে আয় ও ব্যয় না করে থাকে।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন যে, তোমাদের পর এমনসব লোকেরা দুনিয়াতে আসবে যারা সব রকমের উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবে, রকমারী উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার হবে, বিভিন্ন রঙের সুন্দরী নারীদেরকে বিবাহ করবে, বিভিন্ন রং-রূপের উৎকৃষ্টতম লেবাস-পোষাক পরিধান করবে। কিন্তু অল্পতে তাদের পেট ভরবে না, অনেক পেয়েও তাদের সাধ মিটবে না ; দুনিয়ার জন্য তারা হবে পাগলপারা, দিনরাত দুনিয়ার পিছনেই পড়ে থাকবে। আল্লাহ্কে ছেড়ে দুনিয়াকেই তারা মা'বূদ বানাবে, দুনিয়াকেই তাদের পালনকর্তা জ্ঞান করবে। দুনিয়াই হবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তারা স্ব-স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। অতএব, তোমাদের পরবর্তীদের মধ্যে যারা সেই যমানা পাবে তাদের প্রতি মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কঠোর নির্দেশ, তারা যেন ঐ সব লোকদের সালাম না দেয়, তাদের রোগীদের পরিচর্যায় না যায়, তাদের জানাযায় শরীক হবে না, তাদের বড়দের প্রতি সমীহ প্রদর্শন করবে না! যে ব্যক্তি তা করবে, সে ইসলামকে ধ্বংসের কাজে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া হাসিল করে, নিজের অজান্তে সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يَقُوْلُ اِبْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ.

'মানুষ তো 'আমার মাল, আমার মাল' বলে বেড়াচ্ছে। অথচ, তোমার মাল তো শুধু এতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, অথবা দান-সদ্কা করে আখেরাতের জন্য জমা করেছ।'

এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার কি হলো যে, আমি মৃত্যুকে

ভালবাসতে পারি না? হুযূর বললেন, তোমার কাছে কোন মাল আছে? সে বললো, জ্বী-হাঁ, আছে। হুযূর বললেন, তোমার মালকে (আখেরাতের পথে) আগেই পাঠিয়ে দাও। কারণ, মু'মিনের অন্তরে তার সম্পদের প্রতি টান থাকে। অতএব তা অগ্রে পাঠিয়ে দিলে সেই প্রেরিত মালের কাছে চলে যেতে আগ্রহ পয়দা হবে। আর যদি মালকে পিছনে ফেলে যায় তবে মালের সাথে নিজেরও থেকে যেতে ইচ্ছা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَخِلاَّءُ ابْنِ اٰدَمَ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ يَتَّبِعُهٗ اِلٰى قَبْضِ رُوْحِهٖ وَالثَّانِىْ اِلٰى قَبْرِهٖ وَالثَّالِثُ اِلٰى مَحْشَرِهٖ فَالَّذِىْ يَتْبَعُهٗ اِلٰى قَبْضِ رُوْحِهٖ فَهُوَ مَالُهٗ وَالَّذِىْ يَتْبَعُهٗ اِلٰى قَبْرِهٖ فَهُوَ اَهْلُهٗ وَالَّذِىْ يَتْبَعُهٗ اِلٰى مَحْشَرِهٖ فَهُوَ عَمَلُهٗ.

'তিনটি বস্তু আদম সন্তানের বন্ধু ; তন্মধ্যে একটি তার রূহ্-কবয পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকবে, আর একটি কবর পর্যন্ত, আর একটি হাশরের মাঠ পর্যন্ত। প্রথমটি তার মাল, দ্বিতীয়টি তার আত্মীয়-স্বজন, তৃতীয়টি হচ্ছে তার আমল।'

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত আবূ দার্‌দা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট পত্র লিখেছিলেন ঃ আমার ভ্রাতা! দুনিয়ার ধন-সম্পদ এই পরিমাণ সঞ্চিত করোনা যার শোকর তুমি আদায় করতে পারবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ধন-সম্পদের ব্যাপারে যে আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলেছে এমন মালদারকে হাশর মাঠে হাযির করা হবে এবং তার মাল তার সম্মুখে থাকবে। যখন তার পুলছেরাত পার হবার সময় আসবে তখনই সে কেঁপে উঠবে, কিন্তু মাল তাকে বলবে, নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাও। কারণ, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের যে হক ছিল তা তুমি আদায় করেছ। অতঃপর এমন মালদারকে হাযির করা হবে যে মালের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে নাই। মালকে তার গর্দানের

উপর রাখা হবে। যখনি সে পুলছেরাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হবে, মাল তাকে বলবে ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক আদায় কর নাই। তুমি ধ্বংস হও, বরবাদ হও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা যখন মারা যায় তখন ফেরেশ্‌তারা বলে ঃ সে কি কি আমল পাঠিয়েছে? আর লোকেরা বলে? সে কি কি রেখে গেলো?

তিনি আরও বলেছেন ঃ

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتُحِبُّوا الدُّنْيَا

'তোমরা জায়গা-জমির আয়োজন করো না, অন্যথায় দুনিয়ার মোহ-মায়া তোমাদের গ্রাস করে ফেলবে।'

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দার্‌দা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তখন হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) বললেন, আয় আল্লাহ্‌, যে ব্যক্তি আমার সাথে দুরাচার করলো, তুমি তাকে স্বাস্থ্যবান করে দাও, দীর্ঘ জীবন দান কর এবং অঢেল সম্পদের মালিক করে দাও।' এতে বুঝা যায় যে, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের সাথে যদি বিপুল সম্পদও থাকে তাহলে তা মুসীবতে পরিণত হয়। কারণ, নিশ্চয় সে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালংঘনের দিকে পা বাড়াবে।

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দেরহামকে হাতের তালুতে রেখে বললেন, হে দেরহাম, (রৌপ্য মুদ্রা), আমি জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে সরে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) দূত মারফত যয়নব বিন্‌তে-জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। হযরত যয়নব তা দেখে বললেন, এ কি জিনিস? উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন, আপনার জন্য হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পাঠানো হাদিয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ উমরকে মাগফিরাত করুন। অতঃপর তিনি তাঁর একটা দোপাট্টাকে ছিড়ে কতগুলো থলে বানালেন। এবং ঐ হাদিয়ার মাল থলেতে পুরে আহ্‌লে-বাইত্‌, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতঃপর

হাত তুলে দো'আ করলেন* ঃ আয় আল্লাহ্ উমরের হাদিয়া এই বৎসর পর আর কখনো যেন আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। এর পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, যে কেউ টাকা-কড়িকে বড় মনে করে, আল্লাহ্ পাক তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে দেন।

কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম যখন দিরহাম ও দীনার (রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা) বানানো হয় তখন ইবলীস ঐ দিরহাম-দীনারকে সযত্নে তুলে নিয়ে তার কপালে লাগায়। অতঃপর চুম্বন করে বললো, যারা তোমাদের ভালবাসবে, তারাই আমার প্রকৃত গোলাম।

হযরত সুমাইত বিন আজ্লান (রহঃ) বলেন, টাকা-পয়সা, সোনা-চান্দি হচ্ছে মুনাফিকদের লাগাম, এই লাগাম ধরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন, টাকা-পয়সা হলো বিষাক্ত বিচ্ছু ; যদি তাকে বশ করার মন্ত্র না জান তাহলে তা স্পর্শই করো না। কারণ, এ বিচ্ছু তোমাকে দংশন করলে তার বিষে তোমার মৃত্যু অবধারিত। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি সেই মন্ত্রটি? তিনি বললেন, হালাল পথে উপার্জন করা এবং হক-হালাল ক্ষেত্রে ব্যয় করা।

আলা ইব্নে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়া পরমা সুন্দরীর বেশে আমার সম্মুখে হাযির হয়েছিল। তখন আমি বললাম, হে দুনিয়া, আমি আল্লাহ্র নিকট তোর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। জবাবে সে আমাকে বললো, আল্লাহ্র নিকট আমা হতে আশ্রয় পাওয়াতেই যদি তোমার সুখ-শান্তি বিশ্বাস কর তবে টাকা-কড়ি ও সোনা-চান্দিকে ঘৃণা কর। কারণ, এটাই হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু। কারণ, এর দ্বারা দুনিয়ার সবকিছুই অর্জন করা যায়। অতএব, যে ব্যক্তি এ থেকে বিরত থাকবে, তার পক্ষেই সম্ভব হবে দুনিয়া হতে দূরে থাকা।

মাসলামাহ্ বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাকে বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, আপনি দ্বীনের

জন্য ও মানুষের কল্যাণে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু, আপনার তেরটি সন্তানের কারো জন্যই তো আপনি একটি কানাকড়িও রেখে গেলেন না। জবাবে উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) বললেন, আপনি যে বললেন যে, আমি তাদের জন্য কানাকড়িও রেখে যাই নাই, কিন্তু আমি তো তাদের কোন হক অনাদায়ী রেখে যাই নাই এবং তাদের কোন হক আমি অন্যকে দিয়ে দিই নাই। কথা এই যে, আমার সন্তানেরা হয়তঃ আল্লাহ্‌র অনুগত হবে অথবা নাফরমান। যদি তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তবে আল্লাহ্‌ই তাদের জন্য যথেষ্ট ; কারণ, আল্লাহ্ পাক নেককারদের ব্যবস্থাপক ও মুরব্বী। আর যদি তারা অবাধ্যতা করে তবে সেজন্য আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌নে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বহু সম্পদের অধিকারী ছিলেন। (কিন্তু সবকিছুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন)। কেউ তাঁকে বললেন, এই সম্পদ আপনার সন্তানদের জন্য রেখে গেলে তাদের কল্যাণ হতো না? তিনি বললেন, না, আমি তা করবো না। বরং এ সম্পর্কে আমি আমার কল্যাণে আমার আল্লাহ্‌র কাছে জমা করছি। আর সন্তানদের জন্য সম্পদ নয় বরং সেই আল্লাহ্‌কে রেখে যাচ্ছি।

বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ আবু আবদি-রাব্বিহী (রহঃ)-কে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতা, তুমি বিপদের বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদায় হবে আর সন্তানদেরকে সুখে রেখে যাবে—তা করো না। এতদশ্রবণে তিনি সম্পদ থেকে এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ফী সাবীলিল্লাহ্ বিলিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে মু'আয (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষ তার সম্পদের ব্যাপারে এমন দু'টি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয় যে, এর চাইতে বড় বিপদের কথা কেউ কোনদিন শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকালে তার সমস্ত মাল-দৌলতই রেখে দেওয়া হয় ; পরন্তু, তাকে সমস্ত মালের হিসাব দিতে হয়।

অধ্যায় ঃ ৩৯

আমল, মীযান পাল্লা ও জাহান্নামের আযাবের বয়ান

আমার ভাই! মীযান পাল্লার চিন্তা-ফিকির থেকে উদাসীন থেকো না। আমলনামা ডান হাতে মিলবে না বাম হাতে সেই বিষয়ে গাফেল থেকো না। কারণ, সওয়াল-জওয়াবের পর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক শ্রেণী হবে সম্পূর্ণ নেকীশূন্য। পাখীরা যেভাবে ঠোঁট মেরে দানা তুলে নেয় অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে একটি 'কালো গর্দান' বের হয়ে তাদের গ্রাস করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আগুন তাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। এবং ঘোষণা করা হবে ঃ ওদের কপাল খারাপ হয়ে গেছে, আর কোনদিন তা ভাল হবে না।

আর এক শ্রেণী হবে যাদের কোনই পাপ নাই। তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র গুণগানকারীগণ উঠ, চল। অতঃপর তারা বেহেশ্‌তের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। অনুরূপ 'রাত্রিজাগরণকারী'দের সম্পর্কে এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও বন্দেগী থেকে গাফেল করতে পারে নাই—তাদের সম্পর্কেও ঐ ঘোষণা করা হবে এবং তারাও বেহেশ্‌তে চলে যাবে। অতঃপর তাদের সকলের ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া হবে ঃ ওরা চির নেকবখ্‌ত ও সৌভাগ্যশীল ; এরপর কখনও কোন দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্য তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

এরপর তৃতীয় শ্রেণীটি রয়ে যাবে, আর তাদের সংখ্যাই হবে সর্বাধিক। তারা ভালও করেছে, খারাপও করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওসব কু-কর্ম তাদের অজ্ঞাত থাকলেও আল্লাহ্‌ পাকের নিকট তা গোপন থাকে নাই। হয়তঃ তাদের নেকীর পরিমাণ বেশী অথবা বদীর পরিমাণ বেশী হবে। কিন্তু, অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌ তাদের সম্মুখে সবকিছুই তুলে ধরবেন যাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্‌র করুণা উপলব্ধি করে, অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও

আল্লাহ্র ইনসাফ তাদের কাছে প্রকাশিত থাকে। নেকী-বদীর বিবরণ সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়তে শুরু করবে এবং মীযান পাল্লা খাড়া করা হবে। সকলের দৃষ্টি আমলনামার দিকে নিবদ্ধ থাকবে যে, তা ডান হাতে আসছে নাকি বাম হাতে। অতঃপর মীযানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে যে, পাপের পাল্লা ভারী হচ্ছে না নেকীর পাল্লা। হায়, সে সময়টি হবে ভীষণ আতঙ্কজনক ; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তখন স্থির থাকবে না।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হার কোলে শির-মুবারক রেখে আরাম করছিলেন। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আখেরাতের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-মুবারকের উপর পতিত হলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কাঁদছ কেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, আখেরাতের কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, তখন আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি আপনি স্মরণ করবেন? হুযূর বললেন ঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَاِنَّ اَحَدًا لَا يَذْكُرُ اِلَّا نَفْسَهٗ اِذَا وُضِعَتِ الْمَوَازِيْنُ وَوُزِنَتِ الْاَعْمَالُ حَتّٰى يَنْظُرَ ابْنُ اٰدَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الصُّحُفِ حَتّٰى يَنْظُرَ اَبِيَمِيْنِهٖ يَاْخُذُ كِتَابَهٗ اَوْ بِشِمَالِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ ـ

'সেই আল্লাহ্র শপথ—যার হাতে আমার জীবন-মরণ, তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ যখন মীযান পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে। মানুষ ভীতি বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, নাকি বদীর পাল্লা। আমলনামা বিতরণের সময় তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে। আর পুলসিরাত পার হওয়ার সময়।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে প্রত্যেক আদম সন্তানকে মীযানের পাল্লাদ্বয়ের সম্মুখে এনে খাড়া করা হবে। প্রত্যেকের উপর একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে উক্ত ফেরেশ্‌তা এত বুলন্দ আওয়াযে ঘোষণা করবে যে, সমস্ত মানুষ তা শুনতে পাবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির সাফল্য ও সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছে ; এরপর কখনো সে দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্যে পতিত হবে না। আর পাল্লা হাল্‌কা দেখতে পেলে সে ঘোষণা করবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির হতভাগ্য হয়ে গিয়েছে, কোনদিন সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। তাছাড়া 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় লৌহ নির্মিত বিরাট বিরাট হাতুড়ী হাতে করে তার দিকে এগিয়ে যাবে। এবং ঐ জাহান্নামী দলকে ধরে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এক ঘোষণা দিবেন, সেখানে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামও থাকবেন। বলবেন, হে আদম, যাও, জাহান্নামীদেরকে পাঠাও। হযরত আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীরা সংখ্যায় কত? আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ হাজারে নয় শ' নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এই হাদীস শ্রবণের পর সাহাবীগণ এমনই দিশাহারা হয়ে পড়লেন যে, তাঁদের হাসি একদম খতম হয়ে গেল। হুযুর তাদের এ অবস্থা দেখে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন-মরণ, তোমাদের সাথে আরও দু'টি জাতি থাকবে যাদের সংখ্যা সমগ্র বনী আদম ও বনী ইবলীসের (জ্বিনজাতি) ধ্বংসপ্রাপ্তদের চাইতেও বেশী হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরা কারা? হুযুর বললেন ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজ। এই সংবাদ শ্রবণে সাহাবীদের অস্থিরতা দূরীভূত হয়। হুযুর বললেন, তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন, ক্বিয়ামতের জনসমুদ্রে তোমরা হবে উটের পাঁজরের তিলকের মত কিংবা অন্য কোন জানোয়ারের সম্মুখের পায়ের চিহ্নের মত। (অর্থাৎ সহজেই তোমাদেরকে চিনে নেওয়া যাবে)।

হে গাফেল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাজ-সামানের মোহে ধোকাগ্রস্ত, যে স্থান ত্যাগ করে তোমাকে চলে যেতে হবে তার চিন্তা পরিত্যাগ কর ; যে ঘাটে তোমাকে যেতে হবে সেই ঘাটের চিন্তামগ্ন হও। তোমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম অতিক্রম করা ব্যতীত কারুরই কোন গত্যন্তর নাই।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝

'তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। এটি আল্লাহ্র অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা খোদাভীরুদেরকে নাজাত দিবো, আর যালিম-পাপিষ্ঠদিগকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

(মারইয়াম ঃ ৭১, ৭২)

তাহলে তোমার জাহান্নাম অতিক্রম চুড়ান্ত বিষয়, কিন্তু নাজাত পাওয়াটা অনিশ্চিত। তাই, অন্তর মাঝে সেই ভীতিপ্রদ ঘাঁটির দৃশ্যটা অনুভব কর, হয়তঃ তাতে তোমাকে নাজাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা কর, হাশরের মাঠের এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে মানুষের কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হবে। তারা কিয়ামতের প্রকৃত খবরাখবর ও সুপারিশকারীদের সুপারিশের অপেক্ষায় থাকবে, হঠাৎ করে ভয়াবহ রকমের অন্ধকার পাপিষ্ঠদিগকে ঘিরে ফেলবে ; দোযখের লেলিহান শিখা তাদের উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়ে যাবে ; তারা দোযখের বিকট চিৎকার ও গোস্বান্বিত গর্জন শুনতে পাবে। সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করবে যে, ধ্বংস অবধারিত ; এমনকি সৎলোকেরাও অশুভ পরিণামের আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এক আযাবের ফেরেশ্তা চিৎকার করে বলবে, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়—দুনিয়াতে যে নাকি অনেক বড় বড় আশা দিয়ে নিজেকে ধোকা দিয়েছে, জীবনকে অন্যায় কাজে ধ্বংস করেছে। ফেরেশ্তারা লোহার হাতুড়ী নিয়ে তার দিকে ছুটে যাবে, কঠোর ধমকা-ধমকি শুরু করবে এবং তাকে মাথা নীচু করে কঠিন শাস্তির জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করবে এবং বলবে ঃ

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○

'হাঁ, মজা চাখো, তুমি কিনা খুব প্রতাপশালী ও মর্যাদাশীল মানুষ। হায়, তাদেরকে এক সংকীর্ণ পরিসর, চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধ্বংসাত্মক উপকরণে পূর্ণ এমন এক কারাগারে বন্দী করা হবে যেখানের বন্দীর কোন মুক্তি নাই। পরন্তু, দোযখকে উত্তরোত্তর অধিকতর দাহিকাশক্তিতে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। জ্বলন্ত 'জাহীম' তাদের আবাস, অত্যন্ত গরম পানি তাদের পানীয়। 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্তারা হাতুড়ীর দ্বারা তাদের মস্তক গুঁড়িয়ে দিবে। 'হাবিয়া' নামক দোযখ তাদের বক্ষে চেপে ধরবে। তাদের আশা-আকাংখা বলতে সেখানে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। কোন মতেই আর মুক্তি নাই, সুখ নাই স্বস্তি নাই। মাথা ও পদযুগল একত্র করে বাঁধা হবে। পাপের তিমিরে চেহারা থাকবে বিশ্রী কালো। চতুর্দিকে ওদের গগনবিদারী চিৎকার ধ্বনিত হবে ঃ 'হে মালেক! (দোযখের দারোগা), প্রতিশ্রুত আযাবের দুর্ভোগে শেষ হলাম। হে মালেক! কি শক্ত লোহা, কি ভারী হাতুড়ী। হে মালেক! আমাদের চামড়া দগ্ধিভূত হয়ে সারা। হে মালেক! আমাদের বের কর, মুক্তি দাও ; আর কোনদিন অন্যায়ের দিকে পা বাড়াবো না।' তখন আযাবের ফেরেশ্তারা বলবে ঃ না, না, কিছুতেই তোমরা 'আমান' পাবে না ; অপমানকর এ বন্দীশালা থেকে মুক্তি জুটবে না ; এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক, খবরদার! মুখ খুলবে না। তোমাদের মুক্তি দিলেও আবার তোমরা নিষিদ্ধ পথেই ছুটে চলবে। এতদশ্রবণে তারা নিরাশ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। কিন্তু, সেই আক্ষেপ অনুতাপ তাদের কোন কাজে আসবে না। বরং জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় উপুড় করে ফেলে দেওয়া হবে। উফ্! তাদের উপরে আগুন, নীচে আগুন, ডানে আগুন, বাঁয়ে আগুন ; আগুনের ভিতর ডুবে থাকবে। আগুন তাদের খাদ্য, আগুন তাদের পানীয়, আগুন তাদের পোশাক, আগুন তাদের বিছানা-বালিশ।

মোটকথা, সর্বদিকে শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা, আলকাতরার পোশাক, হান্টারের প্রচণ্ড আঘাত, জিঞ্জিরের দুর্বহ ভার। ভীড়ের মাঝে অস্থির ও নড়বড় পায়ে চলবে। মগজ অগ্নির উত্তাপে ফুটন্ত হাঁড়ির মত টগবগ করতে থাকবে। 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' চীৎকারে বাতাস ভারী করে তুলবে।

যখনই তারা 'হায় ধ্বংস' বলে চিৎকার করবে তখনই তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে, তাদের পেটের ভিতরের সবকিছু এবং চামড়া দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। তদুপরি, হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে কপাল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ; সেই যখমের পুঁজ মুখ দিয়ে বের হবে ; পিপাসার জ্বালায় কলিজা ফেটে যাবে ; চোখের মনি পানি হয়ে গালের উপর প্রবাহিত হবে। গালের গোশত খসে পড়ে যাবে। শরীরের সমস্ত, এমনকি চামড়াও জ্বলে-গলে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে পড়বে। চামড়া যখন চরমভাবে জ্বলে-জ্বলে কয়লা হবে তখন আবার তাকে নতুন চামড়ায় পরিণত করা হবে। রূহ্ হাড্ডিসার দেহের রগ ও হাড়ে বিরাজমান থাকবে। তাও অগ্নিশিখায় জ্বালায় কাতর আর্তনাদ করতে থাকবে। তারা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু, মরতেও পারবে না। গরম পানির দরুন তাদের কালো চেহারা ও দৃষ্টিশক্তিহীন চোখের দিকে দেখলে তোমার কেমন লাগবে? তাদের জিহ্বা বাকশক্তিহীন, পিঠ ও হাড্ডিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ, কান কাটা, চামড়া ছিন্ন-ভিন্ন, হস্তযুগল গর্দানের সঙ্গে জিঞ্জিরাবদ্ধ। মাথা ও পা একসাথে বাঁধা। তারা চেহারা দ্বারা আগুনের উপর হাঁটবে, তখন লৌহ-শলাকা চোখের ভিতর ঢুকবে, আগুনের শিখা গোপন অঙ্গসমূহেও ছড়িয়ে পড়বে। জাহান্নামের ভয়ানক সাপ-বিচ্ছুরা দংশন করতে থাকবে। এ হচ্ছে তাদের অবর্ণনীয় মুসীবতের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এখন তাদের ও জাহান্নামের তফসীলী পরিস্থিতি যে কি হতে পারে তাও একটু লক্ষ্য কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখের ভিতর সত্তর হাজার 'ওয়াদী' হবে, প্রতিটি ওয়াদীতে সত্তর হাজার ঘাঁটি থাকবে। প্রতিটি ঘাঁটিতে সত্তর হাজার অজগর ও সত্তর হাজার বিচ্ছু থাকবে। কাফের ও মুনাফিক জাহান্নামে পৌঁছার পর এ সবগুলোই তাদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বল্-হুয্ন্' (দুর্গতির গর্ত) ও 'ওয়াদীল-হুযুন্' (দুশ্চিন্তাপূর্ণ নিম্নভূমি) থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাও। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, 'দুশ্চিন্তা-দুর্গতিপূর্ণ গর্ত বা নিম্নভূমি'র কি অর্থ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে জাহান্নামের এমন একটা এলাকা যা থেকে জাহান্নাম নিজেই সত্তরবার

আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চায়। আল্লাহ্ পাক তা রিয়াকার কারী ও আলেমদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। এ হচ্ছে জাহান্নামের বিশালতা ও তার ওয়াদীসমূহের শাখাসমূহ। আর সেই ওয়াদীর সংখ্যা হবে মূলতঃ দুনিয়ার ওয়াদী তথা খাহেশাতের সংখ্যা হিসাবে। মানুষ যেহেতু বিশেষতঃ সাতটি অঙ্গের দ্বারা পাপ করে তাই সে অনুপাতে জাহান্নামেরও সাতটি দরজা হবে, একটি আর একটির উপর। সর্বোচ্চ হবে জাহান্নাম, তারপর 'ছাকার', তারপর 'লাযা', তারপর 'হুতামাহ্' তারপর 'ছাঈর', তারপর 'জাহীম', তারপর 'হাবিয়া'। তাহলে চিন্তা কর, হাবিয়ার গহীনতা কত গভীর। তার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, যেরূপ দুনিয়ার খাহেশাতের কোন সীমা নাই। তাই, বলতে হয় যে, হাবিয়ার গভীরতার শেষ প্রান্ত নিরূপণ করতে যাওয়া মানে, হাবিয়া অপেক্ষা গভীরতর কোন হাবিয়ার সন্ধান করা। গহীন হাবিয়ার প্রান্ত মানে প্রান্তহীন আর এক হাবিয়া।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, 'জান, এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল, এইমাত্র তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌছলো।' অতএব, চিন্তা কর, জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যকার ব্যবধান কত যে বিপুল। প্রতিটি স্তর যেমন বিশালায়তন, তেমনি তাদের দূরত্বও অনেক বিপুল। মানুষের দুনিয়ার দিকে ঝোঁক-প্রবণতায় যেমন ব্যবধান আছে, কেউ তো এত বেশী দুনিয়ামগ্ন যেন সে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে আছে, কেউ তাতে আরও কম প্রবেশে করেছে ইত্যাদি—সেই অনুপাতেই তারা জাহান্নামের আগুনে ডুবে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ পাক কারুর উপর তিলমাত্রও যুলুম করবেন না। তাই, সব জাহান্নামীর আযাব সমান হবে না। বরং প্রত্যেকের আযাব তার অপরাধেরই অনুপাতে হবে। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হাল্‌কা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তাকে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক করে দেওয়া হতো—তাহলে সেই সবকিছু দিয়েও সে ঐ আযাব হতে নাজাতের চেষ্টা করত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামে সর্বাধিক

লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক জোড়া আগুনের পাদুকা পরানো হবে যদ্দরুণ তার মস্তক ফুটতে থাকবে।' সর্বাধিক লঘু শাস্তির হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এ লঘুই যদি এত কঠিন হয় তবে কঠিনের অবস্থা কি। তোমার একটা আঙ্গুল আগুনের নিকটবর্তী করে তা কিছুটা অনুমান কর। কিন্তু, তোমার অনুমানে অবশ্যই তুমি ভুল করবে। কারণ, জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের কোন তুলনাই চলে না। তবু, যেহেতু দুনিয়াতে এই আগুনের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তি, সেজন্য জাহান্নামের আগুনকেও দুনিয়ার আগুনের উপমা দিয়েই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু, হায়! জাহান্নামীরা যদি সেখানে দুনিয়ার আগুন দেখতো তবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আনন্দ-উল্লাসে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো।

এজন্যই কোন-কোন হাদীসে এসেছে যে, দুনিয়াতে প্রেরিত এ আগুনকে রহমতের সত্তর কিসিম পানির দ্বারা ধৌত করা হয়েছিল, যাতে করে দুনিয়াবাসীরা তা বরদাশত করতে পারে। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে জাহান্নামকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। ফলে তা একদম লাল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আবার এক হাজার বৎসর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর একদা শ্বেতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরও এক হাজার বৎসর ধরে প্রজ্জ্বলনের পর তা একদম কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নাম আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করেছিল যে, হে মা'বুদ, আমার এক অংশকে আর এক অংশ খেয়ে ফেলছে। এতে আল্লাহ্ পাক তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন ; একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা গরমের দিনে যে প্রচণ্ড তাপ অনুভব কর তা ঐ নিঃশ্বাসের তাপ, আর শীতকালে যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তাও ঐ জাহান্নামের প্রচণ্ড শীতল অংশের শীত প্রবাহ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ কাফেরকে হাযির করা হবে। হুকুম হবে ঃ ওকে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনো। চুবানির পর তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনো সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, না, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ–কষ্টপ্রাপ্ত একজন মু'মিনকে আনা হবে। হুকুম হবে, তাকেও একটা চুবানি দিয়ে নিয়ে আস। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, জ্বী–না, দেখি নাই।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর যদি এক লক্ষ বা লক্ষাধিক লোক থাকে এবং এক জাহান্নামী এসে তাদের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

পবিত্র কুরআনে যে বলা হয়েছে ঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

কোন কোন আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারায় একটিমাত্র থাবা মারবে এবং সেই একটিমাত্র লেলিহান শিখাতেই তাদের সমস্ত দেহ থেকে মাংসগুলো খসে পায়ের গোড়ালির কাছে থুবড়ে পড়বে। আরও চিন্তা কর, জাহান্নামীদের দেহ থেকে প্রবাহিত পুঁজ রক্তের কি বীভৎস দুর্গন্ধ হবে; অথচ,জাহান্নামীরা সে পুঁজের মধ্যে ডুবে যাবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী সেই দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। জাহান্নামীরা যখন পিপাসার দহনে ছটফট করতে থাকবে এবং পানির জন্য ফরিয়াদ জানাবে তখন এই পুঁজই তাদেরকে পানি হিসাবে পান করতে দেওয়া হবে। তারা ডগডগ করে তা গলধঃকরণ করতে থাকবে, কিন্তু, তা গলা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাবে। এভাবে চতুর্দিক থেকে মৃত্যু যেন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। কিন্তু, সেখানে যে কারো মৃত্যু নাই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○

'তারা যদি (পিপাসার জ্বালায়) আর্তনাদ করে তবে তেলের গাদের মত

পানি দ্বারা তাদের জবাব দেওয়া হবে ; যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতীত বিশ্রী সে পানীয় এবং কি জঘন্য সেই আবাস!'

(কাহ্ফ ঃ ২৯)

তারপর দোযখীদের 'যাক্কুম' নামক খাদ্যের কথাও স্মরণ কর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۝

'হে পথ ও মতিভ্রষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা, পরন্তু 'যাক্কুম' বৃক্ষ হতে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা দিয়েই তোমরা উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, গরম পানি পান করবে। আর তা পান করবে পিপাসাকাতর উষ্ট্রের মত।' (ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৫১-৫৫)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ۝

'তা (যাক্কুম) হচ্ছে একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামের মূল থেকে উৎপন্ন হবে। সে বৃক্ষটির মাথাটা হবে সর্পরাজির মস্তকসমূহ সদৃশ। ওরা ঐ বৃক্ষ হতে খাদ্য গ্রহণ করবে, এমনকি, তা দিয়ে উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, পুঁজমিশ্রিত ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হবে।' (সাফ্ফাত ঃ ৬৪-৬৮)

আরও বলেছেন ঃ

تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۝

'(একদল মানুষ) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে ; তাদেরকে ফুটন্ত গরম ঝর্ণার পানি পান করানো হবে।' (গাশিয়াহ্ ঃ ৪,৫)

একস্থানে বলেছেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيمًا ۝ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا ۝

'আমাদের নিকট রয়েছে (আগুনের) শিকলসমূহ, জ্বলন্ত জাহীম, এমন সব খাদ্য যা গলায় আটকে পড়বে এবং বহু যন্ত্রণাপদ শাস্তি।'

(মুয্যাম্মিল ঃ ১২, ১৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাক্কূমের একটি বিন্দুও যদি দুনিয়ার সমুদ্রমালায় পতিত হতো, তাহলে তা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জীবনধারাকে বিপন্ন করে দিতো।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই জিনিসের আরজু-আগ্রহ কর যে জিনিসের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এবং যে জিনিসের ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন সেই আযাব গযব ও জাহান্নামকে ভয় কর। কারণ, তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের একটি মাত্র বিন্দু ও যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতো, তবে ঐ একটি বিন্দু তোমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি ও আনন্দময় করে দিত। পক্ষান্তরে, দোযখের একটিমাত্র ফোঁটাও যদি এ দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে থাকতো তবে ঐ একটি ফোঁটাই সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে খবীস-গলীয ও নোংরা করে ফেলতো।

হযরত আবু দার্দা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদেরকে এমনি কঠিনতর ক্ষুধার যন্ত্রণাক্লিষ্ট করা হবে যা তাদের সমস্ত আযাবের বরাবর হয়ে যাবে। ফলে, তারা খাবারের জন্য চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে তাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হবে যা তাদের গলার ভিতর আটকে যাবে। হঠাৎ তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে আমরা পানীয় বস্তু দ্বারা গলায় আটকানো খাদ্য অপসারণ করতাম। অমনি তারা কোন পানীয়ের জন্য চিৎকার করবে। ফলে, টাটকা গরম পানি তাদের

মুখের কাছে তুলে ধরা হবে, লৌহ-শলাকা দ্বারা। ঐ পানি তাদের মুখের কাছে যেতেই সম্পূর্ণ চেহারাটাকে ঝলসিয়ে দিবে। ঐ পানি পেটের মধ্যে ঢুকতেই আঁত ইত্যাদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। তখন পরস্পর বলাবলি করবে, চল, জাহান্নামের মুহাফিয ফেরেশ্তাদের কাছে ফরিয়াদ করি। অতঃপর ফরিয়াদ জানিয়ে বলবে, তোমাদের মা'বুদকে ডেকে বল, তিনি যেন অন্ততঃ একদিনের জন্য আযাবকে আমাদের প্রতি হাল্কা করে দেন। জবাবে ফেরেশ্তাগণ বলবে ঃ

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا
فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ۝

'কেন, তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রাসূলগণ প্রমাণাদি সহকারে আগমন করেছিলেন না? তারা বলবে ঃ তা অবশ্যই। ফেরেশ্তাগণ বলবে ঃ তাহলে চিৎকার পাড়তে থাক ; কাফের গোষ্ঠীর অনর্থক চিৎকারে কিছু যায় আসে না।' (গাফির ঃ ৫০)

জাহান্নামীরা বলবে, চল, মালেক ফেরেশ্তাকে ডেকে দেখি। অতঃপর মালেককে ডেকে বলবে ঃ হে মালেক! তোমার মা'বুদকে বল, তিনি যেন আমাদেরকে ধ্বংসই করে দেন! মালেক বলবেন ঃ তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই অবস্থান করতে হবে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে একটি হাদীস পৌছেছে যে, তাদের ফরিয়াদ ও মালেকের উক্ত জবাবের মাঝখানে এক হাজার বৎসর পেরিয়ে যাবে। হুযুর বলেন, অতঃপর জাহান্নামীরা পরস্পর বলবে ঃ সবাই নিজেদের আল্লাহ্কে ডাক, কারণ, আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম আর কেউ নাই। তখন আল্লাহ্কে ডেকে বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দোষেই দুর্ভাগ্য আমাদের উপর

প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন। এরপরও যদি আমরা আবার অন্যায় করি তবে নিশ্চয়ই আমরা যালিম সাব্যস্ত হবো।' (মু'মিনূন ঃ ১০৭)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

'এই জাহান্নামের ভিতরেই লাঞ্ছিত হতে থাক ; আমার সাথে কথা বলবে না।' (মু'মিনূন ঃ ১০৮)

এতে তারা সর্বদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে হায় আক্ষেপ, হায় ধ্বংস বলে বুক ফাটা চিৎকার শুরু করবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ۙ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

'তাদেরকে পানিস্বরূপ পুঁজ পান করানো হবে, ডগডগ গিলতে শুরু করবে, গলার নীচে পার করার উপায় হবে না।' (ইব্রাহীম ঃ ১৬, ১৭)

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ পুঁজ নিকটে নেওয়া হবে, তখন তার ঘৃণা লাগবে। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে, ফলে, মাথার খুলির উপর থেকে চামড়াটা খসে পড়ে যাবে। পান করার সঙ্গে সঙ্গে আঁতগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ ○

'ওদেরকে টাটকা গরম পানি পান করানো হবে, ফলে, ঐ পানি তাদের আঁতসমূহকে কেটে টুক্রা টুক্রা করে দিবে।' (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

এই হলো জাহান্নামীদের খাদ্য-খাবার ও যন্ত্রণাকাতর পিপাসিতের পানীয় পানি।

এবার জাহান্নামের বিশালকায় সাপ-বিচ্ছুর বিষম বিষাক্ত দংশনের

হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলোও দেখে নাও। এ সাপ-বিচ্ছুকে তাদের উপর নিযুক্ত করা হবে, ওরা তাদের শরীরে অবিরতভাবে দংশন করতে থাকবে, কামড়ের চোটে মাংস ও চামড়াকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। এতে এক মুহূর্তেরও বিরতি নাই।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক মাল দিয়েছেন কিন্তু, সে মালের যাকাত আদায় করে নাই, ঐ মালকে বিষাক্ত সর্পে পরিণত করে তার গর্দানের জিঞ্জির বানিয়ে দিবেন। ঐ সর্প তার চোয়ালে জড়িয়ে ধরে তাকে দংশন করবে আর বলবে ঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ-ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর বুখতী উষ্ট্রের দীর্ঘ গর্দানের মত অসংখ্য সাপ থাকবে। ঐ সাপ মাত্র একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিষ-জ্বালা অনুভব হতে থাকবে। এবং খচ্চরের মত বিরাট বিরাট বিচ্ছু থাকবে যা একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর যাবত দংশন-জ্বালা অনুভব হবে। এই সাপ-বিচ্ছু ঐ সকল লোকদের উপর নিয়োজিত হবে যারা দুনিয়াতে বখীল (কৃপণ) ছিল, দুশ্চরিত্র ছিল এবং যারা মানুষকে কষ্ট দিত। যারা এসব অপরাধে অপরাধী ছিল, তারাই এ আযাব ভুগবে, আর যারা এসব অপরাধ করে নাই, এসকল সর্পের দংশন থেকে তারা নিরাপদ থাকবে।

এখন তুমি জাহান্নামীদের বিশালায়তন দেহের কথা চিন্তা কর। আল্লাহ্ পাক তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদায়তন করে দিবেন যাতে ঐ বিশাল দেহের প্রতিটি অংশ একই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনে জর্জরিত হতে থাকে। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফেরের মাঢ়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত এবং শরীরের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ মোটা। তিনি আরও বলেছেন ঃ কাফেরের নীচের ঠোঁট তার বুকের উপর ঝুলবে, আর উপরের ঠোঁট উপরের দিকে কুঞ্চিত হয়ে চেহারাকে

ঢেকে ফেলবে। অন্যত্র বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের জিহ্বাকে টেনে দীর্ঘ করা হবে এবং লোকেরা সেই জিহ্বাকে দু'পায়ে দলে চলবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যখনি তাদের চামড়া জ্বলে–পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে তখন আমরা সে–স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেবো।' (নিসা ঃ ৫৬) জাহান্নাম তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার দগ্ধীভূত করবে। এক–একবার দগ্ধীভূত হওয়ার পর হুকুম হবে ঃ আবার আগের মত হয়ে যাও তখন আগের মত হয়ে যাবে।

এখন জাহান্নামীদের চিৎকার ও ক্রন্দনের কথা শোন। আহা, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের নিদারুন চিৎকার ও কান্না শুরু হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে (হাশর মাঠের দিকে) আনা হবে। জাহান্নামের দেহে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা থাকবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তাও সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কান্না ও চিৎকারের অনুমতি প্রাপ্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তবুও এক রকম স্বস্তি থাকবে। অবশেষে তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ বিন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামীরা পাঁচবার আল্লাহ্কে ডাকবে, তন্মধ্যে চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চম বারের পর আর কখনও তাদের সাথে কথা বলবেন না। তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ٥

হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি–ই তো আমাদেরকে দুই–দুইবার মৃত্যু দান করেছেন এবং দুই–দুইবার জীবন দান করেছেন ঃ তবে কি আমাদের

মুক্তির কোনও পথ আছে? (গাফির : ১১)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন :

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ○

'তোমাদের এই দশা এই জন্য যে, এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো, তোমরা তা প্রত্যাখান করতে এবং তার সাথে শরীক করা হলে আস্থা-বিশ্বাস ভরে তা গ্রহণ করতে। ফলে, সেই আল্লাহ্র ফয়সালাই হবে কার্যকর, যিনি প্রতাপশালী এবং চির মহীয়ান।' (গাফির : ১২)

অতঃপর তারা বলবে : 'হে পরোয়াদেগার, আমরা স্বচক্ষে দেখলাম এবং স্বকর্ণে শুনলাম। তাই, আপনি আমাদের পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান, আমরা সৎকর্মই করবো।' জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন :

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ○

'ইতিপূর্বে তোমরাই কি কসম করে বলতে-না যে, তোমাদের নাকি কোন লয়-ক্ষয় নাই?' (ইব্রাহীম : ৪৪)

ওরা বলবে, হে রব্ব্, আমাদের মুক্তি দিন ; অতীতে যা করেছি তা আর হবে না, এখন শুধু সৎকর্মই করবো।'

আল্লাহ্ পাক বলবেন :

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط

'আমি কি তোমাদের এতটুকু পরিমাণ বয়স দিয়েছিলাম না, যাতে যেকোন উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণের যথেষ্ট অবকাশ ছিল? পরন্তু, তোমাদের কাছে সতর্ককারীরও তো আগমন ঘটেছিল।' (ফাতির : ৩৭)

অতঃপর তারা বলবে, হে রব্ব্, আমরা নিজেরাই নিজেদের কপাল মন্দ করেছি, বস্তুতঃই আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের মুক্তি দিন। আবারও যদি সে-নিষিদ্ধ পথে যাই, তাহলে আমরা যালিম বলে প্রতিপন্ন হবো।'

এইবার আল্লাহ্ পাক জবাব দিবেন ঃ

اِخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝

'এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক। এবং আমার সাথে আর কথা বলো না।' (মুমিনূন ঃ ১০৮)

এরপর আর কোনদিন তারা আল্লাহ্র সাথে কথা বলতে পারবে না। হায়! কি কঠিন সে-আযাব!

পবিত্র কুরআনে যে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

'আমাদের ছটফটে চিৎকার ও ধৈর্যধারণ ; সবই বরাবর ; আমাদের যে কোনও পরিত্রাণ নাই।' (ইব্রাহীম ঃ ২১)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, হযরত যায়দ ইব্নে আসলাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ওরা একশত বৎসর ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর একশত বৎসর ছটফট ও চিৎকার করতে থাকবে, আবার একশত বৎসর যাবত ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর বলবে ঃ 'আমাদের ছটফট করা ও ছবর করা সবই বরাবর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি সুদর্শন ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে হত্যা করা হবে। এবং বলা হবে, হে বেহেশ্তবাসীরা চির জীবনের পয়গাম লও, আর কোন মৃত্যু নাই ; হে জাহান্নামীরা, চির জীবনের সংবাদ শোন, আর কোনও মৃত্যু নাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। তিনি বলতেন, হায়, সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম। একবার হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে এক কোণায় বসে ক্রন্দনরত দেখা গেলো। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, না-জানি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় কিনা। এবং আল্লাহ্র জন্য তা খুবই সামান্য ব্যাপার।

এ হচ্ছে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। বস্তুতঃ

তাদের ব্যাপক দুঃখ-বেদনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আক্ষেপ-অনুতাপের তো কোন সীমা নাই। কঠিন যন্ত্রণাপদ শাস্তির সাথে সাথে আরও যেসব কঠিনতর মানসিক শাস্তি তারা ভুগবে, তা হলো ঃ বেহেশ্‌তী সুখ ও নে'আমতের বঞ্চনা, আল্লাহ্‌র দীদারের বঞ্চনা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বঞ্চনা। এই অনুভূতি তাদের মর্মপীড়াকে আরো বৃদ্ধি করবে যে, তারা এ অমূল্য নে'আমত হারিয়েছে সামান্য ক'টা কানাকড়ি তথা ক্ষণকালীন জাগতিক স্বার্থে। সামান্য ক'দিনের ঘৃণ্য ভোগ-বিলাস ও অস্বচ্ছ সুখের বিনিময়ে আজ এই দুর্গতি! এই বঞ্চনা! মনে মনে আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে যে, হায়, কেন আমরা আপন পালনকর্তার আনুগত্য ছিন্ন করে মূলতঃ নিজেদেরকে ধ্বংস করলাম। কেন আমরা সামান্য ক'টা দিন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না! আহা, যদি তা করতাম, তাহলে শেষ হয়ে যাওয়া সেই দিনগুলো তো শেষ হয়েই যেত ; কিন্তু, আজ আমরা পরোয়ারদেগারের পরম সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত এবং পুরস্কৃত হতাম।

বন্ধুগণ, ওদের অনুতাপের খবর যদি তোমাদের পথ দেখায়। হায় কি বঞ্চনা! কি করুণ দুর্গতি ও ভোগান্তি। জাগতিক কোন সুখ বা সুখের উপকরণ তো রইল না। পরন্তু, বেহেশ্‌তী নে'আমতরাজি না দেখতে পেলেও তো মর্মজ্বালা এত বাড়তো না। বেহেশ্‌তের নে'আমতসমূহ তাদেরকে দেখিয়ে নেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত দিবসে কতিপয় মানুষকে দোযখের দিক হতে বেহেশ্‌তের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী হবে, বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ শুঁকতে লাগবে, বেহেশ্‌তের সু-উচ্চ প্রাসাদমালা ও বেহেশ্‌তীদের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক আয়োজিত তাবৎ নে'আমতসমূহের দিকে চোখ ধরবে, এমন সময় হুকুম আসবে, হে ফেরেশ্‌তারা, এখান হতে ওদের হটাও ; এ ওদের নসীবে নাই। ফলে, অবর্ণনীয় আক্ষেপ-পীড়িত মনে ওরা ফিরে যাবে। এবং বলবে, আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার প্রিয় বান্দাগণকে কত-কি নে'আমত ও পুরস্কারাদি দান করলেন, তা দেখানোর আগেই যদি আমাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দিতেন, তাহলে জাহান্নাম আমাদের পক্ষে আরও সহজ হতো। জবাবে আল্লাহ্‌ পাক বলবেন ঃ আমি যে তা দেখালাম, এ উদ্দেশেই তো দেখালাম।

তোমরা নির্জনতায় ভয়ংকর পাপরাশিতে লিপ্ত হয়ে যেন দস্তুরমত আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে, আবার জন-কোলাহলে নিজেকে 'খোদার ধ্যানে মগ্ন' বলে প্রকাশ করতে অথচ, তা ছিল আমার সাথে তোমাদের অন্তরের হালতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা লোকের ভয় করলে ; কিন্তু, আমাকে ভয় করলে না ; মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-সমীহ প্রদর্শন করলে কিন্তু, আমার বেলায় তা করলে না। মানুষের কত কিছু বর্জন করলে, কিন্তু, আমার জন্য বুঝি বর্জন করা গেলো না। তাই, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি তোমাদের জন্য হারাম করেই দিয়েছি, সেই সাথে এই মর্মন্তুদ শাস্তিও তোমাদের চাখাচ্ছি।

হযরত আহমদ বিন হারব্ (রহঃ) বলেন, আফসোস, আমাদের প্রত্যেকেই সূর্যতাপের উপর ছায়াকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু, জাহান্নামের উপর জান্নাতকে প্রাধান্য দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হায়, কত-না সুস্থ-সবল দেহ, সুন্দর-সুদর্শন চেহারা এবং কত-না বাগ্মী ও ললিত কণ্ঠধারী জাহান্নামের অতলে পড়ে বিলাপ ও চিৎকার করছে।

হযরত দাউদ (আঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্, আপনার সূর্যের তাপই আমি সইতে পারি না, তবে কিরূপে আমি জাহান্নামের অগ্নিতাপ সহ্য করবো! আপনার রহমতের (বারিধর মেঘের) গর্জনই আমি সইতে পারি না ; তাহলে কিভাবে আমি আযাবের গর্জন সহ্য করবো!

হে মিসকীন মানুষ, এ'বড় ভয়ংকর বিপদসমূহের কথা ভেবে দেখ। জেনে রাখ, আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম ও তার সমূহ ভয়ংকরতা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিলমাত্র বেশীকম হবে না। তাই, এটা স্থিরীকৃত চূড়ান্ত বিষয়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

'তাদেরকে 'পরিতাপ দিবসের' ভীতি প্রদর্শন কর, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। অথচ, তারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে এবং ঈমান গ্রহণ

করছে না।' (মারইয়াম ঃ ৩৯)

আমি কসম করে বলছি, যদিও এতে 'ক্বিয়ামত দিবসে ফয়সালা হবে' বলে বলা হয়েছে, কিন্তু, আসলে তা অনাদিতেই চূড়ান্তকৃত সিদ্ধান্ত, যা ক্বিয়ামত দিবসে প্রকাশিত হবে। উফ, কি আশ্চর্য! তবু তুমি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছ, তুচ্ছ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ। অথচ, তোমার জানা নাই যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আছে। তুমি যদি জানতে চাও যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তোমার কি পরিণাম হবে তাহলে তোমাকে একটা আলামত বলে দিচ্ছি যা দ্বারা তুমি একটা 'মোটামুটি ধারণা' করতে পার এবং তোমার 'আশার বাস্তবতা' যাচাই করে দেখতে পার। তা হলো, তুমি তোমার জীবনধারা, তোমার কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। কারণ, প্রত্যেকেই যে-লক্ষ্যের জন্য সৃষ্ট, সে-লক্ষ্যের সহায়ক তওফীকও সে প্রাপ্ত হয়। তাই, যদি নিজেকে সৎকর্মসমূহে লিপ্ত এবং তওফীকপ্রাপ্ত দেখতে পাও, তাহলে তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। অবশ্যই তুমি জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন। আর যদি তোমার অবস্থা এমন হয় যে, যেকোন ভাল কাজে অগ্রসর হলে হাজার বাধা তোমাকে ঘিরে ধরে এবং তোমাকে শক্তভাবে প্রতিহত করে ; আবার কোন অন্যায়ের ইচ্ছা করলে তার সহায়ক তামাম উপকরণ সহজলভ্য হয়ে যায়, তাহলে তুমি ধরে নিতে পার যে, তোমার পরিণতি ভাল নয় ; কারণ, মানুষের কার্য-কলাপ তার পরিণামের ইঙ্গিতবাহক, যেভাবে বৃষ্টিপাত ভাল ফলনের এবং ধোঁয়া আগুনের ইঙ্গিতবাহক।

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তো বলেছেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

'সৎকর্মশীলগণ হবে জান্নাতবাসী আর অপকর্মকারীরা হবে জাহান্নাম-বাসী।' (ইনফিতার ঃ ১৩, ১৪)

অতএব, তুমি নিজেকে এ আয়াতের সম্মুখে ধর, তোমার অবস্থান নির্ণয়ের দ্বারা শেষ গন্তব্যও নির্ণীত হয়ে যাবে। তবে হাঁ, প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত।

অধ্যায় ঃ ৪০

বন্দেগীর মর্তবা, আনুগত্যের মর্যাদা

হে স্নেহাস্পদ, তুমি বিশ্বাস কর, সকল সুখের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্য। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবে বারংবার আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং সেই একই উদ্দেশ্যে তিনি নবী–রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা মানব–সম্প্রদায়কে সর্বরকম পঙ্কিলতার সমূহ অন্ধকার হতে মুক্ত করে 'কুদ্‌সী মা'রিফাত' তথা আল্লাহ্‌র পরিচয় ও তাঁর প্রেম–বন্ধনের নূর ও আলোর দিকে নিয়ে যান ; যাতে তারা 'চির শান্তির জাহান' বেহেশ্‌তে মুত্তাকীদের জন্য তৈয়ার করে রাখা ঐ সকল নে'আমতের অধিকারী হতে পারে যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, কোনদিন কানে শুনে নাই, এমনকি কারো মনে যার কল্পনাও কোনদিন জাগে নাই। সত্যি, আল্লাহ্ তো মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নাই। বরং তিনি এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন যে, অন্যায়কারীদের তিনি সমুচিত জবাব দিবেন এবং সৎকর্মশীলদের শান্তিময় পুরস্কার দান করবেন। যদিও তিনি কারো আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন এবং কারো অবাধ্যতাও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, কিংবা তার মহত্ত্বে ও বড়ত্বেও কোনরূপ আঘাত হানে না। মাটির মানুষ দম্ভ–অহংকারে তার আনুগত্য ছিন্ন করলে তাতে তার কিছু যায়–আসে না ; স্বয়ং নূরের ফেরেশ্‌তারাই তো দিবারাত অব্যাহতভাবে তার তাস্‌বীহ্ ও গুণগানে রত। তাই, যে ভালো করবে, তাতে তার নিজের লাভ, আর যে খারাপ করবে তাতে আপনার ক্ষতি বৈ–কি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো বে–নিয়ায, লা–মোহ্‌তাজ, আর তোমরা সবাই ভিখারী, তার মোহ্‌তাজ।

কি আশ্চর্য! আমরা যদি একটা গোলাম খরিদ করি, তাহলে আমরা চাই যে, গোলাম যেন তার তামাম খিদমত ও দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়, সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী কানাকড়ির বিনিময়ে তাকে খরিদকারী মনিবের প্রতি যেন সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। আবার মনিবও এক–একটি পদস্খলনের জন্যও তার উপর ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করে। কখনও তার ভাতা কিংবা

দানা–পানিও বন্ধ করে দেয়া হয় অথবা তাকে বিতাড়িত কিংবা বিক্রয়ই করে ফেলে। তাহলে, কি কারণে আমরা আমাদের আসল মনিবের আনুগত্য করি না– যিনি আমাদের এত সুন্দর গড়নে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পদস্খলন অজস্র বারিধারার বিন্দুমালার চেয়েও অনেক বেশী। তবু তিনি আমাদের প্রতি তার সেই নে'আমত ও অনুগ্রহসমূহ বন্ধ করেন নাই যা না–হলে আমাদের ধ্বংসই ছিল অনিবার্য। অথচ, একটিমাত্র অপরাধের জন্যেও তো তিনি আমাদের শক্তভাবে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না, বরং আমাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে আমরা তওবা করতে পারি ; ফলে, তিনিও আমাদেরকে ক্ষমাদান ও পাপরাশি গোপন করতঃ আমাদের তার কাছে টানতে পারেন। আসলে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই বুঝতে পারে যে, কে তার আনুগত্য পাওয়ার আসল ও উপযুক্ত অধিকারী। তাই, সে তার দিকে রোখ করে এবং জীবনের বাগডোর সম্পূর্ণ তার হাতে তুলে দেয়। কখনও কোন অন্যায় হয়ে গেলেও তওবা করে আপন স্রষ্টার দিকে রুজু হয়। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে আল্লাহ্‌র সমূহ নে'আমতের শোকর ও আনুগত্যের মাধ্যমে 'তার প্রিয়পাত্র' হতে অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, থেমে যায় না। কারণ, তার বুকভরা আশা যে, হয়তঃ সে–ও আশেকীনদের একজন হিসাবে গৃহীত হবে। সত্যি, একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে—যখন সে তার মাওলার জন্য পাগলপারা এবং মাওলাও তার জন্য তদপেক্ষা অধিক দেওয়ানা।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হযরত কা'ব আহ্‌বার (রাযিঃ)–কে বলেছিলেন যে, তাউরাতের কোন আয়াত শুনান না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ নেক্‌কাররা আমাকে দেখার জন্য পাগলপারা। আর আমি ওদের সাথে মিলনের জন্য ওদের চেয়ে অধিকতর পাগলপারা। এ আয়াতের পার্শ্ববর্তী এক আয়াতে আছে ঃ যে আমাকে তালাশ করে, সে আমাকে পায়। যে আমি ব্যতীত আর কাউকে তালাশ করে, সে তো আমাকে পেতে পারে না। তাউরাতের এ আয়াত শ্রবণ শেষে হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলতে লাগলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুবহু এই কথাগুলো আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র মুখে শুনেছি।

হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত দাঊদ

(আঃ)–কে বললেন ঃ হে দাউদ! যমীনবাসীদের এ খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, যে আমাকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি, যে আমার সাথে বসে, আমিও তার সাথে বসি, যে আমাকে স্মরণ করে আনন্দ পায়, আমিও তাকে স্মরণ করে আনন্দ পাই ; যে আমাকে সঙ্গী করে, আমিও তাকে আমার সঙ্গী করি ; যে আমাকে পছন্দ করে, আমিও তাকে পছন্দ করি ; যে আমার আনুগত্য করে, আমিও তার আনুগত্য করি। আমি যদি দেখতে পাই যে, অমুক বান্দা সত্যিকার অর্থেই প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবাসে, সে–ভালবাসা আমি গ্রহণ করি। এবং আমি তাকে এত বেশী মহব্বত করি যে, জগতে আর কেউই তার সমকক্ষ থাকে না। যে প্রকৃতঃই আমাকে খোঁজে, তার তো আমাকে পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব, হে যমীনবাসী অহংকার ও অহমিকার জাল ছিন্ন করে আমার দেওয়া সম্মান, আমার বন্ধুত্ব ও আমার সাথে বৈঠকের সাথীত্ব গ্রহণ কর ; আমার সঙ্গে প্রেম কর ; আমিও তোমাদের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং আবদ্ধ করবো। কারণ, আমি আমার প্রিয়দের সৃষ্টি করেছি সেই মাটি দিয়ে যে–মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আমার খলীল ইব্‌রাহীমকে, মূসা কালীমুল্লাহ্‌কে, বাছাইকৃত পরম বন্ধু মুহাম্মদকে ; সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমার প্রেমিকদের হৃদয় সৃষ্টি করেছি আমার খাস নূর দিয়ে এবং সে–হৃদয়সমূহকে সমৃদ্ধ করেছি আমার জালাল, প্রতাপ ও গরমি দিয়ে।

জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক তার কোন সিদ্দীকীন মর্তবার ওলীকে ইল্‌হামযোগে অবহিত করেছিলেন যে, আমার একদল বান্দা আছে যারা আমাকে চায় এবং আমিও তাদেরকে চাই ; তারা আমার জন্য প্রেমবিহ্বল, আমিও তাদের জন্য প্রেমবিহ্বল ; তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি ; তাদের চক্ষু আমাকে খোঁজে, আমার চক্ষু তাদেরকে খোঁজে। তুমি যদি তাদের পথ ধর, তাহলে তুমিও আমার ভালবাসা পাবে ; আর যদি তাদের পথ এড়িয়ে চল তাহলে আমার রোষানলে পতিত হবে। উক্ত ওলী বললেন, আমার রব্ব্, তাদের আলামত কি? আল্লাহ্ পাক বললেন, তারা দিনের বেলা ছায়াঘেরা স্থান খুঁজে ফিরে, যেভাবে কোন দয়ালু রাখাল তার ছাগপালের দিকে সযত্ন নজর রাখে ; অধীর আগ্রহে সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থাকে, যেভাবে পাখীরা আপন–আপন বাসায় গমনের

জন্য সূর্যাস্তের সাথে সাথে ব্যাকুল হয়ে ছুটে। যখন রাত নামে, চারদিক অন্ধকারে ডুবে যায়, সকলে যার যার খাটের উপর আরামের বিছানা পাতে এবং প্রিয়-প্রিয়তমারা একান্ত নির্জনতায় মিলিত হয়, তারা তখন আপন পদযুগলের উপর দাঁড়িয়ে যায়, আমার সম্মুখে চেহারা ও মস্তক বিছিয়ে দেয়, আমাকে আমার 'কালাম' পড়ে শোনায়, আমার প্রদত্ত নে'আমতের কথা প্রেমের ভঙ্গিতে স্বীকার করে। ওদের কি এক নিদারুণ হালত হয়, কারো অশ্রু ঝরতে থাকে, কেউ চিৎকার করতে থাকে, কারো বুক চিরে আহ্ আহ্ ধ্বনিত হতে থাকে, কারো মুখ হতে অভিমান ভরে অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ রুকু'তে, কেউ সিজদাতে। আমি দেখতে থাকি যে, আমার পাগলেরা আমার জন্য কত কষ্ট করছে, আমার মহব্বতে কত-কি ফরিয়াদ ও বেদনা প্রকাশ করছে। ওদেরকে আমি সর্বপ্রথম তিনটি পুরস্কার দান করি ঃ আমার নূরের একটা অংশ তাদের অন্তরে ঢেলে দিই ; ফলে, তারা সেই নূরের তারে আমার খোঁজ-খবর পায় যেভাবে আমিও তাদের খোঁজ-খবর পাই। দুই, সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন ও তার মধ্যকার সবকিছুকেও যদি ওদের মীযানে তুলে দেওয়া হয়, 'ওদের' সম্মুখে ঐ সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ লাগে। তিন, সর্বদা আমি ওদের প্রতি দৃষ্টিমান থাকি। তাহলে, শুধু তুমি কেন, প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, যার প্রতি স্বয়ং মাওলা সর্বদা দৃষ্টিমান থাকে তাকে তিনি কি পুরস্কার দান করবেন।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কিত এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ পাক তাকে বলেছেন ঃ হে দাউদ! আমার প্রেমপাগল বান্দাদের বলে দাও যে, যদিও আমি বিশ্ব-মাখলুকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে আছি, কিন্তু ; আমার ও তোমাদের মাঝখান থেকে তো পর্দা সরিয়ে দিয়েছি—যাতে তোমরা হৃদয়ের চোখ দিয়ে আপন মাওলাকে দেখতে পার—বল, এরপরও কি তোমাদের কোন মুশ্কিল? আমি দুনিয়াকে তোমাদের থেকে ছিন্ন করেছি ; কিন্তু, উদার হস্তে তোমাদেরকে আমি দ্বীন দিয়েছি। বল, এরপরও তোমাদের ক্ষতির কিছু আছে? বল, আমার সন্তুষ্টি যখন তোমাদের অন্বেষা, তাহলে, তামাম মাখলুকের অসন্তোষেও কি তোমাদের কোন ক্ষতি হবে?

অধ্যায় ঃ ৪১

শোকর ঃ কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ্ পাক শোকরকে যিকিরের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

'তোমরা আমার যিকির কর, তবে আমিও তোমাদের যিকির করবো ; এবং আমার শোকর কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।' (বাকারাহ্ ঃ ১৫২)

অথচ, তিনি যিকিরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন ঃ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط

'নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্র যিকিরই সবচেয়ে বড়।' (আনকাবুত ঃ ৪৫)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ط

'আল্লাহ্র তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কি দরকার (?) যদি তোমরা শোকর কর এবং তাকে বিশ্বাস কর।' (নিসা ঃ ১৪৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

'অবশ্য আমার শোকর-গুযার ও কৃতজ্ঞদের আমি 'বিনিময়' দান করবো।' (আলি-ইমরান ঃ ১৪৫)

অভিশপ্ত ইবলীস্ আল্লাহ্কে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

'আমি তাদের (মানবজাতির) সরলপথে ওঁৎ পেতে বসবো।'

(আ'রাফ ঃ ১৬)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এই 'সরলপথ' মানে 'শোকরের পথ'। অভিশপ্ত ইবলীস বলেছে ঃ হে আল্লাহ্, আপনার অধিকাংশ বান্দাকেই আপনি শোকর-গুযার পাবেন না।' (আ'রাফ ঃ ১৭)

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকও বলেছেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুযারের সংখ্যা নগণ্য।' (সাবা ঃ১৩)

আবার তিনি শোকরের ক্ষেত্রে 'নে'আমত বর্ধনের' নিশ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে অতি অবশ্যই আরো বেশী দান করবো।' (ইব্রাহীম ঃ ৭)

কিন্তু, পাঁচটি ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি বস্তু প্রদানকে নিশ্চিত না করে বরং শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। তা-হলো, দৌলত প্রদান, বিপদাপন্ন হালতে দো'আ শ্রবণ, রিযিক, গুণাহ্-ক্ষমা ও তওবা কবুল করা। তিনি বলেছেন ঃ

এক

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط

দুই

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ

তিন

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

চার

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج

পাঁচ

وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط

এক. আল্লাহ্ পাক অবিলম্বে তোমাদেরকে ধনবান করে দিবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। (তওবাহ্ অ ২৮)

দুই. তোমরা যে-সংকট হতে উদ্ধারের জন্য তাকে ডাকছো, তিনি তা দূরীভূত করে দিবেন, যদি তার ইচ্ছা হয়। (আনআম ঃ ৪১)

তিন. আল্লাহ্ পাক 'যাকে ইচ্ছা' বে-হিসাব রিযিক দান করেন। (বাকারাহ্ ঃ ২১২)

চার. তিনি তা (শির্ক) ব্যতীত আর সব রকম গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন, যার জন্য তার সে-অভিপ্রায় হয়। (নিসা ঃ ৪৮/১১৬)

পাঁচ.আল্লাহ্ পাক 'যার জন্য ইচ্ছা হয়' তার তওবা কবূল করেন। (তওবাহ্ ঃ ১৫)

পরন্তু, শোকর ও কৃতজ্ঞতা রব্বুল-আলামীনের রব্ব্-সুলভ একটি চরিত্রগুণও বটে। তিনি বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝

'এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত শোকর-গুযার (কৃতজ্ঞ) এবং অত্যন্ত সহনশীল।' (তাগাবুন ঃ ১৭)

আল্লাহ্ পাক শোকরকেই বেহেশ্তীদের 'কথার প্রারম্ভিকা' বলেও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

'এবং তারা (বেহেশ্তীরা) বলবে, আল্লাহ্ পাকেরই হাম্‌দ ও শোকর, যিনি আমাদেরকে তার প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখালেন।' (যুমার ঃ ৭৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'তাদের আখেরী কথা হবে আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল-আলামীন।'
(ইউনুস ঃ ১০)

শোকর সম্পর্কিত বর্ণনায় হাদীসের ভাণ্ডারও ভরপুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ ـ

'শোকর-গুযার ভক্ষকের মর্তবা ছবরওয়ালা রোযাদারের মত।'

হযরত আতা (রহঃ) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হার খিদমতে হাযির হলাম। এবং বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আপনার দেখা সর্বাধিক বিস্ময়কর যে-ঘটনাটা, তা আমাকে শোনান। এতদ্শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তাঁর কোন্ বিষয়টাই এমন ছিল যা বিস্ময়কর নয়। এক রাতের ঘটনা। তিনি আমার ঘরে আসলেন। আমার বিছানায় আমার লেপে আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। এতটা ঘেঁষে শুইলেন যে, আমার শরীরের চামড়া তাঁর শরীর মুবারকের চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর তিনি বলে উঠলেন, হে আবু বকর তনয়া, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার রব্বের ইবাদতে মগ্ন হবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনার সান্নিধ্য আমার প্রিয় বস্তু ; কিন্তু, আপনার ইচ্ছাকেই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। এই বলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি উঠে গিয়ে একটি পানির মশক নিয়ে তা থেকে উযূ করলেন। উযূতে পানি বেশী একটা লাগান নাই। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমনকি, তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে তাঁর বুকের উপর গিয়ে পড়ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন, রুকূ'তেও কাঁদলেন। অতঃপর সিজদায় পড়েও কাঁদলেন। সিজদা থেকে বসেও কাঁদলেন। এভাবেই নামায ও কান্না আর কান্নারত অবস্থায়ই হযরত বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য আহ্বান করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার এত কান্নার কারণ কি? অথচ, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের (আপনার ধারণাকৃত) সর্বরকম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ

اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

'তবে কি আমি তার 'শোকর-গুযার গোলাম' হবো না?' আমি কেন তা করবো না, অথচ, আল্লাহ্ পাক আমার উপরেই তো এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الآية

'আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে অসংখ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (বাকারাহ্ঃ ১৬৪) এ আয়াত তো দাবী করে যে, কান্না যেন কখনো বন্ধ না হয়। এই ভেদের প্রতিই ইঙ্গিত করে একটি বর্ণনা, যাতে বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একটি ক্ষীণকায় পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছোট্ট এ পাথরটি থেকে বিপুল পানির ধারা প্রবাহিত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। আল্লাহ্ পাক তখনি পাথরটিকে বাকশক্তিমান করে দিলেন। পাথরটি বললো, যেদিন থেকে আমি এ আয়াতখানা শুনেছি ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج

'জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর', (বাকারাহ্ ঃ ২৪) সেই ভয়ে সেদিন থেকে আমি কাঁদছি। এ শুনে উক্ত পয়গম্বর (আঃ) পাথরটিকে জাহান্নাম হতে মুক্তিদানের জন্য দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক তার মুক্তি মন্‌যুর করলেন।

উক্ত পয়গম্বর বেশ কিছুদিন পর আবার সেদিকে অতিক্রমকালে আবারো তাকে ক্রন্দনরত দেখে আরজ করলেন, হে পাথর, এখন আবার কান্না কেন? পাথর বললো, তা ছিল ভয়ের কান্না, আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দের কান্না।

বস্তুতঃ মানুষের দিলও পাথরের মত, বরং তদপেক্ষা কঠিন। এ কাঠিন্য তখনি দূর হয় যখন বান্দা ভয়ের হালতে ভয়ের কান্নাও কাঁদে, আবার কৃতজ্ঞতার হালতে শোকরের কান্নাও কাঁদে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

يُنَادِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمِ الْحَمَّادُوْنَ ـ

ক্বিয়ামত দিবসে ঘোষণা দেওয়া হবে যে, 'হাম্মাদীন্‌রা' উঠ।' তখন একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের জন্য একটি 'পতাকা' স্থাপিত হবে এবং তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। কোন সাহাবী প্রশ্ন করলেন যে, হাম্মাদীন কারা? জবাবে আঁ–হযরত বললেন ঃ যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকর করে। আর এক বর্ণনা মতে, যারা সুখেও এবং দুঃখেও আল্লাহ্‌র শোকর করে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ رِدَاءُ الرَّحْمٰنِ ـ

'হাম্‌দ ও শোকর হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র চাদর।'

আল্লাহ্ পাক হযরত আইয়ূব (আঃ)–এর নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, আমি আমার নে'আমতসমূহের বিনিময়ে আমার ওলীগণের শোকর পেয়েই খুশী হয়ে যাই। তাঁর নিকট প্রেরিত অন্য এক ওহীতে ছবরকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ছবরকারীদের আবাস হবে চির শান্তি–নিকেতন জান্নাতে। জান্নাতে প্রবেশের পর আমি তাদের অন্তরে শোকরের সর্বোত্তম ভাষা ঢেলে দিবো। যখন শোকর করবে তখন আমি আরও বেশী শোকর দাবী করবো। যখন তারা আমার দিকে তাকাবে তখন আমি 'বিরাট ও বিপুল' দান করবো।

স্বর্ণ–চান্দি ও সম্পদরাজি সম্পর্কে যখন পবিত্র কুরআনে ভীতি–উচ্চারক আয়াতসমূহ নাযিল হলো হযরত উমর (রাযিঃ) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমরা কোন্ কোন্ মাল সংগ্রহ করতে পারি? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا ـ

'তোমাদের প্রত্যেকে সংগ্রহ করবে একটি যিকিরে–মশগুল যবান ও একটি শোকর গুযার দিল্।' এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালের বদলে 'কৃতজ্ঞ দিল্' যোগাড়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)

বলেছেন ঃ

اَلشُّكْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'শোকর ঈমানের অর্ধেক।'

এখানে জ্ঞাতব্য যে, শোকর কলবের দ্বারাও হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হয়। কলবী শোকর মানে, নেকী ও ভালাইর সংকল্প করা এবং সেই নেক সংকল্পকে সমগ্র মাখলুক থেকে গোপন রাখা। 'যবানী শোকর' অর্থ, মুখের দ্বারা আল্লাহ্র নে'আমতরাশির জন্য তার কৃতজ্ঞতা ও গুণকীর্তন করা। আর 'আঙ্গিক শোকর' অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'আমতসমূহকে তার বন্দেগী ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত করা এবং খোদা-প্রদত্ত কোনও নে'আমতকে পাপ ও অন্যায়ের কর্মে না লাগানো। এমনকি, যে-কোন মুসলমানের দোষত্রুটি দেখলে তা গোপন রাখা চক্ষের শোকরের অন্তর্ভুক্ত। যে-কোন মুসলমানের কোন দোষের কথা শুনতে পেলে তা গোপন রাখা কানের শোকর। এভাবে, এ কাজগুলোও আল্লাহ্র নে'আমতের শোকর বলে বিবেচিত। আর মুখের দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তোষ ও প্রশংসা করে 'যবানী শোকর' আদায় করতে হয় ; শরীঅতে এরও নির্দেশ আছে। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের সকালটা কেমন কাটলো। সে বললো, ভালো। তিনি আবারো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সেও একই উত্তর দিলো। তৃতীয় বারের জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, আল্হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্র শোকর, ভালো। তিনি বললেন, এ কথাটাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম।

আমাদের অতীত বুযুর্গগণ এভাবে পরস্পর কুশল বিনিময় করতেন। এতে তাদের নিয়ত থাকতো শোকরের আমল করা। ফলে, জিজ্ঞাসিত জন হতেন শোকর আদায়কারী ও বন্দেগীকারী ; সাথে সাথে তার শোকর ও বন্দেগীর 'মাধ্যম' হিসাবে জিজ্ঞাসাকারীও বন্দেগী সম্পাদনকারীই হয়ে যেতেন। এ ধরনের কুশল বিনিময়ে নিছক ভাব বিনিময়ের প্রকাশ ঘটিয়ে রিয়া বা প্রদর্শন-প্রীতি তাদের উদ্দেশ্য হ'তো না।

স্মর্তব্য যে, মানুষের কুশল জানতে চাইলে হয়তঃ কেউ হাম্‌দ ও শোকর প্রকাশ করবে, কেউ অভিযোগ ও আপত্তিসূচক কিছু বলবে, আর কেউবা

নিশ্চুপ থাকবে। তন্মধ্যে শোকর তো ইবাদত।

আল্লাহ্ওয়ালাদের মুখ থেকে অভিযোগ প্রকাশ হওয়া জঘন্য পাপ। সকল রাজার রাজা ঘটিত কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন অপরাধ নয় তবে কি? অথচ, সবকিছু তো তারই হাতে। আর বান্দা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন গোলাম। তাই, বালা-মুসীবতে, দুঃখ-কষ্টে ছবর করা যদি কঠিন হয় এবং সেজন্য কোন শেকায়েত করতেই হয়, তাহলে, বান্দার উচিত, তা স্বয়ং আল্লাহ্র সম্মুখে পেশ করা। কারণ, মুসীবত ও পরীক্ষা তারই পক্ষ হতে। এবং মুসীবত হটানোর ক্ষমতাও তাঁরই হাতে। বস্তুতঃ মনিবের সম্মুখে গোলামের যিল্লত ও মিনতিতেই তার ইয্যত। আর অন্যের কাছে মনিবের বিরুদ্ধে দুই কথা বলাতে নিজেরই লাঞ্ছনা ও যিল্লত। বান্দার কাছে বান্দার অভিযোগ—কি ঘৃণ্যতম কাজ।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ط

'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছ, তারা তো তোমাদেরকে রিযিক দানের ক্ষমতা রাখে না। অতএব, আল্লাহ্র কাছে রিযিক চাও, আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ্র শোকর-গুযার কর।' (আনকাবূত ঃ ১৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

'তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছো, তারা তো তোমাদের মত বান্দাই।' (আ'রাফ ঃ ১৯৪)

এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মৌখিক শোকরও শোকরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটেছিল। তাদের মধ্য হতে একটি যুবক

হযরত উমর (রহঃ)–এর সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, কোন বয়োজ্যেষ্ঠকে মওকা দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে। যুবকটি বললো, হে আমীরুল–মু'মিনীন, বয়সই যদি মাপকাঠি হতো, তবে মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মওজুদ আছে। অতঃপর হযরত উমর (রহঃ) বললেন, আচ্ছা, বল কি বলবে। যুবক বললো, আমরা কোন 'আবেদন বহনকারী' প্রতিনিধি নই। কারণ, আপনার করুণাদৃষ্টি আবেদনের আগেই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা কোন ভীতি হতেও উদ্ধারপ্রার্থী নই। কারণ, আপনার ইনসাফ ও সুবিচার আমাদেরকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেছে। আমরা কেবল 'কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক প্রতিনিধি' আমরা শুধু এ জন্যেই এসেছি যে, মৌখিকভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেই বিদায় হবো।

অধ্যায় ঃ ৪২

অহংকারের কুৎসা ও অপকারিতা

আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় অহংকারী দাম্ভিকের জঘন্যতা ও জঘন্য পরিণতি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

এক

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

দুই

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ○

তিন

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

চার

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

পাঁচ

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا ○

ছয়

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ○

এক. আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে রাখবো ঐ সকল লোকদেরকে যারা পৃথিবীতে না–হক অহংকার করে। (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর হৃদয়কে মোহরযুক্ত করে দেন। (গাফির ঃ ৩৫)

তিন. রাসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য হঠকারী ব্যর্থকাম হল। (ইব্রাহীম ঃ ১৫)

চার. নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না। (নাহ্ল ঃ ২৩)

পাঁচ. তারা তাদের হৃদয়ে অহংকার লালন করে এবং তারা মারাত্মক সীমালংঘন করেছে। (ফুরকান ঃ ২১)

ছয়. যারা দম্ভ–অহংকারে আমার ইবাদত করতে নাক সিটকায়, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত–অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (গাফির ঃ ৬০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশ্তে যেতে পারবে না। এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে জাহান্নামী হবে না।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ (হাদীসে–কুদ্সীতে) ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهٗ فِىْ جَهَنَّمَ وَلَا اُبَالِىْ-

'অহংকার আমার চাদর ; মহত্ত্ব ও বড়ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, যে এতদুভয়ের যেকোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, লা–পরওয়া আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

হযরত আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 'সাফা' এলাকায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)–এর মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) চলে গেলেন আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) সেখানেই অবস্থান করলেন। তিনি তখন রোদন করছিলেন। তাই, উপস্থিত লোকজন তাঁকে বললেন, হে আবদুর

রহমানের বাপ, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রাযিঃ) বলে গেলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ

'যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাকে উল্টামুখী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ۔

মানুষ নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। এভাবে একদিন সে আল্লাহ্‌র দরবারে দাম্ভিক–অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার উপর ঐ সকল আযাব–গযব নাযিল হতে থাকে যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিল।

একদা হযরত সুলাইমান ইব্‌নে দাউদ (আলাইহিমাস্–সালাম) মানুষ, জ্বিন, পাখী ও চতুষ্পদ জন্তুদের বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে বের হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো (এবং তখ্‌তে আরোহণ করলো)। তাদের মধ্যে মানুষের সংখ্যা ছিল দুই লাখ আর জ্বিনেরাও ছিল দুই লাখ। হযরত সুলাইমান (আঃ) তখ্‌তে আরোহণ করে বহু ঊর্ধ্বে উড়ে গেলেন, এমনকি, তিনি আকাশের মধ্য হতে ফেরেশ্‌তাদের তাসবীহ্ পাঠের ঝংকার শুনতে পেলেন। আবার তিনি তখ্‌তকে নীচে অবতরণের নির্দেশ দিলেন এবং এত নীচুতে পৌঁছলেন যে, তাঁর পদযুগল সমুদ্রের পানি ছুঁয়ে গেল। তখন একটা অদৃশ্য আওয়ায শোনা গেল ঃ

لَوْ كَانَ فِي قَلْبِ صَاحِبِكُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَخَسَفْتُ بِهٖ اَبْعَدَ مِمَّا رَفَعْتُهُ

'তোমাদের সহচরের (হযরত সুলাইমানের) অন্তরে যদি এক কণা অহংকারও থাকতো, তাহলে, আমি তাঁকে যতটা উর্ধ্বে তুলেছিলাম, তদপেক্ষা বহু নীচে তাঁকে ধ্বসিয়ে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের মধ্য থেকে এমন একটা 'বিস্ময়কর গর্দান' বের হবে যার শ্রবণশক্তিসম্পন্ন দু'টি কান থাকবে, দৃষ্টিরত দু'টি চোখ থাকবে, এবং বাকশক্তিমান একটি জিভ্ থাকবে। সে বলতে থাকবে ঃ আমি তিন শ্রেনীর মানুষের আযাবের জন্য নিয়োজিত—হঠকারী-দাম্ভিক, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে মা'বুদ স্বীকারকারী এবং প্রাণীর মূর্তি নির্মাণকারী। আর এক হাদীসে বলেছেন, কৃপণ, দাম্ভিক ও দুরাচারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাহান্নাম বললো, আল্লাহ্ আমাকে অহংকারী ও দাম্ভিকদের ঠিকানা মনোনীত করেছেন। জান্নাত বললো, আমার গর্ব এই যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে দুর্বল, অক্ষম, অসহায় ও জিজ্ঞাসাকারীবিহীনদের আশ্রয় মনোনীত করেছেন। জবাবে আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার 'রহমত' ; আমার যে বান্দার প্রতি আমার ইচ্ছা হয়, তোমার মাধ্যমেই আমার করুণা প্রকাশ করবো। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব ; যাকে ইচ্ছা, তোমার দ্বারাই আমি শাস্তি প্রদান করবো। এবং তোমাদের প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى۔ وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْاَعْلٰى

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ۔ وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ غَفَلَ۔ وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى۔ بِئْسَ الْعَبْدُ

عَبْدٌ عَتٰى وَبَغٰى وَنَسِيَ الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهٰى

'কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ-অহংকার প্রদর্শন করে এবং সীমালংঘন করে ; সবচেয়ে 'বড় দাম্ভিকের' (আল্লাহ্‌র) কথা তার মনে থাকে না।

কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ দেখায়, বড়ত্ব ফুটায় ; সেই মহান সত্তার কথা সে মনে রাখে না যিনি মহীয়ান-গরীয়ান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। কি জঘন্য সেই বান্দা যে গাফেল ও উদাসীন হয়ে আছে ; কবরস্থান ও পচন-গলনের কথা ভুলে বসে আছে। কি জঘন্য সেই বান্দা যে সীমাতিক্রম করে, অন্যায়-অবিচার করে ; নিজের শুরু এবং শেষকে ভুলে থাকে।'

হযরত সাবিত (রহঃ) বলেন, আমরা একটি হাদীসে জানতে পেরেছি, একদা কেউ বলছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক ব্যক্তিটি সাংঘাতিক অহংকারী। হুযুর বললেন ঃ তাকে কি মরতে হবে না?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে দুইটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি এবং দুইটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নিষেধ করে যাই, খবরদার! কখনো শিরক করবে না, অহংকার করবে না। আর তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার জন্য। কারণ, সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-কে আর এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পাল্লা ভারী হবে। এবং সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে যদি একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্কে সেই বৃত্তের উপর রাখা হয়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র ভারে সেই বৃত্তটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছি সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহী পড়ার জন্য। কারণ, তা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর তাস্‌বীহ্ এবং এরই বরকতে তারা সকলে রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা-মাসীহ্ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে তার কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর সে দম্ভ-অহংকারমুক্ত মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে সুসংবাদ, মোবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীরা বদ-স্বভাব, উজবক, দাম্ভিক, সম্পদ স্তূপীকার ও কৃপণ হয়, আর জান্নাতীরা হয় দুর্বল, স্বল্পমাল। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট চরিত্রবানরাই হবে আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রিয়তম। এবং বকবককারী, চিবিয়ে-

চিবিয়ে, শানিয়ে–শানিয়ে কথনাভ্যাসী ও গরিমাকারীরা জাহান্নামী।

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতে অহংকারীদের হাশর হবে পিপীলিকার আকৃতিতে, তারা মানুষের পদযুগলে দলিত হতে থাকবে। তাদের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকেও তাদের চাইতে বড় দেখাবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক বন্দীশালায় নিয়ে বন্দী করা হবে। ভয়ংকর আগুন চতুর্দিক হতে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। জাহান্নামীদের দেহ–গলিত রক্ত–পূঁজ তাদেরে পান করতে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ অহংকারীরা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাকের নিকট তুচ্ছতা ও ঘৃণ্যতার জন্য পিপীলিকার আকারে মানুষের পদপিষ্ট হবে। হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বলেন, একবার আমি বেলাল ইব্‌নে আবি বুরদার নিকট গেলাম। এবং তাকে বললাম, তোমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর 'হাবহাব' নামক একটি ওয়াদী আছে, আল্লাহ্ পাক যতসব দম্ভ–দর্পকারীদের তাতে নিক্ষেপ করবেন। অতএব, হে বেলাল, সাবধান! তা যেন তোমার আবাস না হয়।

প্রিয় নবী আর এক হাদীসে বলেছেন ঃ জাহান্নামে একটি ইমারত আছে, অহংকারীদেরকে তাতে ঢুকিয়ে পরে তার সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ-

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে দম্ভ–অহংকারের ফূৎকার হতে পানাহ্ চাই।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ যার দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং সে তিনটি দোষ—অহংকার, ঋণ ও আত্মসাৎ থেকে মুক্ত থাকে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, কোনও মুসলমান কোনও মুসলমানকে অবজ্ঞা করবে না। কারণ, ছোট মুসলমানও আল্লাহ্‌র নিকট বড় ও সম্মানীয়।

হযরত ওয়াহ্‌ব (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ পাক 'জান্নাতে আদ্‌ন্‌'কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে নজর করে বললেন ঃ অহংকারীদের জন্য তুমি হারাম। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আলী (রহঃ) বলেন, কারো অন্তরে কম-বেশী যতটুকু অহংকার ঢুকবে, ঠিক ঐ পরিমাণে তার বুদ্ধি-বিবেক হ্রাস পাবে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্‌ সালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এমন কি বদী আছে যার বর্তমানে নেকী নিস্ফল হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন ঃ অহংকার।

হযরত নো'মান ইব্‌নে বশীর (রহঃ) মিম্বরে বসে বলেছিলেন যে, শয়তানের কতগুলো জাল আছে, যদ্‌দ্বারা সে শিকার করে এবং শিকারের কতগুলো ক্ষেত্রও আছে। তা' হলো, আল্লাহ্‌-প্রদত্ত নে'আমতের দরুন দম্ভ-গর্ব করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর অহংকার করা, নিজেকে বড় ধারণা করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিরুদ্ধ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্‌ চাই, তিনি যেন ইহ-পরকালে এই মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهٗ بَطَرًا۔

'যে-ব্যক্তি টাখনুর নীচে লুঙ্গী (কোর্তা, পায়জামা) টেনে চলে, আল্লাহ্‌ পাক তার দিকে নজর করেন না।'

তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি চাদর পরিধান করে অহংকারী ভঙ্গিতে ডান-বাম কাঁধের উপর দৃষ্টি ফেলে মনে মনে ফুলে উঠছিল। আল্লাহ্‌ পাক তাকে যমীনের ভিতর ধ্বসিয়ে দিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে অতল তলে ধ্বসে যেতে থাকবে। হযরত যায়দ্‌ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওয়াকিদ তাঁর নিকট দিয়ে একটি নতুন কাপড় পরিহিত অবস্থায় কোথাও যাচ্ছিল। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলে উঠলেন, হে প্রিয় বৎস, লুঙ্গিটা উপরে তুলে নাও। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

'যে-ব্যক্তি অহংকারের জন্য কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ্ পাক ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার সহকারে চলবে এবং রোম ও পারস্য তাদের খিদমতগার হবে তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে তাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ

مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهٖ وَاخْتَالَ فِيْ مِشْيَتِهٖ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ غَضْبَانُ.

'যে অন্তরে নিজেকে বড় ভাবে, চাল-চলনে অহংকারী ভঙ্গী প্রদর্শন করে, যখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে তখন আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।'

আবু বকর হুযালী (রহঃ) বলেন, আমরা হাসান বসরী (রহঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। ইবনুল-আহ্তাম কয়েক ভাঁজে পুরুষ্ট করে বানানো একটি রেশমী জুব্বা পায়ের গোছা পর্যন্ত ঝুলিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছিল, জুব্বার দুই পাটের মাঝখান থেকে কাবা (পোশাক বিশেষ) দেখা যাচ্ছিল। সে ডান ও বাম কাঁধের দিকে চেয়ে-চেয়ে অহংকারপূর্ণ ভঙ্গীতে চলছিল। হযরত হাসান তার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন, উফ্, নাক উঁচু করে, গাল বাঁকা করে, দুই পাঁজরে দৃষ্টি ঢেলে-ঢেলে কিরূপ দাম্ভিক চালে হেলে দুলে চলছে। হে আহ্মক, দুই বাহুর প্রতি তোর এ সদম্ভ দৃষ্টি? অথচ, আল্লাহ্‌র দেওয়া অসংখ্য নে'আমতের শোকর আদায়ের কোন তোয়াক্কা নাই, কোন নে'আমতের ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কি নির্দেশ আছে, সেই মোতাবেক আমল নাই, তাতে আল্লাহ্‌র যে প্রাপ্য আছে তা পুরণের চেষ্টা নাই। ওর প্রতিটি অঙ্গেই তো আল্লাহ্ এক-একটি নে'আমত ; অথচ, এখন ওর প্রতিটি অঙ্গেই শয়তানের দখল। আল্লাহ্ কসম, সে যদি স্বাভাবিকভাবে চলতো কিংবা পাগলের মত উঠ-পড়-খাড়াও ঢঙ্গেও হাঁটতো, তবু তা-ই ছিল এ চলন অপেক্ষা অনেক ভালো। ইবনুল-আহতাম তাঁর এ কথাগুলো শুনে তাঁর নিকট এসে অপরাধ স্বীকার করলো। তিনি বললেন, আমার কাছে অপরাধ স্বীকারের দরকার নাই। তুমি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর। তুমি কি শোন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কি বলেছেন (?) ঃ

وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

'তুমি যমীনের উপর সদম্ভে চলো না ; নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে চিরতে পারবে না এবং পাহাড় সমান উঁচুতেও পৌঁছতে পারবে না!'(ইস্‌রা ঃ ৩৭)

আর একবার সুন্দর রেশমী পোশাক পরিহিত একটি যুবক হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে আদম সন্তান, তোমার মধ্যে যৌবনের বড় গর্ব, আকর্ষণীয় চাল–চলনের বড় আসক্তি! মনে হয় তুমি কবরে আছ, নিজের আমল ও ফলাফল দেখে ফেলেছ। কি সর্বনাশ! হে যুবক, তোমার অন্তরের চিকিৎসা কর। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত অন্তরই তো দেখতে চান।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) তাঁর পুত্রকে দাম্ভিক ঢঙে চলতে দেখে ডেকে এনে বললেন, ওরে, জানিস তুই কে? তোর মাকে আমি মাত্র একশত টাকায় খরিদ করেছি (অর্থাৎ এতটুকু মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছি)। আর তোর বাবা? আল্লাহ্ যেন মুসলিম সমাজে তোর বাবার মত আর কাউকে সৃষ্টি না করেন।

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে গোড়ালির নীচে লুঙ্গী ছেড়ে চলতে দেখে বললেন ঃ 'শয়তানের কিছু ভাই–বেরাদর আছে।' কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

হযরত মুতার্‌রিফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) জনাব মুহাল্লাবে একটি রেশমী জুব্বা পরে অহংকৃত চোখে নিজের এ–কাঁধে ও–কাঁধে নযর করতে দেখে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্, এই ঢঙের চাল–চলন আল্লাহ্–রাসূলের চোখে ঘৃণ্য–জঘন্য। মুহাল্লাব বললেন, আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, অবশ্যই ; এক বিশ্রী রক্ত ফোঁটা দিয়ে তোমার শুরু এবং দুর্গন্ধপূর্ণ একটি মুর্দা লাশ হবে তোমার পরিণতি। এ দু'য়ের মাঝখানে তুমি দুর্গন্ধপূর্ণ গলিজ বহনকারী। এতদ্‌শ্রবণে মুহাল্লাব সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সেই অহংকারী চাল–চলন বর্জন করে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ৪৩

দিন রাত ও আসমান-যমীনে ধ্যান করে জ্ঞান আহরণ

আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কিতাবের অসংখ্য জায়গায় তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনা করে সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَة

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাতের আগমন নির্গমনে অনেক নিদর্শন বর্তমান।' (বাকারাহ ঃ ১৬৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

'আল্লাহ্ তিনি, যিনি দিন ও রাতকে পরস্পরের 'উত্তরপক্ষ' করেছেন।' (ফুরকান ঃ ৬২)

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, একটি আলো দেয়, তো অন্যটি অন্ধকার ছড়ায় ; একটি বৃদ্ধি পায়, তো অপরটি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।'

জনৈক ব্যক্তি কি চমৎকার বলেছেন ঃ 'হে মানুষ, অগ্রনিশিতে তুমি সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত। মনে রেখ, রাত পোহাতেই অসংখ্য বিপদ তোমার দরজায় হানা দিচ্ছে। 'খবরদার, পয়লা প্রহরের সহানুভূতিতে যেন খুব বিভোর হয়ে না পড়। কারণ, অনেক নিশির ঊষাকালে আগুনও জ্বলে উঠে।'

আর এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ এ রাতগুলো দেখে মনে হয়, যেন তা মানুষের মিঠা পানির ঘাট। হয়তঃ এ জন্যই ওরা সেখানে জীবনকে কেবলই

বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করছে। কখনও বা তাকে সংকুচিত ভাবছে। দুঃখের নিশি ওদের কাছে অতি দীর্ঘ। আবার সুখের নিশিগুলো অত্যন্তই সংকীর্ণ।

আল্লাহ্ পাক তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাকারীদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করে (বলে), হে প্রতিপালক, আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।' (আলি-ইমরান ঃ ১৯১)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, অনেকে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي اللّٰهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهُ.

'তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর, কিন্তু খোদ আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা করো না। কারণ, আল্লাহ্কে তার স্ব-অবস্থানে রেখে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নাই।'

এক হাদীসে আছে, একদিন তিনি কতিপয় লোকের নিকট গেলেন যারা 'তাফাক্কুর' (চিন্তা-গবেষণা) করছিল। হুযুর পুরনূর বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা যে কোন কথা বলছ না? তারা বললো, আমরা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এভাবে তার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তা করতে যেওনা। দেখ, মাগরিবে একটি শ্বেত ভূখণ্ড আছে যার আলো তার শুভ্রতা এবং তার শুভ্রতাই তার আলো। সূর্যের সেই ভূখণ্ড অতিক্রমণে চল্লিশ দিন সময় লাগে। সেখানে

এমন এক মাখলুক বাস করে যারা পলকমাত্রও না-ফরমানী করে নাই। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান কি তাদেরকে আক্রমণ করে না? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, শয়তান নামক কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে কি-না। তারা বললো, ঐ সম্প্রদায়টি কি আদমের আওলাদ? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হয়েছেন কি-না।

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, একদিন আমি এবং উবাইদ বিন উমাইর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে উবাইদ, আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে কে তোমাকে বাধা দেয়? উবাইদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী ঃ

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا ـ

'—'মাঝে মাঝে' সাক্ষাত কর, এতে মহব্বত বাড়বে।'

অতঃপর হযরত উবাইদ (রহঃ) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্ময়কর কোন ঘটনা শোনান, যা আপনি স্বয়ং অবলোকন করেছেন। এতদ্শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ওরে, হুযূর পুরনূরের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর। একদিন তিনি 'আমার রাত্রে' আমার কাছে সজ্জা গ্রহণ করলেন। এতটা কাছে এলেন যে, তাঁর দেহ-মুবারকের চামড়া আমার চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর বলতে লাগলেন, (হে আয়েশা,) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবো। অতঃপর তিনি একটি পানির মশক থেকে উযূ করে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রাযিঃ) এসে ফজরের নামাযের আহ্বান জানালেন। বেলাল হুযূরকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ আল্লাহ্ পাক তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের তামাম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করেছেন? হুযূর বললেন, বেলাল, তুমি কি সর্বনাশা

কথা বলছ, কেন আমি কাঁদবো না (?) অথচ, এ রাত্রেই আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে নিখুঁত ও প্রকৃত জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান আছে।'

(আলি-ইমরান ঃ ১৯০)

তিনি আরও বললেন, যে এ' আয়াত পড়লো কিন্তু, এতে চিন্তা-ফিকির করলো না, তার ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই চিন্তা-ফিকিরের সীমারেখা কি? তিনি বললেন, আয়াতটি পাঠ করা এবং তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বসরাবাসী সফর করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) দিনভর ঘরের এক কোণে বসে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুহূর্তকালের চিন্তা-ফিকির রাতভর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, ফিকির হচ্ছে একটি আয়না যাতে তুমি তোমার ভাল-মন্দসমূহ দেখতে পাবে।

কেউ হযরত ইবরাহীম (রহঃ)-কে বললো ; আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তামগ্ন থাকেন। জবাবে তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকিরই বিবেক-বুদ্ধির নির্যাস।

হযরত সুফইয়ান ইব্‌নে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) প্রায়শঃই জনৈক ব্যক্তির এ ছন্দটি আবৃত্তি করতেন ঃ

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ ۔۔۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ ۔

'মানুষ যদি চিন্তা-ফিকিরে অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই

এমন এক মাখলুক বাস করে যারা পলকমাত্রও না-ফরমানী করে নাই। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান কি তাদেরকে আক্রমণ করে না? হুযুর বললেন, তারা জানেই না যে, শয়তান নামক কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে কি-না। তারা বললো, ঐ সম্প্রদায়টি কি আদমের আওলাদ? হুযুর বললেন, তারা জানেই না যে, হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হয়েছেন কি-না।

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, একদিন আমি এবং উবাইদ বিন উমাইর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে উবাইদ, আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে কে তোমাকে বাধা দেয়? উবাইদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী ঃ

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا -

'—'মাঝে মাঝে' সাক্ষাত কর, এতে মহব্বত বাড়বে।'

অতঃপর হযরত উবাইদ (রহঃ) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্ময়কর কোন ঘটনা শোনান, যা আপনি স্বয়ং অবলোকন করেছেন। এতদশ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ওরে, হুযূর পুরনুরের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর। একদিন তিনি 'আমার রাত্রে' আমার কাছে সজ্জা গ্রহণ করলেন। এতটা কাছে এলেন যে, তাঁর দেহ-মুবারকের চামড়া আমার চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর বলতে লাগলেন, (হে আয়েশা,) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবো। অতঃপর তিনি একটি পানির মশক থেকে উযূ করে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রাযিঃ) এসে ফজরের নামাযের আহ্বান জানালেন। বেলাল হুযূরকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ আল্লাহ্ পাক তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের তামাম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করেছেন? হুযূর বললেন, বেলাল, তুমি কি সর্বনাশা

কথা বলছ, কেন আমি কাঁদবো না (?) অথচ, এ রাত্রেই আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে নিখুঁত ও প্রকৃত জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান আছে।'

(আলি-ইমরান : ১৯০)

তিনি আরও বললেন, যে এ' আয়াত পড়লো কিন্তু, এতে চিন্তা-ফিকির করলো না, তার ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই চিন্তা-ফিকিরের সীমারেখা কি? তিনি বললেন, আয়াতটি পাঠ করা এবং তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বসরাবাসী সফর করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) দিনভর ঘরের এক কোণে বসে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুহূর্তকালের চিন্তা-ফিকির রাতভর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, ফিকির হচ্ছে একটি আয়না যাতে তুমি তোমার ভাল-মন্দসমূহ দেখতে পাবে।

কেউ হযরত ইবরাহীম (রহঃ)-কে বললো ; আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তামগ্ন থাকেন। জবাবে তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকিরই বিবেক-বুদ্ধির নির্যাস।

হযরত সুফইয়ান ইব্‌নে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) প্রায়শঃই জনৈক ব্যক্তির এ ছন্দটি আবৃত্তি করতেন :

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ ـ

'মানুষ যদি চিন্তা-ফিকিরে অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই

সে মূল্যবান শিক্ষা খুঁজে পাবে।'

হযরত তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে রূহুল্লাহ্, অদ্য এই পৃথিবীতে 'আপনার মত' আরো কেউ আছে? তিনি বললেন, হাঁ, যার কথা যিকির, যার নীরবতা ফিকির এবং যার প্রতিটি নজর একটি শিক্ষা, নিঃসন্দেহে সে আমার মত। (অর্থাৎ নবুয়তের পার্থক্য ব্যতীত আর সবকিছুতেই সে আমার সমকক্ষ।)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যার কথা 'হিকমত' না হয়ে অন্যকিছু হয়, তা অনর্থক কথা ; যার নীরবতা চিন্তা-ফিকিরে কাটে না, সে তা ভুল করছে। যার দৃষ্টি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য হয় না, সেটা তার গাফলতির পরিচয় বহন করছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ

'আমি আমার নিদর্শনাবলী থেকে ঐ সকল লোকদের বারিত ও বাধাপ্রাপ্ত করি, যারা পৃথিবীতে না-হকভাবে অহংকার প্রদর্শন করে।' (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, আমি তাদের হৃদয়-সমূহকে আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার তওফীক হতে বঞ্চিত করে দিই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَعْطُوْا اَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ.

'তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে তাদের প্রাপ্য ইবাদতের অংশ প্রদান কর। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চক্ষুর সে-অংশটা কি? তিনি বললেন ঃ পবিত্র কুরআন দেখা, তার ভিতর চিন্তা-ফিকির করা এবং বিস্ময়কর বিষয়াবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।'

মক্কার নিকটবর্তী একটি এলাকার জনৈকা মহিলা বলেছেন, মুত্তাকী-পরহেযগারদের অন্তর যদি তাদের চিন্তা ও ধ্যানের চোখ দিয়ে দেখতে পেতো যে, তাদের দৃষ্টির অন্তরালে আখেরাতের কি অফুরান ও মূল্যবান নে'আমত

তাদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে, তা' হলে এ ভঙ্গুর জগতে তাদের অবস্থান ও জীবন-যাপন কঠিন হয়ে যেত, তারা অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো।

হযরত লোকমান (আঃ) দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় একাকী বসে কাটাতেন। তাঁর মনিব তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেই বলতেন, লোকমান, তুমি এভাবে দীর্ঘ সময় একাকী বসে থাক? লোকদের সাথে বসলে তোমার ভালো লাগতো, মন উৎফুল্ল থাকতো। জবাবে তিনি বলতেন ঃ দীর্ঘতম নিঃসঙ্গ বৈঠক দীর্ঘতর ফিকিরের সহায়ক এবং দীর্ঘ ধ্যান-ফিকির জান্নাতের পথ-প্রদর্শক।

হযরত ওয়াহ্‌ব বিন-মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলতেন, যেকোন মানুষ দীর্ঘসময় ধ্যান-ফিকিরে কাটালে অন্তরে ইল্‌ম পয়দা হবে এবং সেই ইল্‌মের উপর আমলও নসীব হবে। হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাকের নে'আমতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহঃ) শান্ত ও স্থিরভাবে চিন্তামগ্ন দেখে হযরত ছাহ্‌ল ইব্‌নে আলী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ কোথায় গিয়ে পৌঁছলেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতো, তাহলে কস্মিনকালেও তারা পাপে লিপ্ত হতো না। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِيْ تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ بِلَا قَلْبٍ

'ধ্যান ও ফিকির সহকারে হাযির দিলে মধ্যম ধরনের দুই রাকআত নামায, দিল্‌বিহীন ধ্যান-ফিকিরবিহীন সারারাত্রির নফলের চেয়ে উত্তম।'

একদা হযরত আবূ শুরাইহ্ (রহঃ) পথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ বসে পড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, চিন্তা করেছি যে, বয়স তো শেষ হয়ে গেল, আমল তো কিছুই করতে পারি নাই, মৃত্যুও সন্নিকটবর্তী!

হযরত আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে রোদনে অভ্যস্ত কর। তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়ার ফিকির আখেরাতকে আড়ালে

ফেলে দেয় এবং তা ওলীদের জন্য আযাবস্বরূপ। আর আখেরাতের ফিকির অন্তরে হিকমত ও জ্ঞান জন্মায় এবং অন্তরকে জীবন দান করে।

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) বলেন, কোন কিছু থেকে উপদেশ গ্রহণের দ্বারা ইল্ম বাড়ে, যিকরুল্লাহ্র দ্বারা মহব্বত বাড়ে, চিন্তা-ফিকির দ্বারা আল্লাহ্-ভীতি বাড়ে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, শুভ ও সুন্দরের ফিকির সেই শুভর উপর আমলের দিকে টেনে নেয়। অন্যায়ের প্রতি অনুতাপ তা বর্জনে সহায়তা করে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রকৃত বুদ্ধিমান বান্দারা যিকিরের সাথে ফিকিরের এবং ফিকিরের সাথে যিকিরের অভ্যাসওয়ালা হয়। এর ফলে তাদের অন্তর বাকশক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং হিকমতের কথা বলতে শুরু করে। (হিকমত ঐ নিখুঁত ও গভীর নূরানী জ্ঞান যা নবীর শিক্ষার মুতাবিক হয় এবং আল্লাহ্র পরিচয় ও মহব্বত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়)

হযরত ইসহাক বিন খলফ্ (রহঃ) বলেন, হযরত দাউদ ত্বাঈ (রহঃ) এক পূর্ণিমারাতে ঘরের ছাদের উপরে অবস্থান করে আসমান ও যমীনের বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে ফিকিরে মশগুল ছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করছিলেন। এতই চিন্তা-বিভোর হলেন যে, আচমকা সেখান থেকে তাঁর পড়শীর বাড়ীর মধ্যে পড়ে গেলেন। বাড়ীওয়ালা কোন চোর ধারণা করে তরবারি হাতে উলঙ্গ অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে ছুটে এলেন। হযরত দাউদ (রহঃ)-কে দেখে তরবারি নামালেন ও বিরত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে আপনাকে ছাদ হতে নীচে ফেলে দিলো? তিনি বললেন, আমি তো কিছুই টের করতে পারলাম না।।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিশ হলো, তাওহীদের ময়দানে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসা এবং মা'রিফাতের সমীরণ আঘ্রাণ করা, এশ্কের দরিয়া হতে মহব্বতের শরাব পান করা এবং আল্লাহ্র প্রতি সু-ধারণা সহকারে হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাকে উপভোগ করা। হে মানুষ, এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন মজলিশ আমি জানি না, এর চাইতে সুমিষ্ট কোন শরাব আমি চিনি না। বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এ দৌলতপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ

اِسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْكَلَامِ بِالصَّمْتِ وَعَلَى الْاِسْتِنْبَاطِ بِالْفِكْرِ ـ

'সুন্দর বাকশক্তির জন্য নীরবতার সাহায্য গ্রহণ কর এবং অনুদঘাটিত জ্ঞান উদঘাটনের জন্য চিন্তা–ফিকিরের সাহায্য গ্রহণ কর।'

তিনি আরও বলেছেন, স্রষ্টার নিদর্শনাবলীতে গভীর নযর অহংকার হতে মুক্তির ওষুধ। সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ভ্রান্তিতে পড়া ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা করে ; চিন্তা ফিকির সাবধানতা, দূরদর্শিতা ও চেতনা উৎপাদন করে ; জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শকরণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মযবুতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে শক্তি যোগায়। অতএব, সিদ্ধান্তের পূর্বেই চিন্তা করে নাও ; অগ্রসর হওয়ার আগেই পরামর্শ করে ফেল।

তিনি আরও বলেছেন, চারটি গুণ সম্মানের চাবিকাঠি ঃ এক. গভীর ও পোক্ত জ্ঞান (হিকমত), চিন্তা–ফিকির তার স্তম্ভ ; দুই. কলুষমুক্ত চরিত্র—মনের কুমন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এর মূল শক্তি ; তিন. শক্তিশীলতা—গোস্বা নিয়ন্ত্রণ এর ভিত্তি ; চার. ইনসাফ—অন্তরের পবিত্রতা ও ভারসাম্যই এর বুনিয়াদ।

অধ্যায় ঃ ৪৪
মৃত্যুর কষ্ট

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণার আলোচনায় বলেছিলেন যে, তাতে তরবারির দ্বারা তিনশত বার আঘাতের সমান কষ্ট হয়। একবার তাঁকে মৃত্যুকষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ সবচেয়ে সহজ মৃত্যুর উদাহরণ একরকম, যেমন, আকণ্ঠ কাঁটাপূর্ণ একটি গুল্মকে যদি ভেড়ার পশমের স্তূপে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বের করে আনা হয় তবে তার সাথে সাথে অবশ্যই পশমও বেরিয়ে আসে। একবার তিনি এক মরণাপন্ন রোগীর নিকট গমন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি জানি যে, এর কিরূপ কষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিটি রগ-রেশা স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুযন্ত্রণার শিকার হচ্ছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, যুদ্ধ না করলেও তোমাদের মরতে হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আলীর জীবন, শয্যায় পড়ে মৃত্যুর চেয়ে তলোয়ারের সহস্র ঘা আমার নিকট অধিক হাল্কা।

হযরত আওযাঈ (রহঃ) বলেন, আমরা আমাদের ইলমে আসা এক হাদীসে জেনেছি যে, হাশরের জন্য পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্তই মুর্দা ব্যক্তি তার মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে।

হযরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আওছ্ (রাযিঃ) বলেন, মৃত্যু মু'মিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে ভয়ংকর ভীতি। মৃত্যুযন্ত্রণা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা, কাঁচির দ্বারা টুকরা টুক্‌রা করা, এমনকি, চুলার উত্তপ্ত পাতিলে উত্তাপিত হওয়ার চেয়েও অধিক যন্ত্রণাপ্রদ। মুর্দাকে যদি পুনর্জীবিত করা হতো এবং সে দুনিয়াবাসীকে তার মৃত্যুকষ্টের খবর শোনাতো, তাহলে জীবনের তাবৎ সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যেত, আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত।

হযরত যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতার বর্ণনায় বলেন ঃ কোন মু'মিনের যদি তার পূর্বনির্ধারিত মর্তবাসমূহের কোন বিশেষ মর্তবায় পৌছানোর ঘাটতি

থাকে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তার মৃত্যু যন্ত্রণাপ্রদ করে দেন, যাতে সে এই মৃত্যু যন্ত্রণার উছীলায় তার জন্য নির্ধারিত সেই বেহেশ্তী মর্তবায় উত্তীর্ণ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কাফেরের যদি এমন কোন শুভ কর্ম থেকে থাকে যার প্রতিদান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহলে, তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন, যাতে সে তার শুভকর্মের প্রতিদান পেয়ে যায়। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে ফিরতো ঃ মৃত্যুকে তুমি কেমন পাচ্ছো? যখন সে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ মৃত্যুকে আপনি কেমন অনুভব করছেন? তিনি বললেন, মনে হয় সাত আসমান ভেঙ্গে যমীনে পড়েছে, যেন সূচের ছিদ্র দিয়ে আমার জান বের করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَاَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ.

'আকস্মিক মৃত্যু মু'মিন ব্যক্তির জন্য নিস্কৃতি ও আরামের কারণ হয় আর না-ফরমানের জন্য দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ হয়।'

হযরত মাকহূল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ شَعْرَةً مِّنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ وُضِعَتْ عَلَى اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَمَاتُوْا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِاَنَّ فِىْ كُلِّ شَعْرَةٍ الْمَوْتَ وَلَا يَقَعُ الْمَوْتُ بِشَيْئٍ اِلَّا مَاتَ.

'মৃতের একটি চুলও যদি সাত আসমান ও যমীনবাসীদের উপর রেখে দেওয়া হতো, তবে বি-ইযনিল্লাহ্, তাদের সকলের মৃত্যুই অবধারিত হতো। কারণ, প্রতিটি চুলেই মৃত্যু বিদ্যমান। আর মৃত্যু যে বস্তুর উপরেই পতিত হবে, অবশ্যই তার মৃত্যু ঘটবে।'

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ মৃত্যু যন্ত্রণার একটি ফোঁটা যদি বিশ্বের পাহাড়-

পর্বতের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তা পানির মত গলে যাবে। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম–এর ওফাতের পর আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আমার খলীল, মৃত্যুকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, কোন জীবিত পশুর পশমের ভিতর লোহার কাঁটা ঢুকিয়ে পরে টান দিলে যে অবস্থা হয়। আল্লাহ্ পাক বললেন, আমি তো আপনাকে আসানী প্রদান করেছি।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)–এর রূহ্ যখন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে গেল, তখন তাঁর প্রতিপালক বললেন, হে মূসা, মৃত্যুকে কেমন অনুভব করলে? তিনি বললেন, জ্বলন্ত পাতিলের ভিতর কোন জীবন্ত পাখীকে ছেড়ে দিলে পরে সে উড়েও যেতে পারছে না এবং তার মৃত্যুও হচ্ছে না যে, তবু তার একটা রক্ষা হয়ে যেতে পারে। আমার অবস্থাটা ছিল ঠিক সেই পাখীর মত। আর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেছিলেন ঃ আমার এমন লাগছিল যেমন কসাইর হাতে কোন জীবিত বকরীর চামড়া খসানো হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় তাঁর নিকটে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে সেই হাত দ্বারা নিজের চেহারা মুছে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ —আয় আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর কষ্টকে লাঘব করে দাও। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলেছিলেন, আব্বা গো! আহা, তোমার এতো কষ্ট! হুযুর বলেছিলেন, (ফাতেমা!) আজকের পর আর কোনদিন তোমার আব্বার কোন কষ্ট হবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) কা'ব আহ্‌বার (রহঃ)–কে বলেছিলেন, হে কা'ব, মৃত্যু সম্পর্কে কিছু শোনাও। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, মউতের উদাহরণ এ রকম, যেমন একটি বিপুল কাঁটাপূর্ণ শাখা কারো পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই কাঁটা যখন প্রতিটি রগে রগে বিঁধে গেল, তখন এক ব্যক্তি হেঁচকা টান দিয়ে তা বের করে আনলো। এভাবে যা বের হওয়ার তা বেরিয়ে এলো, আর যা থাকার তা রয়ে গেল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعَالِجُ كَرْبَ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِهِ وَإِنَّ

مَفَاصِلُهُ لِيُسَلِّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ....

'মৃত্যুকালে বান্দা মৃত্যু যন্ত্রণার শিকার হতে থাকে তখন তার দেহের প্রতিটি জোড়া অপর জোড়াকে আস্‌সালামু আলাইকা বলে সালাম জানায়।'

আর বলে ঃ তোমার ও আমার মাঝে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এ বিচ্ছেদ ঘটছে। —হে ভ্রাতা। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয়জনদের মৃত্যুকষ্টের অবস্থা। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো দিবারাত একের পর এক কত যে পাপের মধ্যে ডুবে আছি।

পরন্তু, মৃত্যুর কষ্টের সাথে আরও অধিক বিপদ ভোগ করতে হবে। কারণ, মৃত্যুর কষ্ট তিন প্রকার ঃ রূহ্ বের হওয়াকালীন কষ্ট ; মালাকুল মউতের আকৃতি দর্শন, মালাকুল মউতকে দেখে অন্তরে ভীতি সৃষ্টি। অত্যন্ত শক্তিশালী পাপীও যদি তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখতে পায়, তবে কিছুতেই সে তা বরদাশত করতে পারবে না। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম মালাকুল মউতকে বলেছিলেন, ফাসেক–ফাজেরের রূহ্–কবযের সময় তোমার যে আকৃতি হয় তা–কি আমাকে দেখাতে পার? মালাক্ বললেন, আপনার সেই ক্ষমতা নাই। তিনি বললেন, হাঁ, আছে। মালাক্ বললেন, তাহলে আপনি অন্য দিকে মুখ ফিরান। তিনি মুখ ফিরালেন। অতঃপর তিনি তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, কালো বর্ণের একটি লোক ; খাড়া–খাড়া চুল ; দুর্গন্ধপূর্ণ দেহ ; কালো পোশাক পরিহিত ; নাক–মুখ দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর হুশ ফিরে এলো। তখন মালাকুল মউত তার প্রথম আকৃতিতে ছিলেন। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, গুনাহ্‌গার বান্দা যদি মৃত্যুকালে কেবলমাত্র তোমার ঐ আকৃতিটাই দেখতে পায় তবে তা–ই যথেষ্ট।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম খুবই আত্মমর্যাদাবোধ–সম্পন্ন লোক ছিলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিতেন। একদিন তিনি দরজা বন্ধ করে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর

তাঁর বিবি দেখতে পেলেন, একটি লোক ঘরের ভিতরে। তিনি বললেন, কে এই লোকটিকে ঘরের ভিতর ঢুকালো? হযরত দাঊদ (আঃ) এসে দেখলে তো লোকটা তাঁর কঠোর আচরণের শিকার হবে। ইতিমধ্যে হযরত দাঊদ (আঃ) এসে গেলেন এবং লোকটাকে দেখলেন। বললেন, তুমি কে? সে বললো, আমি সেই ব্যক্তি যে কোন রাজা-বাদশার পরোয়া করে না এবং কারো পর্দাও আমাকে ঠেকাতে পারে না। তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই তুমি মালাকুল মঊত। ব্যস, তিনি সেখানেই চাদর মুড়ি দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পড়ে থাকা খুপরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটিকে পায়ের দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, ওহে, আল্লাহ্র হুকুমে তুমি আমার সাথে কথা বল। সে বললো, হে রূহুল্লাহ্, আমি অমুক সময়কার এক বাদশা। আমি আমার সিংহাসনারোহী ; মাথায় শাহী মুকুট ; আমার পাশেই আমার সৈন্যদল ; তার ওপর আমার শান-শওকত, শৌর্য-বীর্য। এমনি অবস্থায় মালাকুল মঊত এসে আমার সম্মুখে হাযির হলো। আমার প্রতিটি অঙ্গ আমার দেহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবং আমার রূহ্ বের হয়ে গেল। হায়, সেই সবকিছু থেকে এভাবে আমাকে জুদা হতে হলো ; মুহূর্তের মধ্যে আমার সব পরিচিত অপরিচিত হয়ে গেল।

এ হচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকা চিত্র, না-ফরমানেরা যার সম্মুখীন হবে, আর আনুগত্যশীলদেরকে এ থেকে হিফাযত করা হবে। আল্লাহ্র নবীগণ সাধারণতঃ শুধু রূহ্ কবযের কষ্টের কথাই বর্ণনা করেছেন ; মঊতের ফেরেশ্তার আকৃতি দর্শন আলাদা বিপদ। মানুষ স্বপ্নেও যদি সেই আকৃতিটি দেখতে পায় তবে সমগ্র জীবন তাকে একটা আতঙ্ক বহন করতে হবে। তাহলে, মৃত্যুকালের অবস্থাটা কি হতে পারে? অবশ্য, আনুগত্যশীল বান্দাগণ তাকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সূরতে দেখতে পাবে।

হযরত ইক্রিমা (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একটা ইবাদতের ঘর ছিল। বের হওয়ার সময় ঘরটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন তিনি বাইরে থেকে এসে দেখলেন, তাঁর সেই ঘরের ভিতর একটি লোক। তিনি বললেন, কে তোমাকে এই ঘরে ঢুকিয়েছে?

সে বললো, ঘরের মালিক। তিনি বললেন, আমিই তো এর মালিক। সে বললো, যিনি আমাকে ঢুকিয়েছেন তিনি তোমার-আমার চেয়ে বড় মালিক। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কোন্ ফেরেশ্‌তা? সে বললো, আমি মালাকুল মউত। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে তোমার সেই আকৃতিটা দেখাতে পার যে-আকৃতিতে তুমি মু'মিনের রূহ্ কবয কর। সে বললো, হাঁ। তাহলে অন্যদিকে মুখ ফিরাও। তিনি মুখ ফিরালেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, একটি সুন্দর চেহারা, সুন্দর পরিচ্ছদ ও সুগন্ধপূর্ণ যুবক। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, মু'মিন তার মৃত্যুকালে আর কিছু না-হোক, অন্ততঃ তোমার চেহারাটাও যদি দেখে তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

মৃত্যুকালীন আর একটি বিষয় হলো, আমলনামা-লিখক দুই ফেরেশ্‌তার সাক্ষাত। হযরত ওহাইব (রহঃ) বলেন, আমরা এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি, মানুষের মৃত্যু হয় না, যতক্ষণ না সে তার আমল লিখক ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের সাক্ষাতপ্রাপ্ত হয়। যদি সে আনুগত্যশীল হয় তবে তারা বলে ঃ জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত ভাল মজলিসে তুমি আমাদের বসার সুযোগ করে দিয়েছ এবং কত যে ভাল আমল তুমি আমাদের কাছে জমা করেছ। আর যদি ফাসেক-ফাজের হয় তাহলে তারা বলে ঃ লা জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত খারাপ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ, কত খারাপ আমল আমাদের সম্মুখে করেছ, কত খারাপ কথা আমাদেরকে শুনিয়েছ, আল্লাহ্ যেন তোমার কোন কল্যাণ না করেন। মুর্দা তখন অপলকনেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আর কখনও সে দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

ফাসেক-ফাজেরের জন্য মৃত্যুকালের তৃতীয় বিপদ হলো জাহান্নামের ঠিকানা দেখা। মৃত্যুকষ্টকালে তাদের সকল শক্তি খতম হয়ে যায়, রূহ্ও বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু, যতক্ষণ না তারা মালাকুল মউতের মুখে দু'টির যেকোন একটি সংবাদ শ্রবণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রূহ্ বের করা হবে না ঃ হয়তঃ বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, দোযখের সুসংবাদ নাও, অথবা বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র ওলী, বেহেশ্‌তের সুসংবাদ নাও। বস্তুতঃ এজন্যই আল্লাহ্ওয়ালাগণ ভীত-ত্রস্ত থাকেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَنْ يَّخْرُجَ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ مَصِيْرُهٗ وَ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ ـ

'তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ঠিকানা অবগত হবে এবং যতক্ষণ না তার গন্তব্যস্থল বেহেশ্ত কিংবা দোযখ অবলোকন করবে।'

অধ্যায় ঃ ৪৫
কবর ও সওয়াল জওয়াবের বর্ণনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুর্দাকে যখন কবরের ভিতর রাখা হয় তখন কবর তাকে বলে, হে আদম সন্তান, কে তোমাকে আমার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল? তুমি কি জান নাই যে, আমি পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর, পোকা–পঙ্গের ঘর? কেন তুমি আমার ব্যাপারে ধোকাগ্রস্ত ছিলে, যখন তুমিই আমার মাঝে অনেককে সোর্পদ করেছিলে? মুর্দা যদি নেককার হয় তবে এক জওয়াবদাতা কবরকে জওয়াব দিয়ে বলবে ঃ তোমার অবগত হওয়া দরকার যে, সে ভালাইর হুকুম করতো, খারাবি থেকে বারণ করতো। কবর বলবে, তাহলে আমি তার জন্য সবুজ বাগানে রূপান্তরিত হচ্ছি। তখন মুর্দার দেহটি নূরে পরিণত হবে। তার রূহ্ আল্লাহ্র দরবারে চলে যাবে।

উবাইদ বিন উমাইর লাইছী (রহঃ) বলেন, প্রতিটি কবর তার মৃতকে বলে, আমি তো অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর ; তুমি যদি তোমার জীবনে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য রহমতস্বরূপ। আর যদি নাফরমান থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য আযাবস্বরূপ। যে আমার মাঝে আনুগত্যশীল হিসাবে প্রবেশ করে, সে উৎফুল্ল হয়ে বের হয়ে যায়, আর যে নাফরমানরূপে প্রবেশ করে, সে বের হয় ধ্বংসের শিকার হয়ে।

হযরত মুহাম্মদ বিন সুব্‌হ্ বলেন, আমরা একটি হাদীসে পেয়েছি যে, মুর্দাকে কবরস্থ করার পর যদি তার উপর আযাব–গযব শুরু হয় তাহলে তার প্রতিবেশী মুর্দারা বলে, হে ব্যক্তি, আমরা যারা তোমার প্রতিবেশী ছিলাম এবং তোমার আগেই বিদায় হয়ে এসেছি, আমাদের এ বিদায়ের মাঝে তোমার জন্য চিন্তা–ভাবনার বা শিক্ষাগ্রহণের কিছু ছিল না কি? তুমি কি দেখ নাই যে, আমাদের তামাম আমল বন্ধ হয়ে গেছে? তুমি তো মওকা পেয়েছিলে। তোমার অগ্রবর্তীরা যেসব ভুল করেছিল, কেন তুমি সেই ভুলমুক্ত

হওয়ার চেষ্টা করলে না? তাছাড়া, জগতের একেকটি মাটিখণ্ড তাকে বলবে, হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, কেন তুমি তোমার ঐ সব আপনজনদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করলে না, যারা তোমার পূর্বে অনুরূপ ধোকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, তার বন্ধুরা তাকে খাটিয়ায় তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে যাওয়া অবধারিত বিষয়।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, আমরা একটি রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বাকশক্তি দান করেন। তখন তারা তাকে বলে, হে নিঃসঙ্গ কবরবাসী, তোমার স্বজন-বন্ধুজন সকলেই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; তোমার আপন বলতে এখানে আর কেউ নাই।

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, মুর্দাকে কবরে রাখার পর তার নেক আমলসমূহ তথা নামায-রোযা, হজ্জ, জিহাদ, সাদ্কা প্রভৃতি তাকে ঘিরে নেয়। আযাবের ফেরেশ্তারা যখন পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে ঃ সরে যাও ; এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ দু' পায়ের উপর ভর করে সে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তারা মাথার দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে, এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ বান্দা তার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশে বহু অনাহার ও পিপাসার কষ্ট বরদাশত করেছে। অতঃপর তারা তার শরীরের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। হজ্জ ও জিহাদ তখন বলে উঠবে, সরে যাও। কারণ, সে দৈহিক কষ্ট বরদাশত করে আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, তার উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না। অতঃপর তারা তার হস্তদ্বয়কে লক্ষ্য বানাবে। তখন সদ্কা বলতে শুরু করবে, আমার সাথীর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এই হস্তদ্বয়ের বহু দান-সদ্কা আল্লাহ্ পাকের হাতে পৌঁছেছে। তাই, তার উপর আযাবের কোনই অবকাশ নাই। তখন সেই মুর্দাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মোবারকবাদ গ্রহণ কর ; স্বার্থক জীবন, স্বার্থক এ মৃত্যু। ব্যস, রহমতের ফেরেশ্তাগণ এসে তার জন্য বেহেশ্তী বিছানা ও চাদর বিছিয়ে দিবে। কবরকে তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এবং একটি বেহেশ্তী ফানুস

প্রজ্জ্বলিত করা হবে ; কবর হতে পুনরুত্থানের দিব... র
কবরকে আলোকিত করে রাখবে।

হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্নে উবাইদ ইব্নে উমাইর বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের ভিতর মুর্দাকে ... বসানো হয়, যখন সে তাকে বিদায় দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের পায়ের পতন-ধ্বনি শুনতে পায়। অতঃপর সর্বপ্রথম কবরই তাকে সম্বোধন করে বলে, ওরে সর্বনাশা আদম সন্তান, আমার ও আমার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কি তোমাকে সাবধান করা হয় নাই? আমার দুর্গন্ধ, বিভীষিকা ও কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নাই? বল, তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?

হযরত বারা ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কবর-আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

অতঃপর ইরশাদ করলেন, মু'মিন যখন আখেরাতের দিকে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ পাক তখন এমন একদল ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন যাদের চেহারা সূর্যের মত। তাদের সঙ্গে থাকে তার জন্য আনা হানূত (সুগন্ধ) ও কাফন। তারা তার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ্ বের হয়ে যায়, তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সকল ফেরেশ্তা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চায় যেন সেই দিক দিয়ে প্রবেশ করে। যখন তার রূহ্কে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এক ফেরেশ্তা বলে, আয় রব্ব, এই আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ্ বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি নে'আমত তৈরী করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ

হওয়ার চেষ্টা করলে না? তাছাড়া, জগতের একেকটি মাটিখণ্ড তাকে বলবে, হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, কেন তুমি তোমার ঐ সব আপনজনদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করলে না, যারা তোমার পুর্বে অনুরূপ ধোকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, তার বন্ধুরা তাকে খাটিয়ায় তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে যাওয়া অবধারিত বিষয়।

হযরত ইয়াযীদ রাক্বাশী (রহঃ) বলেন, আমরা একটি রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বাকশক্তি দান করেন। তখন তারা তাকে বলে, হে নিঃসঙ্গ কবরবাসী, তোমার স্বজন-বন্ধুজন সকলেই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; তোমার আপন বলতে এখানে আর কেউ নাই।

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, মুর্দাকে কবরে রাখার পর তার নেক আমলসমূহ তথা নামায-রোযা, হজ্জ, জিহাদ, সাদ্কা প্রভৃতি তাকে ঘিরে নেয়। আযাবের ফেরেশ্তারা যখন পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে ঃ সরে যাও ; এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ দু' পায়ের উপর ভর করে সে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তারা মাথার দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে, এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ বান্দা তার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশে বহু অনাহার ও পিপাসার কষ্ট বরদাশত করেছে। অতঃপর তারা তার শরীরের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। হজ্জ ও জিহাদ তখন বলে উঠবে, সরে যাও। কারণ, সে দৈহিক কষ্ট বরদাশত করে আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, তার উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না। অতঃপর তারা তার হস্তদ্বয়কে লক্ষ্য বানাবে। তখন সদ্কা বলতে শুরু করবে, আমার সাথীর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এই হস্তদ্বয়ের বহু দান-সদ্কা আল্লাহ্ পাকের হাতে পৌঁছেছে। তাই, তার উপর আযাবের কোনই অবকাশ নাই। তখন সেই মুর্দাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মোবারকবাদ গ্রহণ কর ; স্বার্থক জীবন, স্বার্থক এ মৃত্যু। ব্যস, রহমতের ফেরেশ্তাগণ এসে তার জন্য বেহেশ্তী বিছানা ও চাদর বিছিয়ে দিবে। কবরকে তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এবং একটি বেহেশ্তী ফানুস

প্রজ্জ্বলিত করা হবে ; কবর হতে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত সেই ফানুস কবরকে আলোকিত করে রাখবে।

হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাইদ ইব্‌নে উমাইর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের ভিতর মুর্দাকে উঠিয়ে বসানো হয়, যখন সে তাকে বিদায় দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের পায়ের পতন-ধ্বনি শুনতে পায়। অতঃপর সর্বপ্রথম কবরই তাকে সম্বোধন করে বলে, ওরে সর্বনাশা আদম সন্তান, আমার ও আমার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কি তোমাকে সাবধান করা হয় নাই? আমার দুর্গন্ধ, বিভীষিকা ও কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নাই? বল, তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?

হযরত বারা ইব্‌নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কবর-আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

অতঃপর ইরশাদ করলেন, মু'মিন যখন আখেরাতের দিকে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ পাক তখন এমন একদল ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন যাদের চেহারা সূর্যের মত। তাদের সঙ্গে থাকে তার জন্য আনা হানূত (সুগন্ধ) ও কাফন। তারা তার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ্ বের হয়ে যায়, তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সকল ফেরেশ্‌তা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চায় যেন সেই দিক দিয়ে প্রবেশ করে। যখন তার রূহ্‌কে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এক ফেরেশ্‌তা বলে, আয় রব্ব্, এই আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ্ বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি নে'আমত তৈরী করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

'এই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং আবার এ মাটির মধ্যেই নিয়ে যাব।' (তোয়াহা ঃ ৫৫)

মুর্দা, প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ হে ব্যক্তি, তোমার রব্ব্ কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? সে বলে ঃ আমার রব্ব্ আল্লাহ্ ; আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐ মুহূর্তটায় ফেরেশ্তাদ্বয় অত্যন্ত কঠোর ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে। এবং সেটাই হচ্ছে মৃতের আখেরী পরীক্ষা। যাক, সে যখন উপরোক্ত জবাব দেয় তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দান করে ঃ হে, তুমি সত্য বলেছ। বস্তুতঃ এ কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে–পাকে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

'ঈমানদারদিগকে আল্লাহ্ পাক 'মযবুত বাণীর' সাহায্যে মযবুতি প্রদান করেন।' (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

অতঃপর সুখী মুখ, সুগন্ধ দেহ, সুন্দর লেবাস পরিহিত এক আগন্তুকের আগমন। এসে বলে, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমার প্রতিপালকের রহমতের এবং চিরস্থায়ী নে'আমতে পূর্ণ জান্নাতের। মুর্দা বলে, আপনি কে? আল্লাহ্ আপনাকে পরম সুখী রাখুন। আগন্তুক বলে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র শপথ, আমি অবগত আছি, তুমি ছিলে আল্লাহ্র বন্দেগীর পানে দ্রুতগতিশীল এবং তার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ছিলে শ্লথগতি, অতএব, আল্লাহ্ পাক তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য একটা বেহেশ্তী বিছানা বিছাও ; বেহেশ্তের দিকে ওর জন্য একটা দরজা খুলে দাও। ফলে, বেহেশ্তী বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে বলে উঠবে ঃ আয় আল্লাহ্, দ্রুত ক্বিয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি 'আমার স্বজন–পরিজন' ও 'আমার মাল–দৌলতের' মাঝে চলে যেতে পারি।

আঁ-হযরত বলেন, কিন্তু কাফের, কাফেরের যখন দুনিয়া ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রার সময় হয় তখন তার নিকট একদল কঠিনপ্রাণ কঠোরাচরণ ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তাদের সঙ্গে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের সালোয়ার। তারা তাকে—ঘিরে ফেলে। যখন তার রূহ্ বের হয়ে যায় তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সমস্ত ফেরেশ্তা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করে এবং আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই কামনা করে যেন এই রূহ্কে সেদিক দিয়ে না ঢুকানো হয়। তার রূহ্ নিয়ে যখন ঊর্ধ্বে গমন করা হয়, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এবং ফেরেশ্তাদের পক্ষ হতে বলা হয়, আয় আল্লাহ্, আপনার অমুক বান্দা, কোন আসমান, কোন যমীনই তাকে গ্রহণ করলো না। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি কি আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ 'এ মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি ; পুনরায় এ মাটির মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাবো।' —যাক, সে প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ হে, তোমার রব্ব্ কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলবে ঃ লা আদ্রী—আমি তো কিছুই জানি না। তাকে বলা হবে ঃ তোমার জানার দরকারও নাই। অতঃপর কুৎসিত মুখ, দুর্গন্ধময় দেহ ও বিশ্রী পোশাক পরিহিত জনৈক আগন্তুক এসে বলবে ঃ হে, আল্লাহ্র অসন্তোষ ও যন্ত্রণাপ্রদ চিরস্থায়ী আযাবের সুসংবাদ নাও। কাফের বলবে, আল্লাহ্ যেন তোমাকেও আযাব-গযবেরই সুসংবাদ দান করে। আচ্ছা, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার 'জঘন্য আমল' আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তুমি ছিলে দ্রুতগামী আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে লেংড়াগতি। অতএব, আল্লাহ্ যেন তোমাকে জঘন্য বদলাই প্রদান করেন। অতঃপর তার উপর একজন অন্ধ-বধির-বোবা ফেরেশ্তা নিযুক্ত হবে, তার হাতে থাকবে একটি লোহার গদা, সমগ্র জ্বিন-ইনসান মিলেও যদি সেই গদাটিকে উঠাতে চেষ্টা করে তবু তা উঠানো সম্ভব হবে না। এবং তা দ্বারা যদি কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহলে সে পাহাড় মাটিতে মিশে যাবে। ফেরেশ্তা ঐ লৌহ-গদা দিয়ে তাকে একটি আঘাত করবে, সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যাবে। পুনরায় রূহ্ সংযোগে

তাকে জীবিত করা হবে। অতঃপর তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে এমন এক আঘাত করবে যার আওয়াজ জ্বিন-ইনসান ব্যতীত আর সকলেই শুনতে পাবে। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও। দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে, আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) এ আয়াতখানা পাঠ করতেন ঃ

حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ط

'অবশেষে যখন মৃত্যু তাদের কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন বলে, হে প্রতিপালক, আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠান, আশা করি আমি নেক আমল উপার্জন করবো, যা আগে বর্জন করেছিলাম।'

(মুমিনূন ঃ ৯৯, ১০০)

তিনি বলেন, মৃত্যুকে বলা হয়, তুমি কি জিনিস চাও? কোন্ বস্তুর আগ্রহ কর? এ জন্য ফিরে যেতে চাও যে, যাতে মাল জমা করতে পার, প্রাসাদ নির্মাণ করতে পার এবং ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে পার? সে বলে, জ্বী-না, বরং এই আশায় যে, আমি যে অতীতে আপনার হুকুম লংঘন করেছি, এখন যেন তদস্থলে নেক আমল উপার্জন করতে পারি। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'তা কখনও না, এটা বুলিসর্বস্ব একটা কথা মাত্র, (মৃত্যুকালে) যা আওড়িয়েই থাকবে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন তার কবর মাঝে বস্তুতঃ একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করে। তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং এমনকি, তা পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে যায়। জান, এ আয়াতখানা কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে?

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

'অবশ্যই তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন-ক্লিষ্ট জীবন।'

(তোহায়া ঃ ১৩৪)

সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। হুযুর বললেন, 'এ আয়াত কাফেরের কবর আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ। কাফেরের উপর ৯৯টি বিষাক্ত সর্প লেলিয়ে দেওয়া হবে। বলতে পার, কি রকম হবে সেই সর্প? প্রতিটি সর্পই হবে সাত মাথা বিশিষ্ট। অনুরূপ ৯৯টি সর্প ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে, তার দেহের ভিতর তাদের (বিষাক্ত ও জ্বালাময়) নিশ্বাস ছাড়তে থাকবে।'

সাপ-বিচ্ছুর এই সংখ্যা দেখে আশ্চর্যবোধের কিছু নাই। কারণ, এ সংখ্যা হবে মানুষের অশুভ চরিত্রের সংখ্যার অনুপাতে। যেমন, অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি। কারণ, খারাপ চরিত্রের দু'টি ভাগ আছে, কতগুলো মৌলিক আর কতগুলো হচ্ছে সে মূল হতে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখা ও তার বিভিন্ন প্রকার। বস্তুতঃ ঐ চরিত্রগুলোই সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হবে। অতএব, বেশী জঘন্য চরিত্রটি বিষধর অজগরের রূপে দংশন করবে, অপেক্ষাকৃত কম খারাপ চরিত্রটি বিষাক্ত বিচ্ছুরূপে দংশন করবে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের চরিত্রসমূহ সাধারণ সাপের মত আঘাত করবে। অন্তর-চক্ষুষ্মাণ আওলিয়াগণ তাদের অর্ন্তদৃষ্টিতে হুবহু এ সকল কুচরিত্রকেই সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি আকারে দেখতে পান। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার বিষয়টি 'নবুয়তের নূর' ব্যতীত জানা অসম্ভব! যাই হোক, এই জাতীয় হাদীসসমূহের একটি বাহ্যিক দিক ও অর্থ আছে, তাও নির্ভুল। এবং একটি রহস্যপূর্ণ দিকও আছে যা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকলেও অন্তর-চক্ষুওয়ালাদের চোখে তা সুস্পষ্ট। তাই, এ ধরণের রেওয়ায়াতে মূল হাকীকত উন্মোচন সম্ভবপর না হলেও এর প্রকাশ্য দিকটিকে অস্বীকার করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। বরং ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো তা স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়া।

অধ্যায় ঃ ৪৬

ইলমুল-ইয়াকীন, আইনুল-ইয়াকীন ও বিচার দিবসের জিজ্ঞাসাবাদের বয়ান

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

'অর্থাৎ যদি তোমরা কিয়ামতকে ইয়াকীন সহকারে জানতে, তাহলে অবশ্যই তা তোমাদেরকে প্রাচুর্য ও গর্ব–গরিমার প্রতিযোগিতা হতে বিরত রাখত এবং তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথকে গ্রহণ করতে ও অকল্যাণের পথসমূহ বর্জন করে দিতে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তোমাদের যদি সেই ইয়াকীনি ইল্‌ম ও জ্ঞান থাকতো যা নবী–রাসূলদের মধ্যে ছিল যে, মাল ও বংশ মর্যাদার গর্ব–গৌরব কিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না, তাহলে তোমরা প্রাচুর্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্ব করতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে অবলোকন করতে।'

আল্লাহ্ পাক এখানে কসম করে বলেছেন যে, অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম ও তার বিভীষিকা চাক্ষুষ অবলোকন করবে।

স্মর্তব্য যে, ইল্‌মুল–ইয়াকীন ও আইনুল–ইয়াকীনের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ইল্‌মুল–ইয়াকীন ছিল নবী–রাসূলগণের এবং তা ছিল তাঁদের নবুয়তলব্ধ জ্ঞান। আর আইনুল–ইয়াকীন (চাক্ষুস দেখার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান) হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের সাথে–সম্পর্কিত। কারণ, তারা বেহেশ্‌ত, দোযখ, লাওহে মাহ্‌ফুয, কলম, আরশ, কুরসী স্বচক্ষে অবলোকন করে।

দুই. ইল্‌মুল ইয়াকীন হচ্ছে মউত ও কবর সম্পর্কিত জীবিতদের জ্ঞান।

কারণ, তারা শুধু এতটুকুই জানে যে, মৃতরা কবরে শায়িত আছে। কিন্তু তাদের বাস্তব অবস্থাদি তারা জানে না। আইনুল-ইয়াকীন হচ্ছে স্বয়ং মৃতদের জ্ঞান। কারণ, তারা কবর ও কবর-জীবনকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, হয়তঃ তা তাদের জন্য দোযখের একটি গর্ত কিংবা একটি বেহেশ্তী বাগান।

তিন. ইলমুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামতের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামত ও ক্বিয়ামতের দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করা।

চার. ইল্‌মুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্‌ত-দোযখকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

'পরন্তু, সেদিন তোমরা নে'আমতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা দেহ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, খাদ্য, পানীয় ও জীবন যাপনের উপকরণাদি প্রভৃতি যেসকল নে'আমত ভোগ করেছ সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা এই নে'আমতদাতার পরিচয় জেনেছিলে কিনা, তার শোকর ও বন্দেগী পালন করেছ কিনা, নাকি তার কৃতঘ্নতা ও অবাধ্যতা করেছ।

হযরত ইব্‌নে আবী হাতেম ও ইব্‌নে মারদুইয়াহ্ হযরত যায়দ বিন আসলাম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে তাকাসুর পাঠ করতঃ তার ব্যাখ্যা প্রদান করে বলছিলেন ঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

'প্রাচুর্যের গর্ব ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ইবাদত হতে গাফেল করে রেখেছে।'

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

'যতক্ষণ না তোমরা কবর প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমাদের মৃত্যু না হবে।'

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না (বরং) যখন তোমরা কবরে ঢুকবে অবশ্যই তখন বিশ্বাস ও অবগত হয়ে যাবে।'

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

'আবার বলছি, কক্ষণও এমন থাকবে না ; কবর হতে যখন হাশর মাঠে যাবে, অবশ্যই তখন অবগতি হয়ে যাবে।'

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না, (বরং) অবশ্যই তোমাদের ইয়াকীন জ্ঞান ও প্রতীতি জন্মাবে যখন তোমরা তোমাদের আমলের হিসাবের জন্য আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।'

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে।'

কারণ, পুলসিরাত স্থাপিত হবে জাহান্নামের মধ্যখানে। সেখানে মুসলমানদের কেউ সম্পূর্ণ নাজাত পেয়ে যাবে, কাউকে খানিকটা আঁচড়ে খেতে হবে এবং কেউ কেউ দোযখেই নিক্ষিপ্ত হবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

'পরন্তু, তোমরা নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করা, ঠাণ্ডা পানি পান করা, ছায়াময় গৃহে বাস করা সম্পর্কে এবং সুন্দর দেহ, স্বাস্থ্য ও নিদ্রার সুখ ও আরাম প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, এখানে 'নাঈম' (নে'আমত) মানে, আফিয়ত তথা নীরোগ ও নিরাপদ স্বাস্থ্য ও জীবন। হযরত আবূ ক্বিলাবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমার উম্মত কতিপয় লোক ঘি ও খাঁটি মধু সংমিশ্রিত করে তা ভক্ষণ করবে।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আবার কোন্ নে'আমতের মধ্যে আছি? আমরা তো যবের রুটি দিয়ে আধ–পেটা আহার করে কাটাই। আল্লাহ্ পাক তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ

أَلَيْسَ تَحْتَذُونَ النِّعَالَ وَتَشْرَبُونَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ -

'তোমরা কি পাদুকা পরিধান কর না? ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এ সবই তো আল্লাহ্র নে'আমতের অন্তর্ভুক্ত।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরায়ে তাকাসুর অবতীর্ণ হলো এবং হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা তা পাঠ করতে করতে 'আনিন্নাঈম' (নে'আমত সম্পর্কে) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোন্ নে'আমত সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে? আমাদের ভোগ্যবস্তু বলতে তো শুধু পানি আর খেজুর, ব্যস। পরন্তু, সর্বদাই আমরা শত্রুর সম্মুখীন। তাই, সর্বদাই আমাদের গর্দানে থাকে ঝুলন্ত তলোয়ার। এ অবস্থায় এমন কি নে'আমত আছে যা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা হতে পারি? আঁ–হযরত বললেন, মনে রেখ, প্রশ্ন অবশ্যই হবে (এসব সম্পর্কেও হবে।)

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে বান্দা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসিত হবে নে'আমত সম্পর্কে। বলা হবে, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থতা দান করি নাই? আমি কি তোমায় ঠাণ্ডা পানি পান করাই নাই?

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বের হতেই হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)–র সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ক্ষুধা আমাদেরকে আসতে বাধ্য করেছে। তিনি

বলতে লাগলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, যে-বস্তু তোমাদেরকে ঘরের বার করেছে, সেই একই বস্তু আমাকেও ঘরের বাইরে এনেছে। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল। তাঁরা হুযূরের সাথে রওনা হলেন। হুযূর এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়ীতে ছিল না। তাঁর স্ত্রী হুযূরকে দেখতে পেয়ে মারহাবা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলো। হুযূর বললেন, সে কোথায়? মহিলা বললেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে সে আনসারী এসে গেলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اَحَدٌ اَلْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِنِّيْ ـ

'আলহামদুলিল্লাহ্! অদ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মেহমানওয়ালা আর কেউ নাই।'

অতঃপর তিনি তাঁর বাগান হতে একটি খেজুরছড়া নিয়ে এলেন। যাতে শুকনা খেজুরও ছিল, তাজা খেজুরও ছিল। বললেন, এ থেকে ভক্ষণ করুন। অতঃপর তিনি একটি বকরী যবেহ্ করতে প্রস্তুত হলেন। হুযূর বললেন, দেখ, দুধেল বকরী যেন যবেহ্ না কর। আনসারী সেমতে (অদুগ্ধবতী) একটি বকরী যবেহ্ করলেন। তাঁরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে বকরীর গোশত খেলেন, ঐ খেজুর খেলেন এবং মিঠা পানি পান করলেন।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে এই নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অধ্যায় ঃ ৪৭

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র বা স্মরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।'
(বাকারাহ ঃ ১৫২)

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখন আমাকে স্মরণ করেন, তা আমি জানি।' লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,—'আমি যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।'

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

'তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।' (আহ্যাব ঃ ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ج

'তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আস, তখন মাশ্'আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। আর তাকে স্মরণ কর এমনিভাবে যেমন তোমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে।' (বাকারাহ ঃ ১৯৮)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ

آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط

'তোমরা হজ্জের যাবতীয় কাজ যখন পূর্ণ কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে থাকো ; বরং আল্লাহ্‌র স্মরণ তদপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত।' (বাকারাহ ঃ ২০০)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ

'তারা (জ্ঞানবান ব্যক্তিরা) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়েও, বসেও শুয়েও।' (আলি-ইমরান ঃ ১৯১)

আরও বলেন ঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ ج

'অতঃপর তোমরা যখন নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।' (নিসা ঃ ১০৩)

অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, —'এর অর্থ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, অর্থাৎ,—দিবসে, রাত্রিতে, স্থলভাগে, জলভাগে, আবাসে, প্রবাসে, সুখে, দুঃখে, অভাবে, ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, সুস্থে, অসুস্থে, জাহেরে, বাতেনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।'

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের জঘন্যতা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

'তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র (মুখে)-ও করে না ; কিন্তু খুবই কম।'(নিসা ঃ ১৪২)

যিক্‌র সম্বন্ধে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

'তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয়ের সাথে এবং ভয়ের সাথে। আরও স্মরণ কর প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় উচ্চস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরে। আর গফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

'আল্লাহ্র স্মরণ সবচেয়ে বড়।' (আনকাবূত ঃ ৪৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের দুই অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ এক,—আল্লাহ্ তা'আলার তোমাদেরকে স্মরণ করা, তোমাদের যিক্রের চাইতে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। দুই,—আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা অন্যান্য সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে পরিণামের কথা স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠের স্তূপে পত্রপল্লবশোভিত জীবন্ত বৃক্ষ।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে আল্লাহ্কে স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন জেহাদের ময়দান হতে পলাতক ব্যক্তির তুলনায় গাযী বা বীরপুরুষ।'

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ بِىْ ـ

'আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিক্রে তার ঠোঁট সঞ্চালন করে, আমি তার সাথে থাকি।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ্র আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যিক্রের চাইতে অধিক কার্যকরী আর কোন আমল নাই।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে যিক্র জিহাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ? হুযুর বললেন ঃ 'হাঁ, যিক্র জিহাদের চাইতেও উত্তম ; তবে আল্লাহ্র পথে জিহাদে যদি তোমার তরবারী ভেঙ্গে যায় আর তুমি পুনরায় তা দিয়ে জিহাদ করতে থাকো, আবার যদি ভেঙ্গে যায় পুনরায় ভাঙ্গা পর্যন্ত লড়তে থাকো, তাহলে এ জিহাদ হবে যিক্রের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْتَعَ فِيْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

'যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগিচায় পায়চারি করতে আগ্রহী, সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ করে।'

একদা হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, শ্রেষ্ঠতম আমল কোন্টি? তিনি বললেন ঃ 'মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রে রসনা সিক্ত করা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্ররত অবস্থায় অতিবাহিত কর, তাহলে তোমাদের এমন সময় আসবে যখনকার সকাল–সন্ধ্যায় তোমরা নিষ্পাপ হবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'সকাল–বিকাল আল্লাহ্র যিক্র করা জিহাদের ময়দানে তুমুল লড়াই ও উদার মনে দান–খয়রাত অপেক্ষাও উত্তম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, —আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا ذَكَرَنِيْ عَبْدِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَائِهٖ وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا مَشٰى اِلَيَّ هَرْوَلْتُ اِلَيْهِ -

'যদি আমার বান্দা আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মানবদলে স্মরণ করে, আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি। অনুরূপ বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়। আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যদি সে এক হাত অগ্রসর হয় আমি উভয় বাহু বিস্তৃত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... ... رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ۔

'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সেই (কিয়ামতের) দিন নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন আর কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো—ওই সব লোক যারা নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে এবং ভয় ও ভক্তিতে তাদের চোখ হতে অশ্রু বয়ে পড়েছে!'

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলের কথা বলবো, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবে, যা স্বর্ণ রৌপ্য ছদ্কা করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণপদ, যা আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণজনক, আমি কি এমন আমল সম্বন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিবো? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলুন, তা কোন আমল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

আল্লাহ্র যিক্র অর্থাৎ 'সদাসর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ۔

'যে ব্যক্তিকে আমার যিক্রের মগ্নতা আমার দরবারে দো'আ বা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে অধিক দান করে থাকি।'

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ আমি এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে,

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—হে আমার বান্দা! ফজরের পর কিছু সময় এবং আছরের পর কিছু সময় আমার যিক্র ও ধ্যান কর, তাহলে এ দু'য়ের মাঝের (দিবা-রাত্রির) জন্য আমি তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবো।'

এক বুযুর্গ বলেছেন,—আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ'যে ব্যক্তির অন্তরে আমার যিক্র ও স্মরণের প্রতি অধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করি তার জিম্মাদার আমি হয়ে যাই। তার যাবতীয় অভাব দূর করি, সর্বদা তার তত্ত্বাবধান করি, তার সাথে কথা বলি এবং তাকে ভালবাসি।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'যিক্র দুই প্রকার,—এক, অন্তরে আল্লাহ্র স্মরণ জাগরুক রাখা—এটা অত্যন্ত চমৎকার ও ফযীলতময় আমল। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম ও অধিক ফযীলতময় হচ্ছে যিক্রের দ্বিতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং তা থেকে বিরত হওয়া।'

বর্ণিত আছে, 'মৃত্যুর সময় প্রতিটি রূহ্ প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় ; কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্র যিক্রকারী ব্যক্তি তখন পিপাসার্ত হয় না।'

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন ঃ 'বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে অবস্থানকালে কোন বিষয়ের আফ্সূস ও অনুতাপ করবে না, কেবল পৃথিবীতে অবস্থানকালে যে সময়টুকু তারা আল্লাহ্র যিক্র করে নাই সেই সময়টুকুর জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে কোন মানব দল কোথাও বসে আল্লাহ্র যিক্র করে, ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন পার্শ্বচরদের (ফেরেশ্তাদের) নিকট তাদেরকে স্মরণ করেন।'

হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'যে মানব দল একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে একত্র হয় এবং তাঁকে স্মরণ করে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী এই বলে ঘোষণা দেয়,—'ওহে! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহের স্থলে নেকী দান করা হয়েছে।'

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْهِ
وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যেসব লোক (দুনিয়াতে) কোন মজলিসে বসলো অথবা সাধারণ কোন বৈঠক করলো, যদি তাতে আল্লাহ্র যিক্র না করে বা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ পাঠ না করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সেজন্যে তাদের আফ্সূস করতে হবে।'

হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ 'হে মহান প্রভু প্রতিপালক! আপনি যখনই আমাকে দেখবেন আপনার যিক্র ও স্মরণকারীদের দল ত্যাগ করে আমি অন্যত্র যেতে মনস্থ করছি সেই মুহূর্তেই আপনি আমার পা ভেঙ্গে দিন, যাতে আমি সেখানে পৌঁছতে না পারি। কারণ যাকেরীনের জমাত আপনার দেওয়া আমার জন্য এক খাছ নে'আমত, যার কোন তুলনা হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَجْلِسُ الصَّالِحُ يُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اَلْفَىْ اَلْفِ مَجْلِسٍ
مِنْ مَجَالِسِ السُّوْءِ ـ

'নেক মজলিস ও সৎ সাহচর্য মু'মিন ব্যক্তির বিশ লক্ষ পাপানুষ্ঠানের ক্ষমার কারণ হয়।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার যে ঘরগুলোতে আল্লাহ্র যিক্র হতে থাকে, সেই ঘরগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকে, আসমান থেকে ফেরেশ্তাগণ তা অবলোকন করতে থাকেন।

হযরত সুফিয়ান ইব্নে উয়াইনাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ 'যখন কোন জমাত (মানবদল) কোথাও আল্লাহ্র যিক্রে মগ্ন হয়, তখন শয়তান ও দুনিয়া তাদের থেকে দূরে সরে যায়। শয়তান দুনিয়াকে বলে,—দেখছো না, এরা তো প্রচুর সওয়াব লুটে নিয়ে যাচ্ছে? তখন দুনিয়া বলে,—'নিশ্চিন্ত থাক,

তারা যিক্র ছেড়ে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আমি তাদের ঘাড়ে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদা তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ওহে! তোমরা এখানে ঘুরাফেরা করছো, অথচ মজসিদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস (সম্পত্তি) বিতরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে কোনই সম্পত্তির সন্ধান পেলো না। হযরত আবু হুরাইরাহ্র নিকট তারা এ পরিস্থিতির কথা বললে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা সেখানে কি দেখেছো? তারা বললো, দেখেছি কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রে মগ্ন আর কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে রত। হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ বস্তুতঃ এগুলোই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস বা সম্পদ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলার একদল পর্যটক ফেরেশ্তা রয়েছেন যারা আমলনামা লিপিবদ্ধকারীদের বাইরে ; তাদের কাজ হলো, পৃথিবীতে যিক্রের মজলিস তালাশ করে বেড়ানো। যখনই তারা কোন মজলিসে লোকদেরকে যিক্র করতে দেখেন তখন তারা একে অপরকে ডাকতে থাকেন—আস, তোমাদের কাম্যবস্তু এখানেই। অতঃপর তারা যিক্রকারীদেরকে আপন আপন ডানা দ্বারা আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। তখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আমার বান্দারা কি করছে? ফেরেশ্তারা বলেন ঃ তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশ্তাগণ বলেন ঃ আপনার কসম, তারা কখনও আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখতো তাহলে কি করতো? তখন ফেরেশ্তাগণ বলেন ঃ যদি তারা আপনাকে দেখতো তাহলে তারা আপনার আরো বেশী ইবাদত করতো এবং আরো বেশী মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়?

ফেরেশ্তাগণ উত্তর দেন, দোযখ হতে। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশ্তাগণ উত্তর করেন, হে রব্ব! আপনার কসম, তারা কখনও তা দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো, তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্তারা বলেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো তবে তা হতে পলায়ন করতো এবং মারাত্মক ভয় করতো। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি চায়? ফেরেশ্তারা বলেন ঃ তারা আপনার কাছে বেহেশ্ত চায়। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি বেহেশ্ত দেখেছে? ফেরেশ্তারা বলেন ঃ হে রব্ব! আপনার কসম, তারা কখনও বেহেশ্ত দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তারা বেহেশ্ত দেখতো তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্তাগণ উত্তর দেন ঃ যদি তারা বেহেশ্ত দেখতো, নিশ্চয়ই বেহেশ্তের লোভ করতো, আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতো এবং তারা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ.

'হে ফেরেশ্তারা! আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি ঃ আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।'

তখন ফেরেশ্তারা বলে উঠেন; তাদের অমুক ব্যক্তি যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; সেতো শুধু তার নিজের কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ.

'তারা (যিক্‌রকারীগণ) এমন সভাসদ, যাদের সহচর (ও সহ-উপবিষ্ট)-ও বঞ্চিত হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হচ্ছে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

'এক, লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার এই দো'আটি পড়বে ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি লা–শরীক, রাজত্ব তাঁরই, তাঁর সমস্ত প্রশংসা, যিনি সকল ক্ষমতার আধার।'

আল্লাহ্ তা'আলা এই দো'আ পাঠকারী ব্যক্তিকে দশজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করেন, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হয়, একশত গুনাহ্ মাফ করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয় এবং এরচেয়ে উত্তম আর কোন আমল হয় না। তবে হাঁ, এ দো'আই যদি কেউ অধিক পরিমাণে পাঠ করে, তবে সে অধিক ফযীলতের অধিকারী হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আসমানের দিকে দৃষ্টি করে নিম্নের দো'আটি পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে, অতঃপর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত